বাঙ্গালী-চরিত।

শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী, মডেল-ভগিনী, কালাচাঁদ, চিনিবাস-
চরিতামৃত, নেড়াহরিদাস প্রভৃতি গ্রন্থ-
প্রণেতা-কর্তৃক বিরচিত।

চতুর্থ সংস্করণ।

কলিকাতা।

৭।১২নং ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট বঙ্গবাসী ষ্টীম-মেসিন-প্রেসে
শ্রীনুটবিহারী রায় দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩১ [illegible]

মূল্য ২ দুই টাকা।

সূচীপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভাল কে? সভ্য না অসভ্য	১৮০
বুজরুক	১৮৪
কুরুচি	১৮৯
বালক	১৯৪
রটিকাকা	১৯৯
বেঙ্ক ডাঙ্গায় ফুলগাছ	২০৫
জামাই বাবু	২০৯
কাটা আইন	২১৫
একাদশী বাড়ুয্যে	২২০
বিয়ের লাড়ু	২২৯
কুমুদিনী বাবু	২৩২
টেটিকচাঁদ	২৩৯
হিন্দুধর্ম্মের দুর্দ্দিন	২৪৫
নারদ ও শুকদেব	২৬৩
সত্যমার্ক	২৬৮
ব্রাহ্মণ	২৮০
ভাল রাজনীতি	২৮৮
ঠাকুরমার কথা	৩০৫
শ্রীমতী চঞ্চলা	৩০৯
প্রকৃত পণ্ডিত কে?	৩৩০
ঊনবিংশ শতাব্দীর দুর্গোৎসব	৩৩৬
মহাশক্তির পলায়ন	৩৩৭

সূচীপত্র সমাপ্ত।

বাঙ্গালী-চরিত।

প্রথম ভাগ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রার্থনা।
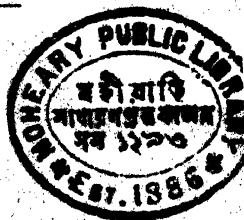
আমার একটি চাকরি চাই। কিন্তু কাকেই বা বলি, কেই বা শুনে? এ ভবসংসারে যে দিকে তাকাই, শূন্যময় বোধ হয়। ডাকিলে কেহ উত্তর দেয় না, তোষামোদ কেহ গ্রাহ্য করে না, পায়ে ধরিলে, কাহারও পা-পাষাণ নড়ে না। এ জগৎ আমার পক্ষে এখন বিজন কানন। দুঃখিনী মাতা আজন্ম আশা করিয়া আছেন, পুত্রের রোজগারের ধনে সুখী হইবেন; এক্ষণে নিরাশ-ব্যঞ্জক দুই একটি উষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস দেখিয়া, আমার এক ছটাক করিয়া গায়ের রক্ত প্রত্যহ জল হইয়া যাইতেছে। পাঠাবস্থায় পতিব্রতা সহধর্ম্মিণীকে বলিতাম,—“প্রিয়ে! আর কিছু দিন সবুর কর, আর দুই বৎসর

বাদে তুমি যে গহনা চাহিবে, আমি সেই গহনাই দিব; তখন আর যদুর দোকানের ন-সিকা জোড়া চল্লিশ নম্বরের কালাপেড়ে সাটী পরাইব না—ফরাসডাঙ্গা লালবাগানের ৫৲ টাকা জোড়া, মিহির উপর থাপ—মতিপেড়ে, কাশীপেড়ে রেলরোড্ পেড়ে—কিমধিক, আর গোপালের তাঁতের সাত টাকা জোড়া ঘোর কালাপেড়ে কাপড় অষ্টপ্রহর পরাইব। * যখন নিমন্ত্রণ খাইতে কিম্বা পূজা দেখিতে অপরের বাটী যাইবে, তখন ঢাকাই কি বেণারসী সাটী তোমার অঙ্গের শোভা বর্দ্ধন করিবে। যদি আমার কটকে চাকরি হয়, তাহা হইলে কটকপ্রস্তুত স্বুবর্ণ এবং রৌপ্যনির্ম্মিত বিবিধরূপ উত্তম উত্তম ফুল তোমার কুণ্ডলীকৃত কালবিষধরের তুল্য খোঁপায় বাহার দিবে।" কিন্তু হায়! এ সকল কথা এখন স্বপ্নবৎ বোধ হইতেছে। মনে করিয়াছিলাম, দুই বৎসর বাদে এত ঐশ্বর্য্য হইবে, কিন্তু এখন দু-দুগুণে চারি বৎসর গত হইল, তবু সে দিন আসিল না। পঞ্চম বৎসরে পড়িয়াছি, তবুও সে দিন আসিল না। কবে যে আসিবে, তাহাও জানি না। প্রিয়ার সেই অপরিস্ফুটিত, পারিপাণ্ডু-মুখকান্তিতে কেবলমাত্রব্যক্ত মনোভাব দেখিয়া, আমার হৃদয়ের মর্ম্মস্থানে আঘাত

---

* আমার এক বৃদ্ধপিতামহ ছিলেন। তিনি বলিতেন, গোপাল যেমন কালার পাড় করিতে পারে, তেমন আর কেহই পারে না। অপরের কালাপাড় ধোপে ধোপে বিগতশ্রী হইয়া ফেকাসে হইয়া যায়; কিন্তু গোপালের কালাপাড় প্রতি ধোপে আরও কৃষ্ণ বর্ণ হয়, চিক্কণ হয়, এবং তাহার উজ্জ্বলতা বাড়ে। সে পাড় অক্ষয়, অব্যয় এবং নিত্য। আমার কামিনীর একবার ঐরূপ কাপড় পড়িতে ইচ্ছা হয়।

লাগিয়াছে। এ ভগ্নদেহে, একবার ছয় মাস কাল জ্বর ভোগ করিতে হইয়াছিল; একটা দুর্ব্বুদ্ধি চাকর আমার সেবা শুশ্রূষা করিত; তার আশা ছিল, আমার চাকরি হইলে বক্‌শীশ লইবে। এখন সে কি মনে করে, এই ভাবিয়াই আমি পাগল। যখন আমি ১৪৲ টাকা জলপানী পাইলাম, তখন কলসীকাঁকে, হাস্যমুখী, পাড়ার যুবতীগণ জল আনিতে গিয়া আমার কত গুণগান করিত; বলিত, ইহার স্ত্রী কতই না গহনা কাপড় পরিবে, কতই না সুখে থাকিবে। প্রতিবাসিনী বৃদ্ধারা ভাবিত, এইরূপ ছেলে হ'লেই মায়ের সুখ; এখন হইতে রোজগার আরম্ভ করিল। না জানি, ইহার পর কত উপার্জ্জন করিবে। আমার এক অতি-বৃদ্ধা পিতামহী বলিতেন, "ভাই! আমার আর কিছুই চাই না, কেবল তুমি শ্রীবৃন্দাবনবাসের খরচটা দিও।"

এখন আমি কাহাকে কি দিই, কিছুই ভাবিয়া ঠিক পাই না। এ ভাঙ্গাহাটে, এ বাকীপড়া-শিকস্তি মহলে কি আছে যে, অপরকে দিব? আমি নিজের জন্য বেশী দুঃখিত নহি, কিন্তু অনেকের যে আশা ভঙ্গ করিলাম, এই দারুণ দুঃখে আমার জীবনের মূলগ্রন্থি পর্য্যন্ত বিশুষ্ক হইয়া যাইতেছে। হে ভগবন্! কি পাপে বাঙ্গালীর ছেলের এত কষ্ট, এত যন্ত্রণা এ দুর্ভর দুঃখ! কই, আমি ত কখন কাহারও ধার করিয়া খাই নাই? অসৎকর্ম্ম করিয়া কাহারও মনে ব্যথা দিই নাই? 'আপনি' বই কাহাকে কখন 'তুমি' বলি নাই।

উচ্চচক্ষে কখন কোন যুবতীর পানে চাহি নাই। নিরীহ ভাল মানুষটীর মত পাড়ায় থাকিতাম, এবং নিজ পাঠে সর্ব্বদা মনোনিবেশ করিতাম। কিছু কম চৌদ্দ বৎসর নারীর মুখ না দেখিয়া, একরূপ অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়া, রাত্রে না ঘুমাইয়া, বহুকষ্টে বহুপরিশ্রমে, বহুযত্নে "এম্-এ" উপাধি লাভ করিলাম; তবুও চাকরি হইল না,—এক পয়সাও উপায় করিতে পারিলাম না। প্রণয়িনীর অলঙ্কার দূরে যাউক, এখন খাই কি? অন্ন-চিন্তা-চমৎকার, এ জর্জ্জরিত দেহে একাধিপত্য লাভ করিতেছে। ইহা ব্যতীত, বাবা আজ কাল এক খানা ফর্দ্দ বাহির করিতে আরম্ভ করিয়াছেন,—তিনি বলেন, আমার নন্দদুলালকে লেখাপড়া শিখাইতে সাড়ে তিন হাজার টাকা খরচ হইয়াছে। তাই বলি, আমার একটি চাকরি চাই। তোমরা যে কাজ করিতে বলিবে, আমি তাহাই করিব। আগা পাড়াপড়শীরা, কেউ আমাকে চাকরি দেবে কি গা?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আমার আর চলে না। মুখে অন্ন রুচে না। বাপের ভাত খাইতে লজ্জা করে। পঁচিশ বৎসর হইল, এক পয়সাও আনিতে পারিলাম না। লোকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিল। কোথা চাকরি পাই, কোথা চাকরি পাই, এই চিন্তানলে শরীর দগ্ধ হইতে লাগিল। দিন আর যায় না। এক দিবস

এক জন বন্ধু উপদেশ দিলেন, তুমি "এডুকেশন-গেজেট" দেখিতে আরম্ভ কর—তাহাতে অনেক চাকুরি খালির বিজ্ঞাপন থাকে; তাহাই করিলাম। দেখিলাম, ৫৲ টাকা হইতে আরম্ভ করিয়া রোজ ৪৫৲ টাকা অবধি, অনেক চাকরি প্রতি সপ্তাহে খালি হয়। মনে বড় ক্ষোভ হইল। ধারণা ছিল, এত 'পাশ' করিয়াছি, নিদান পক্ষে ১০০৲ টাকার কম মাহিনার চাকরি কখনই করিব না। পিতা মাতার যে কি ধারণা ছিল, তাহা বলিয়া আর এখন লোক হাসাইব না। কিন্তু গতি নাই—'দারিদ্র্য দোষ গুণরাশি-নাশী'। দরখাস্ত করিতে আরম্ভ করিলাম। বলিলে বিশ্বাস করিবে না, পৌণে পাঁচ টাকার টিকিট খরচ করিলাম। চাকরি হওয়া দূরে থাক, একখানা পত্রের উত্তর পর্য্যন্ত পাইলাম না। মনে মনে বড় সন্দেহ হইল—ব্যাপারটা কি? গেজেটের এ সব ভৌতিক কাণ্ড নাকি? বিশেষ অনুসন্ধানে জানিলাম, বিজ্ঞাপিত চাকরিগুলি অনেক সময়ে খালি হয় বটে, কিন্তু বিজ্ঞাপন দিবার পূর্ব্বেই লোক বাহাল হইয়া যায়।

তখন আবার মনে বড় ভাবনা উপস্থিত হইল। কি করি। একজন বৃদ্ধের পরামর্শ অনুসারে, বাস্তুচক্রের ইন্‌স্পেক্টরের নিকট যাতায়াত আরম্ভ করিলাম। ক্রমে তাঁহার নিকট বড় আশা পাইলাম। ছয়মাস আনাগোনা করিয়া একজোড়া জুতা ছিঁড়িলে, শীতলগ্রামে গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ে ৬০৲ টাকা মাহিনার প্রধান শিক্ষকের পদ একটি খালি হইল।

ছয়মাস আনাগোনা, তোবামোদ এবং তদুপরি দুইজনার অনু-রোধ—এই ত্র্যহস্পর্শ একত্র হইলে, ইন্‌স্পেক্টর মহোদয় সদয় হইয়া আমাকে বাহালি পরওয়াণা দিলেন। নন্দদুলাল জয়-চাঁদের সে দিবস কি আনন্দের দিন! বিদ্যাশিক্ষার প্রথম ফল, মনুষ্য জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, স্ত্রীপুত্রদ্বারা সম্মানিত হইবার একমাত্র অদ্বিতীয় উপায়,—অর্থোপার্জ্জনের দ্বার অদ্য মুক্ত হইল।

বাহালি-পরওয়াণা হাতে করিয়া, আহ্লাদে আটখানা হইয়া, গৃহে প্রত্যাগমন করত একেবারে কামিনীর চরণ-প্রান্তে তাহা ফেলিলাম; বলিলাম "প্রিয়ে! গহনার ফর্দ্দ দাও, আজ হইতে অভাব মোচন হইল।" কামিনী তামাসা বিবেচনা করিয়া, কিম্বা অর্থহীন হইলে বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ হয় মনে মনে ভাবিয়া, আমাকে পাগল ঠিক করত বিরক্ত ভাবে তথা হইতে উঠিয়া গেল। আমি বড় ফাঁপরে পড়িলাম। ভাবিলাম, একি? ইহাকেই বলে হরিষে, বিষাদ। এই আপোপ্লেক্সি-রোগে পৃথিবীপতি রাজা দুর্য্যোধনের মৃত্যু হয়। আমি ত কোন্ কীটাণুকীট! সকল চিন্তা দূরে গিয়া আমার মরিবার বড় ভয় হইল। হায়রে "* * * অমৃতে উঠিল হলাহল"! একটু কাঁদিলাম। মনকে দৃঢ় করিলাম। ধমনীতে আর্য্যশোণিত বহিতে লাগিল। বুঝিলাম, কামিনী আমার কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া, এরূপ করিয়াছে—অতএব দণ্ডার্হা নহে। অবশেষে স্থিরচিত্তে, গম্ভীর প্রকৃতিতে বাটীর প্রত্যেক পরি-

জনকে বিশেষ করিয়া বুঝাইলাম যে, আমার চাকরি হইয়াছে। সে দিবস মদীয় ভবনে আর আনন্দের অবধি রহিল না।

পরদিন প্রাতঃকালে, উন্নত-ললাটে প্রভাতচন্দ্রবৎ দধির ফোঁটা লাগাইয়া, মাতাকে প্রণাম করিয়া, প্রণয়িনীর সহিত কেবল মাত্র নয়নে নয়নে হানাহানি করিয়া, যাত্রা করিলাম। ষ্টেশনে আসিয়া শুনিলাম, গাড়ী চলিয়া গিয়াছে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে,—প্রায় দুই ঘণ্টা। ইত্যবসরে একটী ভদ্র লোকের সহিত আলাপ হইল। ক্রমে তিনি জানিলেন যে, আমি শীতল গ্রামের প্রধান শিক্ষক। তখন তিনি গললগ্নীকৃত-বাস হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, উর্দ্ধমুখে, বলিলেন, "মহাশয়! এমন কাজ আপনি কদাচ করিবেন না,—এ হতভাগা তিন মাস কাল, ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিল, শেষে আসিবার সময়, মুদী, উঠনার বাকীর দরুণ, চিরসঞ্চিত, দরিদ্রের কাঞ্চন—কতকগুলি পুস্তক আটক করিয়া রাখে।" অনেক কথাবার্ত্তার পর, শেষে সমস্ত রহস্য অবগত হইলাম। বলিলাম আমি এই পথেই গৃহ প্রস্থান করিব।

ভদ্র লোকটীর নাম রসিকদাস—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বি-এ'। তাঁহারও যে দশা, আমারও সে দশা। দুজনে বড় মাখামাখি আলাপ হইল। একবার কোলাকুলি করিয়া দুজনে খানিক আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিলাম। কক্ষেতে অগ্নি ছিল, তাহার সাক্ষাতে, পরস্পরে বলিলাম, তুমি আমার সাঙ্গাত, আমি তোমার সাঙ্গাত।

খিড়কীর দ্বার দিয়া বাটী আসিয়া একবার ভাবিলাম, আর চাকরি করিব না। কিন্তু না করিয়াই বা কি করি? স্থির করিলাম, এবার ছোট পায়া ধরিব না, চাকরির খনি "ডাই-রেক্টরের" নিকট যাইব। ৩।৪ বার আনাগোনা করাতে দয়ালু বদান্য উডে৷ সাহেব বলিলেন, "তোমার যদি খরচের বেশী আবশ্যক হয়, তাহা হইলে আমি পকেট হইতে ৫৲ টাকা দিতেছি গ্রহণ কর। আর যত দিন না তোমার চাকরি করিয়া দিতে পারি, তত দিন তোমাকে মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা করিয়া দিব। তুমি মাসে মাসে একবার করিয়া আসিও।" আমি লজ্জায় অধোবদন হইলাম। অভিমানে হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল। ভাবিলাম এ কি?—ভিক্ষুক তৃণ অপেক্ষা লঘু। শেষে কি ভিক্ষা ব্যবসায় হইবে? এ জীবনকে ধিক্! মাতঃ বসুন্ধরে দ্বিধা বিভক্ত হও, আমি তাহাতে প্রবেশ করিব। ইহ জগতে, এ জনমদুঃখীর আর শান্তিস্থল কোথাও দেখিতেছি না।

পরিশেষে সাহেব মহোদয়কে বুঝাইয়া বলিলাম "আমার টাকার আবশ্যক নাই; চাকরি খালি হইলে দিবেন।" ইহা বলিয়া আমি প্রস্থান করিলাম। শীঘ্রই উডে৷ সাহেবের মৃত্যু হইল—আমিও বাঁচিলাম। তার পর ডাইরেক্টরী আফিসে দখল পাইলাম না।

দেখিলাম সকল দিক্ বন্ধ। কি করি, কোথায় যাই। বহুদর্শিতার দ্বারা জানিয়াছি, পরাধীনতা বড় কষ্ট। পরের তোষা-

মোদ করিব না। স্বাধীন ব্যবসায় অবলম্বন করিব। স্বাধীন ব্যবসায় কি?—ওকালতী। ওকালতীতে বড় মজা। যে দিন ইচ্ছা শ্বশুরবাড়ী যাও—দুই দিন কামাই করিলেও কেহ কৈফিয়ত তলব করিবে না—না হয় দশ টাকা ক্ষতি—তাহা পূরণ করিয়া লওয়া যাইবে। কিন্তু উকীল হইতে হইলে, কলেজে আবার ভর্ত্তি হইয়া মাহিনা দিয়া দুই বৎসর পড়িতে হইবে। বাবার নিকট হইতে টাকা চাহিতে লজ্জা করে; এবং চাহিলেও যে তিনি আর দেন, এমত বোধ হয় না। নিতান্ত মুখ-নষ্ট করা মাত্র।

স্থির করিলাম, ভারতবর্ষের প্রধান নগর কলিকাতায় যাইয়া একবার অদৃষ্ট-পরীক্ষা করিব। এবং তথায় যদি কোন সুবিধা করিতে পারি, তাহা হইলে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হইয়া আইন পড়িব। কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে রসিকদাস, বি-এ, সাঙ্গাতের সহিত দেখা হইল। দেখিলাম তিনি চাকরির জন্য ঘুরিতেছেন। প্রত্যহ দশটার সময়, বৃদ্ধাঙ্গুলির সাহায্যে উত্তমরূপ আহার করিয়া, চাকরির অন্বেষণে বহির্গত হন—সন্ধ্যা বেলা শুষ্কমুখে এক পা ধূলার সহিত ক্ষুধায় আকুল হইয়া বাসায় প্রত্যাগমন করেন। তৎপরে সিকি-পৈটা জলখাবার খাইয়া, ভারতমাতার উন্নতির জন্য ব্যতিব্যস্ত হন। বিশেষ পরিচয়ে জানিলাম, এখানেও আমার যে দশা, সাঙ্গাতেরও সেই দশা। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে আইন-বিভাগে প্রথম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়াছেন—এবং যাহাতে বাসা খরচ

বাটী হইতে আনিতে না হয়, এই জন্য একটা চাকরির চেষ্টা করিতেছেন। আমি বলিলাম সাঙ্গাত ভাই! তুমি আমারও জন্য একটা চাকরির অন্বেষণ করিও,—আমি কিছু কাহিল আছি, আজকাল বাজারে বাহির হইতে পারিব না।

এইরূপে দুই জনে কিছু দিন কলিকাতার শোভা দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। গলি ঘুঁজি সদর রাস্তা সকল প্রকার পথ নখদর্পণে দেখিতে লাগিলাম। তবু কেহ ডাকিল না। শেষে বোধ হইল যে, ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাড়ী পাক পাইয়া আমাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তির হ্রাস হইতেছে। মন বড়ই খারাপ হইল। চাকরি-চাকরি করিয়া ভাবিয়া-ভাবিয়া পাগল হইব নাকি? আইন পড়িব কি না, এই দারুণ চিন্তা মনোমধ্যে উদয় হইল—কারণ, দেখিতেছি, উকীল হওয়া ভিন্ন, চাকরির অন্যতর উপায় নাই। কিন্তু টাকা কোথায়? ভাবিলাম পিতার নিকট গিয়া পায়ে ধরিয়া বলিব, "পিতঃ! আমাকে আর দুই বৎসর কাল পড়ান, তৎপরে উকীল হইয়া সকল দুঃখ মোচন করিব।" ইহাতেই কৃতসঙ্কল্প হইলাম, সাঙ্গাতও মত দিলেন।

সেই দিবস বৈকালে, গঙ্গার ধারে দুই সাঙ্গাতে বসিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া ঈশ-গান গাইয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিলাম। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা সমাগতা। ক্রমে একটু রাত্ত হইল। আমরা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বাসার দিকে ধাবমান হইলাম। দেখিলাম, নগর আলোকময়। পথের জনতা তখনও ঘুচে নাই—সমস্ত লোকই নিজ নিজ কাজে বিব্রত। দেখিলে বোধ

হয় যেন চারিদিকে মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী বিরাজিত। কেবল এ অভাগা লক্ষ্মীছাড়াদের এখানে কোন কাজ নাই। আমরা কলিকাতায় এক-ঘরে।

মনোভ্রমে পথ ভুলিয়া, ক্রমে এক অন্ধকারময়, অপ্রশস্ত দুর্গন্ধবিশিষ্ট গলিতে গিয়া পড়িলাম। যতই অগ্রসর হই, ততই তিমির রাশি আরও গাঢ়তর হইয়া গায়ে যেন বাজিতে লাগিল। ক্রমশঃ মনুষ্যের সমাগত বন্ধ হইল। বড় ভয় হইল। ইহাই কি নরক গমনের পথ? অর্দ্ধক্রোশ এইরূপে অতিবাহিত করিয়া, দূর হইতে একটী আলোক দৃষ্ট হইল। সাহস পাইয়া দ্রুতপদে তদভিমুখে যাইতে লাগিলাম, দেখিলাম, সম্মুখে একটী বৃহৎ উদ্যান। ফটকে একটী আলো জ্বলিতেছে; কিন্তু দ্বার রুদ্ধ। অনুভবে জানিলাম, ভিতরের দিক্ হইতে অর্গল বদ্ধ। "নিরাশ্রয় পথিকদ্বয়, বিপদে পড়িয়াছি, দ্বার খুলিয়া দাও," বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিলাম; কিন্তু কেহই উত্তর দিল না। মনে বড় সন্দেহ উপস্থিত হইল,—ব্যাপারটা কি? অবশ্যই ইহার ভিতর লোক আছে। বাগানের প্রাচীর অতিশয় উচ্চ ছিল। সাঙ্গাত আমার স্কন্ধে চাপিয়া বহুকষ্টে তদুপরি উঠিলেন। দেখিলেন, এক প্রকাণ্ড অট্টালিকায় মিট মিট করিয়া একটি ক্ষীণালোক জ্বলিতেছে। কিন্তু মনুষ্য আছে বলিয়া বোধ হইল না—নিস্তব্ধতা চতুর্দ্দিকে বিরাজ করিতেছে। অবশেষে পর্য্যালোচনা দ্বারা বোধ হইল যে, উদ্যানের প্রান্তভাগে, অর্দ্ধক্রোশ দূরে, ঈশান কোণে, একটা অগ্নি জ্বলি-

তেছে। ক্রমে ক্রমে সে অনল বৰ্দ্ধিতায়তন হইল; শব-দাহের কাণ্ড বলিয়া বোধ হইল। সেই বিজন উদ্যানে অন্ধকার মধ্যে, প্রাচীরে দণ্ডায়মান দুই জনে—একলা। সৰ্ব্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল। কিন্তু অতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছিলাম বলিয়া, অতি কষ্টে বহু পরিশ্রমে নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে প্রাচীর হইতে অবতরণ করিয়া, সেই প্রজ্বলিত বহ্নির দিকে ধাবমান হইলাম। নিকটে গিয়া যাহা দেখিলাম, তাহা অপূৰ্ব্ব, অননুভূত এবং মানববুদ্ধির অগোচর।

দেখিলাম অৰ্দ্ধ হস্ত উচ্চ, শ্বেত প্রস্তরে গ্রথিত চতুষ্কোণ-বিশিষ্ট একটি বৃহৎ পরিসর বেদীর উপর দুই অঙ্গুলি ঘন বালির রাশি বিস্তৃত রহিয়াছে। তদুপরি স্তূপাকার চন্দন-কাষ্ঠ সাজান। মধ্যে মধ্যে ধূপ, ধুনা, গুগ্‌গুলের সমাবেশ। তদুপরি সদ্যোজাত-মাখম-গলান, সুগন্ধ-যুক্ত, গাওয়া-ঘৃত, অকাতরে গড়াইতেছে। তদুপরি শব। এ শব, মনুষ্য নহে, পশু নহে, পক্ষী নহে, পৃথিবীর প্রাণবিশিষ্ট কোন জীবই নহে। ইহা অচেতন পদার্থ—রাশীকৃত বিবিধবর্ণের বিবিধ আকারযুক্ত পুস্তক। তদুপরি আবার ঘৃত, চন্দনকাষ্ঠ প্রভৃতি সন্নিবেশিত রহিয়াছে। দেখিলাম, কেবল একজন মাত্র, ক্ষীণাঙ্গ, গোঁফদাড়িবিশিষ্ট যুবা পুরুষ এসমস্ত কার্য্যের পরি-দর্শন করিতেছেন। তাঁহার পরিধান পেণ্টুলন, চাপকান এবং তদুপরি রেশমি চোগা। মাথায় শালের পাগড়ী। দক্ষিণ হস্তে দুই খণ্ড কাগজ।

সেই জন-শূন্য-প্রদেশে, অমাবস্যার রাত্রে একটি তেঁতুল বৃক্ষের অন্তরালে থাকিয়া আমরা দুই জনে সেই ভৌতিক কাণ্ড দেখিতে লাগিলাম। আমরা যখন আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন নিম্নদেশের চন্দনকাষ্ঠ ধরিয়া কেবল দুই একখানি পুস্তক পুড়িয়াছে মাত্র। যুবা পুরুষ আবার এক কলস ঘৃত ঢালিয়া দিলেন, এবং এক সের আন্দাজ ধূনা ছড়াইয়া দিলেন। অগ্নি দ্বিগুণতর প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি প্রফুল্লচিত্তে সেই বেদীর চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। সপ্তম-বারে, দক্ষিণ হস্তস্থিত দুই খণ্ড কাগজ, বক্ষে স্থাপন করিয়া, সেই প্রদীপ্ত বৈশ্বানর-মুখে ঝম্প দিবার উপক্রম করিলেন। আমি আর থাকিতে না পারিয়া, দ্রুতগতি গিয়া তাঁহাকে ধরিলাম। তিনি, 'কে তুমি' বলিয়াই অচেতন-প্রায় হইলেন। আমি আস্তে আস্তে ধরিয়া তাঁহাকে আমার কোলে শয়ন করাইলাম। সাঙ্গাতকে বলিলাম, "ভাই শীঘ্র একটু জল আনয়ন কর।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ধীরে ধীরে সেই ভূ-লুণ্ঠিত মৃতপ্রায় অবসন্ন দেহ হইতে বস্ত্রাদি খুলিতে লাগিলাম। সাঙ্গাত আসিয়া তাঁহার চক্ষে ও মুখে জল দিলেন। তালবৃন্তের অভাবে আমি, আমার

শতধা ছিন্ন চাদরের দ্বারা বাতাস করিতে লাগিলাম। ক্রমে তিনি চক্ষু মেলিয়া অতি ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "আপনারা কে?" আমি বলিলাম, "মহাশয় স্থির হউন, কথা কহিবেন না।" তখন তিনি তীব্রস্বরে ভ্রূকুটি করিয়া কহিলেন, "আপনারা অতিশয় নিষ্ঠুর; যাহা করিবার নয়, তাহাই করিলেন। আর কেন, আমাকে ঐ গৃহে লইয়া চলুন।"

আমরা দুইজনে ধরাধরি করিয়া, তাহাকে সেই উদ্যান-মধ্যস্থিত অট্টালিকার ভিতর লইয়া গেলাম। একটি ঔষধপাত্রে ব্রাণ্ডি আছে বলিয়া বোধ হইল। কিঞ্চিৎ তাঁহাকে সেবন করাইলাম। তিনি, সেবনান্তে, ক্রমে একটু বল পাইলেন—মনেও স্ফূর্ত্তি হইল। তখন আস্তে আস্তে দুই একটি কথা কহিয়া, আমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিলাম "মহাশয় পথ ভুলিয়া এদিকে আসিয়া পড়িয়াছি।" "আপনি কে? জিজ্ঞাসা করাতে তিনি অতিশয় কুণ্ঠিত হইলেন; মৃদুস্বরে বলিলেন, "ক্ষমা করিবেন,—আমার আত্মপরিচয় দিতে ইচ্ছা নাই—আর এ অভাগার পরিচয় লইয়াই বা কি ফল? আমাদের কৌতূহল আরও বৃদ্ধি হইল। নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে পুনঃ-পুনঃ তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম।

তখন তিনি পালঙ্কোপরি বীরাসনে উপবেশন করিয়া মুদ্রিত নয়নে এইভাবে বলিতে আরম্ভ করিলেন—"আমার নাম শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র ঘোষ। পিতার নাম ৺গৌরহরি ঘোষ। নিবাস, কলিকাতা। বয়স ২৯ বৎসর, তিন মাস। জাতি কায়স্থ—

মুখ্য কুলীন। পেশা নাই। পিতার আমি একমাত্র পুত্র। আমার ৪টি মাত্র কন্যা সন্তান।

"পিতা আমার সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। ঢের টাকা উপার্জ্জন করেন, ঢের টাকা ব্যয় ও করেন। আমি আদরের পুত্র ছিলাম—ঘন দুধ, সর, চাঁচি ও মাছের মুড়ার কেহ অংশীদার থাকে নাই। পিতা মাতার স্নেহে যত্নে, এবং ভালবাসায় লালিত হইতে লাগিলাম। বিদ্যালয়ে বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিলাম; শিক্ষক বলিতেন 'এমন ছেলের জোড়া নাই।' কালক্রমে পিতার মৃত্যু হইল। সংসারের সমস্ত ভার আমার উপর পড়িল। পিতার অনেক বন্ধু বান্ধবে আমাকে চাকরি করিতে বলিলেন, আমি তাঁহাদের কথা না শুনিয়া পড়িতে লাগিলাম। পৈতৃক ধন বিনষ্ট করিয়া, এ ভারতে ইংরেজ-রাজত্বে যে-কয়টি পাশ করিতে হয়, তাহাই করিলাম। যে বৎসর 'ষ্টুডেণ্টশিপ্' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই, সে বৎসর কলিকাতায় সাহিত্যচক্রে আমার নামে একটা টি টি উঠে। আমি সাত পাঁচ না ভাবিয়া, মনে করিলাম, আমি একটা 'কি হইলাম,—ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব পাইব, কি স্বর্গ হইতে সুধালোলুপ দানবগণকে তাড়াইব, কি মরা মানুষকে জীবন্ত করিব

"কিছু দিন পরে, উকীল হইয়া, হাইকোর্টে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলাম। প্রত্যহ আদালতের বাহার, জজের বাহার, জনতা, গোলমাল, সাহেবের বক্তৃতা' বাঙ্গালীর বক্তৃতা, দেখিয়া-শুনিয়াই মনকে সন্তুষ্ট করত শুষ্কমুখে গৃহে প্রত্যাগমন

করি। একদিনও কেহ কথা দ্বারা জিজ্ঞাসা করিল না, "আপনি কি করিতে এখানে আসেন"? প্রত্যহ আমার মত—উদরে অন্ন নাই, বাহিরে চিক্কণ—কতকগুলি উকীলের সহিত ইয়ারকি দেওয়াই আমার কাজ হইল। কিন্তু এমন করিলেও ঘর চলে না, এবং দিনও যায় না। কদাচ, ছয় মাসে, নয় মাসে, অনুগ্রহে, উপরোধে দুই একটি মোকদ্দমা পাইতাম—কিন্তু পয়সা একটী কখনও পাই নাই। পৈতৃক ধনে লেখা পড়া শিখিয়াছি, এক্ষণে পৈতৃক ধনেই চাকরি করিতেছি। পৃথিবীতে এ রহস্য বুঝিবার লোক কয় জন আছেন?

"একদা কোন স্থানে (নাম করিবার আবশ্যক নাই), ১১০৲ টাকা মাহিনার একটি চাকরি খালি হয়। ২৪৯ খানি দরখাস্ত পড়ে। মন্দভাগ্য আমিও নিরুপায় ভাবিয়া একখানা দরখাস্ত করিয়াছিলাম। প্রধান সাহেব, সিংহাসনারূঢ় হইয়া সকলের সমক্ষে আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি এ কাজের প্রধান যোগ্য পাত্র; তোমাকে রাখিয়া আমি এ কাজ কাহাকেও দিতে পারি না; কিন্তু দিব না। তুমি যে পদে প্রতিষ্ঠিত আছ, তাহার গৌরব, তাহার মর্য্যাদা, তাহার সম্ভ্রম অলৌকিক—এ লোক জগতে দুর্লভ; এমন কি, অনেক সময় আমারই ইচ্ছা হয় যে তোমাদের ও-জগন্মান্য, মহামূল্য পদের সহিত, আমার এ অকিঞ্চিৎকর পদ বিনিময় করি। হে মুগ্ধ! এ সামান্য মূল্যের চাকরির জন্য, সেই দেবদুর্লভ বৃত্তি ত্যাগ করিলে, তোমার কলঙ্ক, তোমার দেশেরও কলঙ্ক, তোমাদের সমস্ত

জাতির উপর কলঙ্ক হইবে,—অতএব আমি দিতে ইচ্ছা করি না—কি বল ?” আমি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া, সাহেবকে সেলাম করিয়াই তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। মনে একটা কি অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহাতে তখন চক্ষে ভাল দেখিতে পাই নাই—তজ্জন্য দেয়ালে মাথা ঠুকিয়া পড়িয়া যাই। এক ঘর লোক—সকলেই খল্ খল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল—শুনিলাম, বড় সাহেবও ঈষৎ মুচকি হাসিয়াছিলেন।

“পসার না হইবার কারণ কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। অনেকে বলিল, যে, আমি আইন জানি না। অনেকে আমার মুখচোরা অপবাদ দিল। অনেকে আমাকে বিলাসী ও বাবু বলিল। এইরূপ কিছু দিন গোলমালে যায়—কিছুই ঠিক হয় না ;—শেষে সকলে একমতাবলম্বী হইয়া বলিলেন যে, আইনের কূটতর্কে আমার ক্ষমতা নাই, নচেৎ অপর দিকে আমি মন্দ নহি। আমার আবশ্যক মত গৃহস্থঘরে যেরূপ থাকিতে হয়, সেইরূপ কতকগুলি আইন পুস্তক ছিল। কিন্তু আমার বন্ধু বান্ধবের তাহাতে মন উঠিল না। তাঁহারা আমাকে রাশীকৃত আইন পুস্তক খরিদ করাইবার জন্য সচেষ্ট হইলেন।

এমন সময়, কলিকাতা হাইকোর্টের একজন অতিবৃদ্ধ সাহেব-বারিষ্টার বিলাত যাইবে বলিয়া জনরব উঠিল। তিনি সমস্ত আইন নিলাম করিব বলিয়া বিজ্ঞাপন দিলেন। আমি

সঙ্গে নগদ টাকা লইয়া, কতকগুলি বন্ধু-পরিবেষ্টিত হইয়া, নিলামের স্থানে উপস্থিত হইলাম। দুই হাজার সাত শত টাকার পুস্তক কিনিলাম। লোকে বলিল, দশ পনর হাজার টাকার পুস্তক পাইয়াছি।

"স্ত্রীকে পিত্রালয় পাঠাইয়া দিয়া, তিন বৎসর কাল, সেই সমস্ত আইন বহুপরিশ্রমের সহিত, কঙ্কালাবশিষ্ট হইয়া, পড়িলাম। তথাচ পসার হইল না। এক পয়সাও উপার্জ্জন করিতে পারিলাম না। লাভের মধ্যে, মাথা ঘোরার ব্যারামটা কিছু বৃদ্ধি হইল।

"ক্রমে পুস্তক পড়িতে আর ভাল লাগিত না। এমন কি, দেখিলেই বিরক্ত বোধ হইত। কখন কখন পুস্তক-গৃহে প্রবেশ করিয়া আলমারি-ভরা বই দেখিয়া কাঁদিতাম। কখন বা ক্রোধে বলিতাম, "রে দুশ্চরিত্র পুস্তক সকল! তোরা নিতান্ত অপদার্থ তোদের কোন গুণ নাই—অসার। আমি পঞ্চম বৎসর বয়ঃক্রম হইতে আজ পর্য্যন্ত, তোদের জন্য জীবন উৎসর্গ করিলাম—তবুও নিষ্ঠুর! তোরা সুফল প্রদান করিলি না। রৌদ্র, শিশির, শীত, গ্রীষ্ম, ঝড়, তুফান, বিদ্যুৎ, বজ্রাঘাত, রোগ, শোক প্রভৃতি ঈশ্বর-প্রেরিত তপোবিঘ্নকারী দৈত্যগণকে পরাস্ত করিয়া, ঐকান্তিক মনে তোদের সেবা করিলাম, তথাচ তোরা সদয় হইলি না। তোরা নেহাইত বেইমান্। তোদের ইহকালও নাই পরকালও নাই।"

"ক্রমে ক্রমে শরীর ক্ষীণ হইতে লাগিল। স্মরণশক্তি

জমিয়া গেল। চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। মানসিক বৃত্তি সমস্তই নিস্তেজ হইয়া পড়িল। ভবলীলা সাঙ্গ হইল নাকি? মনে হইল, সত্য সত্যই শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিন উপস্থিত। তবে বৃথা আর এ দেহ-ভার বহন করি কেন?— আমি মরি না কেন? মৃত্যুই শ্রেয়ঃ—স্থিরসঙ্কল্প করিলাম। কিন্তু ইহজীবনে যাহারা একমাত্র অবলম্বন ছিল,—সুখে, দুঃখে, সম্পদে, বিপদে, নির্জ্জনে, লোকালয়ে, গৃহে, অরণ্যে, যাহাদের সহিত একদণ্ডও বিচ্ছেদ ঘটে নাই—যাহারা আমার অস্থিতে অস্থিতে, মজ্জায় মজ্জায়, অন্তরের ভিতর অন্তরে মিশাইয়া আছে, তাহাদিগকে আমার এ অন্তিমকালে কোথায় ফেলিয়া যাইব? যাহাদের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছি, আমার অবর্ত্তমানে তাহাদের থাকিয়া ফল কি, কিম্বা তাহাদের অবর্ত্ত-মানে আমার বাঁচিয়া ফল কি? অতএব আমি তাহাদের সহিত সহমৃত হইব। তদনুযায়ী, আমার নিজ পুস্তকালয় হইতে, সমস্ত পুস্তক লইয়া, এই নিভৃত উদ্যানে 'শ' সাজা-ইলাম। 'শ' সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া যেমন তন্মধ্যে পতিত হইবার উপক্রম করিতেছি, আপনি আসিয়া পশ্চাৎ হইতে ধরিলেন। যে দুই খণ্ড কাগজ আমার হস্তে ছিল, তন্মধ্যে একখানি 'ষ্টুডেণ্টশিপ্' পাসের রসিদ, অপরখানি বি, এল, পাসের রসিদ। সহমরণ কালে, এই দুই খণ্ডকেও ভস্মীভূত করিবার নিতান্ত বাসনা ছিল। কিন্তু আপনারা [illegible] দিলেন।"

রাত্র দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। ঘোরতর অন্ধকার। আমরা তখন আর বাসায় গমন করা যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিলাম না। সেই উদ্যান-মধ্যস্থিত অট্টালিকায়, দ্বিতলে কোন এক বৃহৎ প্রকোষ্ঠে, আমরা তিন জনে এক শয্যায়, এক মশারির ভিতর, এক বালিসে, এক লেপে শয়ন করিয়া গল্প করিতে করিতে সুখে নিদ্রা গেলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আমরা কার্ত্তিক বাবুকে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া আমাদিগকে ধন্য বলিয়া মানিলাম। স্থির-চিত্তে অনুধাবন করিয়া কার্ত্তিক বাবুও বিশেষ অনুতাপ করিতে লাগিলেন— "কি করিতেছিলাম?—কাজটা বড়ই মন্দ হইতেছিল—লোকে শুনিয়াই বা কি বলিবে?" শেষে আমাদিগের নিকট হইতে উপকৃত হইয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিলেন।

কার্ত্তিক বাবু বড় সৎ লোক। নিতান্ত অমায়িক। সেই টুকটুকে মুখ খানিতে মৃদুমন্দ হাসিয়া হাসিয়া বাক্য নিঃসরণ কতই মধুর। তাঁহার কথাবার্ত্তা—গল্প, শ্রোতার মনোমোহন কারী। সেই সুতীক্ষ্ণ চক্ষুদ্বয় চাহিয়া তিনি যখন যাহার উপর ক্রোধ বা আহ্লাদ প্রকাশ করিতেন, সে ব্যক্তি অমনি তাঁহার বশ হইত। অতি অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার সহিত আমাদের বিশেষ বন্ধুত্ব হইল। তিনি আমাদিগকে না দেখিলে থাকিতে

পারিতেন না। আমরাও তাঁহাকে না দেখিলে থাকিতে পারিতাম না। কার্ত্তিক বাবুর পিতার আমলের একখানি ঘোড়ার গাড়ি ছিল; আপাততঃ অশ্বটী কিছু কাহিল। আমরা তিন জনে, প্রত্যহ বৈকালে, শকটারোহণে, সহরময় বেড়াইতাম। মাসের মধ্যে প্রায় ২৫ দিন রাত্রিতে তাঁহার বাটীতে আমাদের চর্ব্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয় রূপে ৮২ সিক্কার ওজনে আহারটা হইত। কার্ত্তিক বাবু সর্ব্বদাই বলিতেন যে, আমি আপনাদের সহিত মিলিয়া, আছি ভাল,—আমার অন্তর্দ্দাহ একরূপ রোগ জন্মিয়াছিল, সেটা এখন অনেক পরিমাণে কমিয়াছে। কার্ত্তিক বাবুর পরামর্শে, সাঙ্গাত প্রেসিডেন্সি কলেজের আইন-বিভাগ হইতে নাম কাটাইলেন। আমিও আইন শিক্ষার্থ কলেজে ভর্ত্তি হইতে ক্ষান্ত হইলাম—এ দগ্ধ অদৃষ্টে সে সাধ পূরিল না। তিনজনে একত্র হইয়া কেবল মুখামুখি করিয়া বসিয়া গল্প করিতাম। গল্প করিতে করিতে কখন হাসিতাম, কখন কাঁদিতাম, কখন ক্রোধে প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিতাম, কখন বা গম্ভীর স্বর অথচ ধীরে ধীরে একজন বলিত, দুইজনে শুনিত, কখন বা সকলেই এককালে চীৎকার করিয়া উঠিত। কখন বা একজনের বিরুদ্ধে বাগ্‌যুদ্ধে দুইজনে প্রবৃত্ত হইয়াছে, কিন্তু একজনই উভয় যোদ্ধাকে পরাভূত করিয়াছে। ক্রমে আমার বক্তৃতা-শক্তি কিছু স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে লাগিল। যথা;—

"ইহ জগতে জগদীশ্বরের প্রধানতম জীব, মনুষ্য। মনুষ্য

নিজ বুদ্ধিবলে পৃথিবীস্থ অপর সমস্ত জীবের উপর প্রাধান্য লাভ করিতেছে, সকলকে পদতলে রাখিয়াছে; সকলের উপর হুকুম চালাইতেছে। অশীতি লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ করিয়া, এ সুদুর্ল্লভ মানব দেহ ধারণ করিয়াছি। এমন জন্ম আর পাইব না। এ পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়া, যদি মনুষ্য-জীবন বিফলে যায়, তাহা হইলে, অনন্তকাল নরকে পচিতে হইবে।

"দুর্ভাগ্যবশতঃ এ পাপ কলিকালে মনুষ্য অন্নজীবী। আহার না পাইলে, দেহ পঞ্চভূতে মিশাইয়া যায়। কিন্তু পরমেশ্বরের রচনা এরূপ কৌশলময়ী যে, অপর্য্যাপ্ত খাদ্য মানবজাতির চারি দিকে বিদ্যমান; দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিলেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। সম্মুখে তপ্তকাঞ্চননিভ ব্রহ্ম-মূর্ত্তি, রসগোল্লা বর্ত্তমান; কিন্তু হস্ত বাতে পঙ্গু, নাড়িবার শক্তি নাই। আমার মনের সাধ মনেই মিলাইয়া গেল। ঐ দেখ; কোন নবাবপুত্রের—কোমরে গোট,—সিঁথাকাটা,—গায়ে পিরিহান—লম্বাকোঁচা,—কাকপক্ষবিশিষ্ট চাকর আসিয়া, ঠনাৎ করিয়া ১৲ টাকা ফেলিয়া দিয়া দুই সের রসগোল্লা নির্ব্বিঘ্নে লইয়া চলিয়া গেল। আমি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলাম। আফ্‌সোসে, দুঃখে বক্ষ ভাঙ্গিয়া গেল। ডাহিনে বামে, বলবীর্য্য-রূপগুণ-বুদ্ধিবিবেচনা,—আয়ুযশোদাতা মাংসের কালিয়া। পঙ্গু আমি, ঘ্রাণে অর্দ্ধভোজন করিয়াই রসনাকে পরিতৃপ্ত হইতে বলি। রসনা, তাহাতে কেঁদে কেঁদে

পৃথিবীকে ভিজাইয়া কাদা করে। আবার দেখ, ঐ সাদা-পাগড়ী মাথায়, পেণ্ট্‌লন চাপকান-পরা, দিল্লীর নাগরা জুতা-পায়ে, কোমরে চাদর বান্ধা, শ্বেতকায় পুরুষের চাকর সমাংস ঝোলটুকু সমগ্র লইয়া যায়। সাঙ্গাত ধরহে! পলায় যে? সাঙ্গাত বলেন, 'ভাই! আমারও হাতে ঐ বাত ধরিয়াছে।' বাস্তবিক এ জন্মটা আমরা শারীরিক ও মানসিক বাতে মারা গেলাম।" কার্ত্তিক বাবু ঈষৎ মুখ টিপিয়া হাসিলেন। "কার্ত্তিক বাবু এ হাসিবার কথা নহে। আপনার হাসি অপর সকল সময় ভাল লাগে, কিন্তু এ সময় সহ্য হয় না। দেখুন, এ পঙ্গু বাতের প্রতীকার না করিলে, ভারতের বার আনা লোক অনাহারে মরিবে; দুঃখে শৃগাল কুকুর পর্য্যন্ত কাঁদিবে; ভিক্ষাঝুলি স্কন্ধে করিয়া 'হা অন্ন, হা অন্ন' বলিয়া দ্বারে দ্বারে বেড়াইলেও, মুষ্টি পর্য্যন্ত মিলিবে না। আমাদের এরূপ সময় উপস্থিত হইবার আর বড় বেশী বিলম্ব নাই। মানব দেহ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া যদি অঙ্কুরেই আহারাভাবে মর, সন্তান সন্ততিকে দুগ্ধ বিনা বাঁচাইয়া রাখিতে না পার, তাহা হইলে কৃমিদেহ ধারণ করিয়া অনন্তকাল রৌরবে বাস করা সহস্রগুণে ভাল। মনুষ্য-জীবন যদি সার্থক করিতে না পারিলে, তবে বাঁচিয়া ফল কি? সার্থক করা দূরে থাকুক, যদি আহারাভাবে পশু দেহেরই ভার বহন করিতে না পার, তাহার যে কি দণ্ড, তাহা জানি না।"

দেখিলাম, কার্ত্তিক বাবুর গণ্ডস্থল বহিয়া বারিধারা পতিত

হইতেছে। রুমাল দিয়া মুখ পুঁছিয়া অতি ধীরে বলিলেন, আমি বড় দুঃখেই হাসিয়াছিলাম, যদি কিছু অপরাধ হইয়া থাকে, মার্জ্জনা করিবেন।”

সাঙ্গাত বলিলেন, “তোমরা দুজনে আজ যে নেহাইত বাড়াবাড়ি করিলে দেখিতেছি। মিছা ভাবনা ভাবিয়া, মিছা গোল করিবার আবশ্যক কি? এ ভারতে কেহ আর খাই-তেছে না, পরিতেছে না, নয়? পরমেশ্বর যখন জীবন দিয়া-ছেন, তখন অবশ্যই আহার যোগাইবেন। নচেৎ বিধির সৃষ্টি লুপ্ত হইবে। আর যদি বল, ওকালতীতে এখন সুখ নাই, সে কথা আমি মানি না। সত্য বটে, রাজধানীর নিকট কতক-গুলি জেলায়, উকীলের কিছু ঘেঁসাঘেঁসি হইয়াছে, কিন্তু বুদ্ধির বিচক্ষণতা থাকিলে সেখানেও পসার করা যায়। আর যাঁহাদের সরল বুদ্ধি, তাঁহাদের জন্যও অনেক দ্বার খোলা আছে —জলপাইগুড়ি যাও, রাঁচি যাও, কটক যাও, কিম্বা একটু বেশী পশ্চিম পানে ঠেলিয়া যাও—সেখানে এখন তত উকীল নাই, গমন মাত্র পসার। অতএব ও পদ আপনারা যেরূপ ঘৃণ্য বিবেচনা করেন, প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। আর যদি মনে করিয়া থাকেন, যে আমাদের চাকরি হইবে না, (যদি সত্য সত্যই এ কথা আপনাদের মনোমধ্যে উদিত হইয়া থাকে) তাহা হইলে, আপনারা নিতান্তই ভ্রমজালে জড়িত হইয়াছেন। চাকরির অভাব কি? ব্রজমাধব, প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। এখন কণ্ট্রোলার আফিসে তাহার ১৫০্

টাকা মাহিনা—বৃদ্ধিরও বেশ সম্ভাবনা আছে। আমাদের নিতাই—নেহাইত ঢেরাকাটা—কলিকাতায় একমাস ঘুরিয়াই ৫০৲ টাকার এক চাকরি বাগাইয়াছে। ঘোষেদের দিনু এল, এ, পরীক্ষায় দুইবার ফেল হয়, তার যদি এখন ধূমধাম—চেরেট বগি দেখ, তাহা হইলে অবাক্ হইতে হয়। তারিণী রায় ভারি গবাপশু ছিল—শিক্ষক প্রতিদিন দুইবেলা কাণ মলিয়া বেঞ্চের উপর দাঁড় করাইয়া দিতেন, উপরি উপরি সাত-বার ফেল হয়, আমরা কাণামাছি করিবার যোগাড় করিতেছি, এমন সময়ে তার চাকরি হয়। এখন কলিকাতায় এক মস্ত বাড়ী কিনিয়াছে, গাড়ী না হ'লে পথে চলে না। ভাই কি আর বলিব, সকলি অদৃষ্ট ও চেষ্টা। একবার আমাদের পাড়ার ৩০।৩৫ জন ছেলে, প্রবেশিকা পরীক্ষায় ধুপধাপ ফেল হয়; ঝড়ে যেরূপ কলাগাছ পড়ে, সেইরূপ তাহাদিগকে পাড়িল; একেবারে পাড়াকে-পাড়া সমভূম হইল। তাহাদের আকার-প্রকার, বিক্রম, এবং করাল নয়ন দেখিয়া আমার মনে বড় ভয় হইয়াছিল, যদি ইহারা কোন কাজে নিযুক্ত না থাকে, তাহা হইলে, ইহাদের উপদ্রবে পাড়ায় তিষ্ঠান ভার হইবে। কিন্তু জগদীশ্বরের ইচ্ছায়, তাহাদের সকলেরই চাকরি হইয়াছে,—কাহারও ২৫৲ কাহারও ৩০৲ কাহারও বা ৫০৲ টাকা মাহিনা হইয়াছে—প্রতি শনিবারে কারপেটের এক একটী ব্যাগ হাতে করিয়া বাড়ী আসিতে দেখি।"

চক্ষু ঘোরাল করিয়া আমার মুখপানে চাহিয়া পুনরায়

বলিলেন, "সাঙ্গাত! চাকরির অভাব কি? ধৈর্য্য ধরুন, অধ্য-বসায়শীল হউন, এবং চেষ্টা করুন; অচিরেই চাকরি হইবে। এক মাসে না হয়, দু-মাসে হইবে, দু-মাসে না হয় চারি মাসে হইবে, না হয় দুই বৎসরে হইবে। চেষ্টা থাকিলে, চাকরি হইবেই হইবে, কেবল দুই দিন অগ্রপশ্চাৎ মাত্র। কারণ চেষ্টার অসাধ্য কোন কার্য্য আছে কি? দুইটা কথা চাপিয়া বলিতেছি বলিয়া সাঙ্গাত! রাগ করিও না—কারণ ইহা রাগের কথা নহে। চাকরি ব্যতীত আর অন্য উপায়ই বা কি?—কই আমি ত কিছুই খুঁজিয়া পাইতেছি না। ব্যবসা বাণিজ্য? কৃষি কর্ম্ম? ভাই! কথাটা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম কর—ব্যবসা করিতে পুঁজি কই? চাষ করিতে জমী কই? মনে কর, না হয় কোন গতিকে দুই দশ বিঘা জমী পাওয়া গেল—বিশেষ প্রণিধান করিয়া বুঝ—তাহাতে পেট ভরিবে কেন? আর এ বয়সে, এত লেখা পড়া শিখিয়া এত পাস করিয়া, কায়স্থকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া, লাঙ্গলের মুঠ ধরিতে হইবে? ধিক্ ভারতের আর্য্যসন্তানদিগকে ধিক্! যাহা হউক, একটা কথা স্বীকার করি বটে যে, আজকাল চাকরির বাজার কিছু গরম; পূর্ব্বে যেরূপ সহজে চাকরি পাওয়া যাইত, এখন সেরূপ পাওয়া যায় না। কিন্তু সকল বিষয়েরই সস্তা মহার্ঘ্য আছে, আজ যে চাউলের মণ ২।।৶০; কল্য সেই চাউলই ৪৲ টাকার কম এক মণ পাওয়া যায় না; এবং পুনরায় দশ দিন বাদে সেই চাউলই ২৲ টাকা মণ

পাওয়া যাইতে পারে। চাকরির ঠিক সেইরূপ অবস্থা জানিবেন।

"যাহা হউক, যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক বিশেষ মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করেন, তাহা হইলে আর একটা কথা বলি। ইংলণ্ড গমন করিয়া, লেখাপড়া শিখিয়া, দেশে ফিরিয়া আসিলে অনেক উন্নতি করা যায়, বিশেষ সম্মান বাড়ে, এবং পয়সাও বেশ পাওয়া যায়। যদিও, আপনাদের মতে, রাজধানীতে উকীলের কিছু সম্মান কমিয়াছে বটে, কিন্তু বারিষ্টার-গৌরব কিছুই লাঘব হয় নাই—কারণ উহা লাঘব হইবার জিনিস নহে। যদিও, ওপদ প্রাপ্ত হওয়া কিছু ব্যয়সাধ্য বটে, তথাচ কায়ক্লেশে একবার ইংলণ্ড গমন করিয়া, বারিষ্টার হইয়া আসিতে পারিলে, দেশের অনেক উপকার। আমার ইচ্ছা যে, দেশের ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ, গরিব সন্তানদিগকে, অর্থসাহায্যে বিলাত পাঠান। কার্ত্তিক বাবু চুপ করিয়া রহিলেন যে?— এ সব বিষয়ে কথা কহিতেছেন না যে?"

কার্ত্তিক বাবু মনে মনে হাসিয়া গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন, "রসিক বাবু! এ কথায় আমি আর কি উত্তর দিব? আপনি দেখিতে চাহেন, না, শুনিতে চাহেন?" রসিক বাবু চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ করিয়া অনন্ত বক্তৃতা-সাগরের ঢেউ আরও বাড়াইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। আমি মধ্যে পড়িয়া বলিলাম, "সাঙ্গাত! ক্ষান্ত হও; যে ক্ষুধা বৃদ্ধি করিয়াছ, তাহারই আজ আহার যুটিবে না; আর তুমি যদি প্রত্যহ এরূপ কর, তাহা হইলে,

তোমার সহিত আজ অবধি পৃথকান্ন হইলাম; তুমি আলাদিয়া হাঁড়ি কাড়িও। সে যাহা হউক, আপাতত গোলাপী রেউড়ী, চেনাচুর বেচিতে যাইতেছে, তুই পয়সার কিনিব কি?" রেউড়ীর নামে সাঙ্গাত আমার বক্তৃতা ভুলিয়া গেলেন, স্বদেশানুরাগের বেগ থামিল,—আমারাও বাঁচিলাম।

এক দিন সোমবার প্রাতঃকালে, কার্ত্তিক বাবুর মাথায় হাত বুলাইয়া একটু চা খাইয়া, আমরা তিন মহাপুরুষে তিনখানি "সহজ-কেদারায়" বসিয়া সদালাপ করিতেছি। গার্হস্থ্য রজক দেখা দিল। ইতস্তত চাহিয়া রজক বলিল, "বাবুকে একবার উঠিতে হইবে, একটা গোপনীয় কথা আছে।" কার্ত্তিক বাবু বলিলেন, "এখানে অপর কেহ নাই, তুমি বল।" রজক তখন, বস্তানি হইতে সাহের-লোকের পরিধেয় "কলার" নামক এক টুকরা কাপড় বাহির করিল। বলিল, বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, হুজুরের যদি পছন্দ হয় লউন। কার্ত্তিক বাবু চমকিয়া উঠিলেন; অঙ্গ-যষ্টি মধ্যে যেন কোন বৈদ্যুতিক শক্তি চালিত হইল। কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন, "দেখ পীতাম্বর! এটি কার বলিতে হইবে।" পীতাম্বর বড় সায়েস্তা ধোবা। হস্তদ্বয় যোড় করিয়া বলিল, "হুজুর—মা বাপ; এ গোলাম—চাকর; আপনারও চাকর, তাঁহারও চাকর; অতএব গোলামের এ কসুর মাপ করিতে হইবে।" পূর্ব্বজন্ম পুণ্যফলে পীতাম্বর লেখা পড়া শেখে নাই; কার্ত্তিক বাবু বাক্যুদ্ধে জয়ী হইলেন। পীতাম্বর বলিতে বাধ্য হইল,—

"হুজুর! এই কাপড়রত্তিটুকু কাচিতে প্রতিধোপে চারি আনা করিয়া লইয়া থাকি। সাতবার কাচিয়াছি, সিকি পয়সাও পাই নাই। শেষে যাহার কাপড়, তিনি বলিলেন, ঐ কাপড় তুমি লইয়া যাও, আমি মূল্য দিতে অক্ষম।" অধিকারীর নাম শ্রীগোবিন্দচন্দ্র মিত্র, পেসা বারিষ্টারি।

রজক বিদায় হইয়া গেলে পর, রসিক বাবু স্থিরসিদ্ধান্ত করিলেন, এ কথাই নয়—এটি আমার এবং কার্ত্তিক বাবুর কারসাজি। সাঙ্গাতকে আমি ঢের বুঝাইলাম, কিন্তু কিছুতেই রাগ ফিরাইতে পারিলাম না। কার্ত্তিক বাবু মুখ টিপিয়া টিপিয়া মিষ্টি মিষ্টি হাসিতে লাগিলেন। এক খানি পত্র লিখিয়া ভৃত্যকে ডাকিলেন, "বেয়ারা!" ভৃত্য হাজির হইল। প্রভু ভৃত্যে হিন্দী ভাষায় যে কথাবার্ত্তা হইল, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। কারণ, সে হিন্দী, বেদ-কোরাণ-বাইবেল-বিবর্জ্জিত।

অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে শ্রীগোবিন্দচন্দ্র মিত্র "বারিষ্টার-অ্যাট-ল" আসিয়া উপস্থিত। কার্ত্তিক বাবু তাঁহার হস্ত ধরিয়া লইয়া একখানি চৌকীর উপর মহা সমাদরে তাঁহাকে বসাইলেন। শ্রীগোবিন্দের আকৃতি মলিন; অঙ্গ ক্ষীণ; মুখ চিন্তাপূর্ণ; চক্ষুর্দ্বয় শুভ্রবর্ণ; এবং শ্মশ্রু কেশবিহীন। পরিধান "রেলিভ্রাতার" ভবনের থান ধুতি; অঙ্গে পিরিহাণ আচ্ছাদন; এবং সীমান্ত-সীবিত উত্তরী স্কন্ধদেশে লম্বমান। কার্ত্তিক বাবু, গোবিন্দ সাহেবের নিকট * আমাদিগের পরিচয় দিলেন

* প্রথম প্রথম বিলাত হইতে আসিয়া "গোবিন্দ বাবু" বলিলে চটিতেন এবং

এবং বলিলেন, "আপনি যেমন আমার বন্ধু, আজ হইতে ইহাঁদেরও সেইরূপ বন্ধু হইলেন।" কিছুক্ষণ সকলে নীরব। তৎপরে কার্ত্তিকচন্দ্র সুমধুর স্বরে বলিতে লাগিলেন, "টাকার যদি এতই অনাটন হইয়াছিল, আমাকে লিখিয়া পাঠাও নাই কেন? "কলার বিক্রয়ের কারণ কি ছিল?" গোবিন্দ বাবু উত্তর করিলেন, "কার্ত্তিক! তুমি সময়ে সময়ে আমাকে অনেক-বার অর্থের সাহায্য করিয়াছ; তোমার নিকট আমি অতিশয় কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ আছি। এ জন্মে যে তোমার ঋণ পরি-শোধ করিতে পারিব, এমন সম্ভাবনাও নাই। আপাততঃ আমার হাতে টাকা নাই মনে করিও না; কিন্তু যাহা কিছু আছে, তাহা আর ধোবাকে দিয়া অপব্যয় করিতে পারি না। নচেৎ তোমার নিকট হইতে টাকা চাহিতে লজ্জা কি ছিল? সাঙ্গাত অবাক্ হইয়া রহিলেন।"

গোবিন্দ বাবুর বিশেষ পরিচয় জানিবার জন্য আমরা নিতান্ত উৎসুক হইলাম। গোবিন্দ বাবুও সে সুখে আমাদিগকে বঞ্চিত করিলেন না। বলিলেন "অধ্যবসায়, চেষ্টা পরিশ্রম এবং সাহসিকতা উন্নতির মূল; কিন্তু উপযুক্ত বিষয়ে, উপযুক্ত সময়ে, সম্যক্‌রূপে প্রয়োগ করা চাহি। নচেৎ মরুভূমিতে বীজ বপন তুল্য নিষ্ফল হয়। আমার অবস্থা ঠিক সেইরূপ, কিন্তু

রাস্তার ছেলেরা "বাবু" বলিয়ে, তাড়া করিয়া যাইতেন। যদিও, তাঁহার এখন আর সে স্বভাব নাই, অথচ আমাদের পূর্ব্বাভ্যাসবশত "সাহেব নাম" মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়ে।

সে জন্য আমি দুঃখিত নহি। আমার ভয়, পাছে আমার ইতিহাস কীর্ত্তিত হইলে, অধ্যবসায়, চেষ্টা, পরিশ্রম এবং সাহসিকতার নামে কলঙ্ক রটে, লোকে আর উহাদিগের তাদৃশ আদর না করে। আমার অবস্থা—পৈতৃক ভদ্রাসন বাটী বন্ধক; শ্বশুর বড় মানুষ,—আমার স্ত্রী, ২টী শিশু সন্তানের সহিত, তাঁহার পিতৃগৃহে বাস করিতেছেন। আমি একবার ৮৲ টাকা লইয়া মফঃস্বলে কোন আদালতে গিয়াছিলাম। প্রত্যাগমন করিয়া শুনিলাম আমার, বারিষ্টারদের বসিবার গৃহে প্রবেশ নিষেধ আজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছে—একঘরে করিবে এবং জাতিতে ঠেলিবে। আমি ভাবিলাম, হায়! রামে রাবণে একত্র হইয়া বুঝি আমার প্রাণবধ করিল। বৈষ্ণবকুল হারাইয়া, তাঁতিকুলে ছিলাম, এখন বুঝি তাহাও যায়। অদ্য ছয় মাস হইল, হাইকোর্টে গমন করা বন্ধ করিয়াছি। ইহা ব্যতীত আমার নামে, একটা ডিক্রী জারি আছে, সেই জন্য মনে করি, মুনি ঋষিরা যে গিরিগুহায় বাস করিতেন, সে ভালই ছিল।

কথা শেষ হইলে পর, ক্ষণেক সকলেই নিস্তব্ধ রহিলেন। বেলাটা অতিরিক্ত হইয়াছিল। কার্ত্তিক বাবু বলিলেন, "আপনারা অনুগ্রহ করিয়া এখানেই স্নান আহার করুন; কোন বিশেষ কথা আছে; আহারান্তে, চারিজনে মিলিয়া একটা পরামর্শ করিতে হইবে।" সাঙ্গাত বলিলেন, "না এখানে তা হইবে না, বাসায় যাইতে হইবে।" আমি বলিলাম, "তাহা হইতে পারে না, কার্ত্তিক বাবু বড় দুঃখিত হইবেন।"

জনান্তিকে সাঙ্গাতকে বলিলাম, "বাসায়, না গেলেই কি নয়? সেখানে ত একেবারে জামাই আদর! পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন প্রস্তুত করিয়া কেউ ডাকাডাকি করিতেছে কি?"

সেই দিবস দ্বিপ্রহরে আকণ্ঠপূর্ণ আহার করিয়া, কার্ত্তিক বাবুকে বাধিত করিয়া, সন্ধ্যার পূর্ব্বে জাগ্রত করিতে নিষেধ করিয়া, মহাসুখে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

জ্যোৎস্নাময়ী রজনী। শুক্লপক্ষের চতুর্দ্দশী। এ হেন রাত্রিতে, শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র ঘোষ, শ্রীগোবিন্দচন্দ্র মিত্র, শ্রীরসিক-চন্দ্র দাস এবং আমি—এই চারি বন্ধুতে, কার্ত্তিক বাবুর গৃহের কোন নিভৃত প্রকোষ্ঠে, চারিখানি চৌকীর উপর, নিস্তব্ধভাবে বসিয়া আছি। চতুর্দ্দিকেও নিস্তব্ধতা বিরাজমান। নিশ্বাসের শব্দ পর্য্যন্ত শুনা যাইতেছে না। আমাদিগকে দেখিলে অনেকেরই বোধ হইবে যে, আমরা গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। কার্ত্তিক বাবু বলিলেন,—"আমার একটী প্রস্তাব আছে; এ[illegible] আমরা চারি জনে মিলিয়া কলিকাতায় একটী সভা আহ্বান করি; এখানে অনেক সভা আছে বটে, কিন্তু একটির অভাব[illegible] অপরগুলি নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। আমাদে[illegible] সভা এরূপ ভাবে গঠিত হইবে যে, যে যাহা চাহিবে, সে তাহ[illegible] পাইবে; যাহার যে কামনা, তাহা পূর্ণ হইবে। ইহার মূল

উদ্দেশ্য, ভারতের উন্নতি; নাম "প্রার্থনা-পূরণ সভা" থাকিবে।

সভার নামে, সাঙ্গাত আমার বৎসহারা গাভীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "কার্ত্তিক বাবুর বিশেষ করিয়া বলা উচিত ছিল, সভায় কি কি বিষয় তর্কিত এবং আলোচিত হইবে। আমার মতে, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কোন বিষয়েরই বক্তৃতা না হয়।" কার্ত্তিক বাবু বলিলেন, "ইহা দ্বারা, ভারতবাসীর সকল অভাব মোচনের উপায় অবলম্বন করা যাইবে; যাহার যে অভাব আছে, জানাইলে, তদ্দণ্ডে সকল সভ্যগণ তন্মোচনার্থ যত্নবান্ হইবেন। যে খাইতে পায় না, তাহাকে খাইতে দিব; কামাস্কাটকায় দুর্ভিক্ষ হইলে চাউল দিব;—বিধবার বিবাহ দিব; যাহার মোকদ্দমার খরচ জুটে না, তাহাকে টাকা দিব; যে সাক্ষী পায় না, তাহার হইয়া সাক্ষ্য দিব; যাহার মুরুব্বি নাই, তাহার মুরুব্বি হইব; যে শিক্ষক পায় না, তাহার পণ্ডিত হইব; রোগী চিকিৎসক না পাইলে, কবিরাজ হইব; ঔষধ না পাইলে, ঔষধ দিব; যাহার চাকরি হয় না, তাহার চাকরি করিয়া দিব; কিমধিক, যাহার যে প্রার্থনা, তাহা পূরণ করিব, বা, পূরণ করিতে চেষ্টা করিব। সভার এই এক সুমহৎ উদ্দেশ্য হইবে। সমস্ত সভ্যগণ জীবন উৎসর্গ করিয়া এই মহাব্রত পালনে উদ্‌যোগী হইবেন।"

আমি বলিলাম, "যদি সভার কার্য্য কল্য হইতে আরম্ভ হয়, তাহা হইলে, আমার বড় একটা আশু উপকার করা হয়।

বাটী হইতে পত্র পাইয়াছি যে, গত পরশ্ব তারিখে আমাদের দোহা গাভীটি গোঁজ উপড়াইয়া দড়িশুদ্ধ পলাইয়া গিয়াছে; দড়ি গাছটি যায় যাক্, যাহাতে গাভীটি পাই, অনুগ্রহ করিয়া আপনারা তাহার চেষ্টা করিবেন। আর যদি একটু ছেলে হবার ঔষধ আপনাদের সভা হইতে দেন, তাহা হইলে বড় বাধিত হই। কার্ত্তিক বাবু আছেন, সাঙ্গাত আছ, যাহাতে আমার সুবিধা হয়, তাহাই করিবেন। ভোগের আগে প্রসাদ পাইয়া, আমার প্রার্থনা, নিবেদন করিয়া রাখিলাম।"

সাঙ্গাতের চক্ষু রক্তবর্ণ হইল। কুটিল নয়নদ্বয় কপালে উঠিয়া ঘুরিতে লাগিল। বিকৃত স্বরে, আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "পরিহাস?"—তৎপরে, মাতৃভাষায় মনের ভাব প্রকাশের উপযুক্ত কথা নাই বলিয়া, ইংরেজি-ভাষায়, অজস্র-ধারে সভ্য সমাজ অনুমোদিত গালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। আকার, ইঙ্গিত, ভাবগতিক দেখিয়া বোধ হইল, সাঙ্গত বা আমাকে সভ্যদেশের আইন জানিয়া প্রহার করেন।" * এমন সময়, নিরীহ ভাল মানুষ, গোবিন্দ বাবু মধ্যবর্ত্তী হইলেন, এবং বলিলেন, "আপনাদের কে কখন কাহাকে পরিহাস করিতেছেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। ইহার জন্য আপনাদের ঝগড়া করা উচিত হয় না। বিশেষ এই সময়ে গৃহবিবাদ উপ-

* "কোন সভ্য কোন অসভ্যকে প্রহার করিলে, কিম্বা একেবারে মারিয়া ফেলিলে, নালিশ চলে না; চলিলেও ভিস্‌মিস্ হয় এবং ফরিয়াদি দণ্ড পায়; ফরিয়াদীর অভাবে তৎপক্ষীয় সাক্ষিগণ কিম্বা তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ দণ্ডিত হয়।"

সভ্য মুলুকের দণ্ডবিধি, ১ম ধারা।

শ্বিত হইলে, কার্য্য সফল হইবে না। এইরূপ গৃহবিবাদেই, সুপ্রসিদ্ধ ফরাসিরাজ্য উৎসন্ন হইল।” আমরা উভয়েই অপ্রতিভ হইলাম।

কার্ত্তিক বাবু ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিলেন, বৃথা বাগ্‌বিতণ্ডায় সময় নষ্ট করা উচিত হয় না। সভা কলিকাতার গড়ের মাঠে বসিবে। উপরে এক বৃহৎ চন্দ্রাতপ আচ্ছাদন দেওয়া যাইবে। নীচে মাদুরি পাতিয়া বিছানা করিতে হইবে, কিন্তু যাঁহারা পরিধেয় বস্ত্রের অনুরোধে মাদুরিতে বসিতে অক্ষম, কেবল তাঁহাদের জন্যই কতকগুলি বেঞ্চ এবং চেয়ার রাখিতে হইবে। সভা প্রত্যহ দশটা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত থাকিবে—তৈলের খরচ লাগিবে না। এখানে জাতি-ভেদ থাকিবে না। কলিকাতায় এ সভার মূল কাণ্ড থাকিবে; আর হুগলি, কৃষ্ণনগর, বর্দ্ধমান, ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে ইহার শাখাসভা বসাইতে হইবে; আর কোননগর, গরিফা, কাঁচড়াপাড়া, গোপীনগর প্রভৃতি পল্লীগ্রামে, এই মহাকাণ্ডের এক পত্রসভা সংস্থাপন করিতে হইবে। কিন্তু প্রথমেই কতক-গুলি উপযুক্ত সভ্যের আবশ্যক। কল্য প্রাতঃকালে সহস্র কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সভ্য অন্বেষণে আমরা চারিদিকে বহির্গত হইব। দৈনিক এবং সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে এবিষয়ের বিজ্ঞাপন দিয়া, লোকসাধারণকে জ্ঞাত করাইতে হইবে। বলা বাহুল্য যে, অদ্য হইতেই আমরা চারি জন এ সভার সভ্য হইলাম।”

বন্ধুচতুষ্টয়ের মধ্যে আমি কেবল শেষ প্রস্তাবে সম্মত

হইলাম না,—বলিলাম ;—সভায় গমন করিবার আমার কোন বিশেষ প্রতিবন্ধক আছে। আপনারা পরিহাস বিবেচনা করিবেন না ;—ইহা গুরুর আজ্ঞা—বড় কঠিন আজ্ঞা। যে দিবস আমি দীক্ষিত হই, সেই দিন গুরুদেব আমার কর্ণবিবরে এক বীজমন্ত্র ঢালিয়া দেন। সেই দিন হইতে রাজনৈতিক জীবন, সামাজিক উদ্বেল এবং স্বোদর সেবন আমি একত্র সমাধা করিয়া থাকি। সেই দিন অবধি আমার হস্তপদ বদ্ধ হইয়াছে ; না হইলে, আপনারা কি আমাকে এতক্ষণ এখানে দেখিতে পান ?"

সাঙ্গাত শিহরিয়া উঠিলেন, গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "কি ভাই! কি প্রতিবন্ধক ? আমি বলিলাম, "ভাই, বীজমন্ত্র কাহাকেও বলিতে নাই ; কিন্তু আপনাদের সহিত আমার সেরূপ ভাব নহে ; সকলে এক আত্মা, এক প্রাণ, এক মহা-ব্রতে ব্রতী। বীজমন্ত্রের অর্থ এই যে, "তুমি সেস্থানে গমন করিবে না, যেখানে জলখাবার পাইবার সম্ভাবনা নাই।" সাঙ্গাত বলিলেন, "যদি সত্য সত্যই গুরুদেবের এরূপ আজ্ঞা হয়, তাহা হইলে তাহাই হইবে, তজ্জন্য আটক হইবে না।"

আমি বীরদর্পে অঙ্গ ঝাড়া দিয়া উঠিলাম। বলিলাম, "কে আমার সঙ্গে আসিবে, এস। সভা-অন্বেষণে বহির্গত হই। এইরূপে কার্ত্তিক বাবু দেশের উন্নতির আশায়, সাঙ্গাত বক্তৃতার লোভে, আমি ভৌতিক উৎসাহে, এবং গোবিন্দ বাবু অনুরোধে,—আমরা চারি জন সেই সুগভীর রজনীতে গৃহ-

প্রাঙ্গণ হইতে পদব্রজে সদর রাস্তায় বাহির হইলাম। ভারতের ভাবি-আশা, মানবজাতির গৌরব, সভ্য সমাজের নেতা, বঙ্গবাসীদের মুখ-চাওয়া-ধন, কুলতিলক চতুষ্টয় ভারত-উদ্ধারার্থ যাত্রা করিলাম।

নগরে আর গোলমাল নাই। রাস্তায় ভিড় নাই। গো-শকটগুলা কোথায় লুকাইয়াছে। দিবসের যিনি কোলাহল শুনিয়াছেন, তিনি বলিবেন, কলিকাতা এখন নিস্তব্ধ। নভোমণ্ডলে তারাদল-সহ চতুর্দ্দশী-চন্দ্র হাসিতেছে, পৃথিবী-প্রদেশে গ্যাসালোক-সহ রসিকচন্দ্র হাসিতেছেন। পরিশ্রান্ত জীবগণ ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। সাঙ্গাত তখন বলিতে লাগিলেন, "হে কলিকাতা-বাসিগণ! আর ঘুমাইও না, নেত্র মেলিয়া একবার চাহিয়া দেখ, কি কাণ্ড উপস্থিত!" আমি বলিলাম, "ভাই, রাস্তায় গোল করিও না, পুলিশে ধরিবে। আর এই মাত্র সকলে ঘুমাইতে আরম্ভ করিয়াছে, ইহারই মধ্যে উঠিবে কেন? কাঁচা ঘুমে জাগ্রত করিলে, পেটের ব্যারাম হইবে।" এবার সাঙ্গাত দ্বিরুক্তি না করিয়া চুপ্‌টি করিয়া রহিলেন। আমি তখন সাঙ্গাতের অনুমতি লইয়া শ্রীযুক্ত মিত্র, ঠাকুর, পাল প্রভৃতিকে আমন্ত্রণার্থ—ভিন্ন পন্থায় শকটারোহণে চলিলাম। এক ঘণ্টা পরে, কার্ত্তিক বাবুর বৈটকখানায় আমি নিদ্রাভিভূত। এদিকে কার্ত্তিক বাবু এবং গোবিন্দ বাবুর ক্ষমতায় অনেকগুলি বড় বড় বাছা বাছা সভ্য মিলিল। আহার নাই, নিদ্রা নাই, তাঁহারা সহরময় মনের উল্লাসে ঘুরিয়া সে নিশা

পর-হিতে যাপন করিলেন। অরুণোদয়ের সময় সাঙ্গাত আমার ঘুম ভাঙ্গাইলেন। বলিলেন "সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন না দিলে, এ মহাসভার বিষয় কলিকাতাস্থ বাল-বৃদ্ধ-যুবা, ছোট বড়, ইতরসাধারণ সমস্ত লোক কিরূপ প্রকারে জ্ঞাত হইতে পারে? কিন্তু অদ্য আর বিজ্ঞাপন দিবার সময় নাই। উপায় কি?" ভাবনায় তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন। "হায়রে পরের জন্য এত করি এত ভাবি। পর, আমাদের জন্য এক দিন ত ভাবে না।" অবশেষে সাঙ্গাত যুক্তি করিয়া স্থির করিলেন যে, বিজ্ঞাপনের পরিবর্ত্তে সহরময় ঢেঁট্রা দেওয়া হইবে। সাঙ্গাত এই কার্য্যের ভার লইলেন; কার্ত্তিক বাবু এবং গোবিন্দ বাবু গড়ের মাঠে সভা সাজাইতে গমন করিলেন। আমি আবার শকটারোহণে বহির্গত হইলাম! বৌবাজারের মোড়ের কাছে দেখিলাম;—হরিহর বায়েন স্কন্ধে টয়ে-বান্ধা জয়ঢাক করিয়া তাহাতে কাঠি দিতে দিতে, সাঙ্গাতের অগ্রে অগ্রে যাইতেছে; সাঙ্গাত মধ্যে মধ্যে এই বচন আবৃত্তি করিতেছেন,—"ওহে, ভাই সকল, আজ দিন দশটার সময়, গড়ের মাঠে, প্রার্থনা-নামক সভা বসিবে। যে খাইতে পায় না, সে খাইতে পাইবে, যে পরিতে পায় না, সে পরিতে পাইবে, রোগী ঔষধ পাইবে। যাহার চাকরি নাই, সে চাকরি পাইবে,—প্রার্থনা পূর্ণ হইবে। ওহে ভাই সকল! যে যেখানে আছ, দৌড়িয়া আইস।" আমার গাড়ী চলিয়া গেল, সাঙ্গাত আমাকে দেখিতে পাইলেন না।

একদা মৃত মহাত্মা দাশরথি রায় আমাকে স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন যে, "যদি সন্ন্যাসী গায়, তিনকড়ি বাজায় এবং আমি ছড়া কাটি, তাহা হইলে দেশে আর টাকা রাখি না।" কিন্তু এখন যদি তাঁহার সহিত আমার একবার দেখা হয়, তাহা হইলে, তাঁহার দর্প চূর্ণ করিয়া বলি, "যদি কার্ত্তিক বাবু সভাপতি হয়েন, সাঙ্গাত বক্তৃতা করেন, গোবিন্দ বাবু অধ্যক্ষ হন, তাহা হইলে, এক দিনেই ভারতমাতার উদ্ধার হয়।" কিন্তু দেহ পঞ্চভূতে না মিশাইলে, এ জীবনে কত সাধই যে বাকি থাকে, তাহা এ গরিব, মুখে কত বলিবে ?

দশটার সময় সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, সমস্ত কার্য্য সুচারুরূপে সমাধা হইয়াছে। লোকে লোকারণ্য ! সভাপতি কার্ত্তিকচন্দ্র বিরাট আসনে, গভীর ভাবে, আসীন; বামে বাগ্মি-প্রধান সাঙ্গাত—অতিশয় ব্যস্ত ; উত্তমাঙ্গের কেশ-কণ্ডূয়নেরও অবকাশ নাই ; দক্ষিণে নব ছত্রদণ্ড ধারণ করিয়া কার্য্যাধ্যক্ষ গোবিন্দ বাবু সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান—স্বয়ং পবননন্দন আমি ; তৎপরে মন্ত্রণানিপুণ, বয়োজ্যেষ্ঠ, শুভ্রকেশ, কৃতবিদ্য জাম্ববান্‌গণ। তাহার পরে মহারাজা, রাজা, রায়-বাহাদুর প্রভৃতি ধনী মানী সভ্যগণ। শেষে অনন্ত সাগরের অনন্ত বুদ্বুদতুল্য মনুষ্য-সমাবেশ। আমার প্রতি আদেশ হইল যে, তুমি অগ্রে কটক চর্চ্চাইয়া আইস,—কিরূপ ধরণের কত লোক আসিয়াছে,—তৎপরে বক্তৃতা আরম্ভ হইবে। আমি দিব্যচক্ষে সমস্তই দেখিতে লাগিলাম—৫ জন বারিষ্টার ; ১৫০

এম-এ; ৩০০ এম-এ-বি-এল; ৫০০ বি-এ-বি-এল; ৭০০ বি-এ; ১০০০ এল-এ; ১২০০০ এনট্রেন্স পাস; ৩২০০০ এন্‌ট্রেন্স ফেল,—সতৃষ্ণ নয়নে সভাপতির মুখপানে চাহিয়া, চাকরি প্রার্থী হইয়া দণ্ডায়মান আছেন; বুঝিলাম,—সংবাদ প্রাপ্ত হয়েন নাই বলিয়া অনেকে আসিতে পারেন নাই।

দেখিলাম, উইলিয়াম গড়ের পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া একখানি "বিষবৃক্ষের" আরম্ভের মত মেঘ উঠিতেছে। তখন ব্যস্ত হইয়া আমার জলখাবারের বন্দোবস্তটা কোথায় হইয়াছে অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। মেঘ গাঢ়তর হইতে লাগিল; সভাপতির নিকট উপস্থিত হইলাম। বলিলাম "আমার কই?" সাঙ্গাত জিজ্ঞাসিলেন, "আপনি যে কাজ করিতে গিয়াছিলেন, তাহার কি?" আমি বলিলাম, "আগে আমার জল খাবারের বিষয় বুঝাইয়া দাও, পরে তোমাদের বিষয় বলিব।" সাঙ্গাত বলিলেন, "এখানে আপনার আবার জলখাবার কি? এবার বিমান-গড়ে বিরাট তোপ হইতে লাগিল; আমি বলিলাম, "কি বলিলে, বিশ্বাসঘাতক? ইহাই কি তোমাদের স্বদেশহিতৈষিতা? ইহাতেই কি তোমরা আর্য্যসন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া, পবিত্র আর্য্যকুলে কলঙ্কারোপ করিতে চাও? ইহাতেই কি তোমরা স্বাধীন হইতে চাও? কুলাঙ্গার! জিহ্বা কাটিয়া নরককুণ্ডে ফেলিয়া দাও,—তোমাদের কথার ঠিক নাই কেন? লোকের আশা ভঙ্গ করিয়া কি সুখ পাও? ধিক্! যদি আমি পিতার পুত্র হই, যদি নিজ নারীর মুখ ব্যতীত অপর

নারীর মুখ কখন না দেখিয়া থাকি, যদি আমি ইংরেজ-পাদুকা এ উত্তমাঙ্গে কায়মনোবাক্যে চির দিন বহন করিয়া থাকি, তাহা হইলে, এখনি এই সভায় বজ্রাঘাত হইবে।"

ঝড় উঠিল। বিদ্যুৎ চমকিল। মেঘ ডাকিল। ঝম্ ঝম্ ঝম্ শব্দে শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হইয়া, ম্লাঙ্গাত-প্রমুখ সভ্যসকলকে আর্দ্র করিতে এবং প্রহার করিতে লাগিল। আমি লুক্কায়িত হইবার স্থান ইতস্তত অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। এক এক বার আকাশ কড় কড় করিয়া ডাকিয়া উঠে, আমি নয়ন মুদ্রিত করি, আর কতকগুলি শিল, ঝড়্ ঝড়্ করিয়া পড়িয়া যায়। হঠাৎ পৃথিবী আলোকিত হইল। অমনি বাজ পড়িল। সেই নিদারুণ বজ্রাঘাতে স্থাবর জঙ্গমাত্মিকা মহী কাঁপিয়া উঠিল। সমস্ত সভ্যই মূর্চ্ছাগত। আমিই কেবল ভয়ার্দ্র-হৃদয়ে মিটি মিটি দেখিতে লাগিলাম।

এহেন সময়ে, বিদ্যুৎ বজ্রাঘাত বৃষ্টির মধ্যে, পার্থিব জীব লোকের অচেতন অবস্থায়, এক দৈববাণী হইল, বজ্ররূপ কঠিন কলমে লিখিত হইল; স্বয়ং মহাকাল পাঠ করিলেন; এবং স্বয়ং আমি শ্রবণ করিলাম।

"যাও বৎস! গৃহে যাও; সভা করিতে পারিলে না বলিয়া কুণ্ঠিত হইও না; কলি-কল্মষনাশন সংবাদপত্রে ছত্র পূরণ করিতে অভ্যাস কর; ভারতের সকল দুঃখ দূর হইবে।"

শাশুড়ী বউ।

কলিকালের বউ রাজা। যা করে তাই হয়; যা বলে তাই ফলে; অতুল ক্ষমতা; ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, কুবের, হুতাশন, সম্মুখে থরহরি কম্পমান। মন্দমতি আমি, বধূর বিরুদ্ধে কি আর্‌জি লিখিব?

কলিকালে বধূ স্বামীর মাথার মহামণি,—আন্ধার ঘরের আলো; উদরের ক্ষুধা, পরীক্ষার পাঠ্য পুস্তক; বৌমা স্বামীর সর্ব্বস্বধন, অঞ্চলনিধি, নীলমণি। বৌয়ের কথায় সুধা বর্ষে, হাসিতে মুক্তা ঝরে, চলনে মেদিনী কাঁপে—ঐরাবত লজ্জা পায়, ক্রন্দনে মহা প্রলয় উপস্থিত হয়;—স্বামীর স্বামী, বউ-ভগবান্, সেই প্রলয়জলে খট্টাঙ্গরূপবটপত্রে যোগ-শয়ন করিয়া থাকেন। বউ রন্ধনে দ্রৌপদী, গৃহকার্য্যে বিশ্বকর্ম্মা, পতি-সেবায় বেহুলা, বিদ্যায় মা—সরস্বতী। পৃথিবীর সার ধন এহেন বৌ-ধনের বিরুদ্ধে আর্‌জি লেখা আমার কর্ম্ম নয়। টাকার লোভে কি বঙ্গীয় বৌমার কোপানলে পড়িয়া ভস্মীভূত হইব?

কিন্তু ঐ শুন, ওদিকে ক্রন্দন ধ্বনি কিসের? "হায়! অদৃষ্টে কি এই ছিল? কিন্তু দুঃখ করিব না, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিব না, বাছার আমার অমঙ্গল হইবে।" এই বলিয়া নীরবে একটী বৃদ্ধার নয়নযুগল হইতে বারিধারা পতিত হইতে লাগিল,—এ দৃশ্যটী কি? বধূর খাসমহলের প্রজা,

শ্রীগোলাম দাস, যখন মাতৃগর্ভে ছিলেন, তখন তাঁহার পিতার কাল হয়; জননী দাসীবৃত্তি করিয়া স্নেহময় পুত্রের লালন-পালন করিল, পুত্র সোণার শশীর ন্যায় দিন দিন বাড়িতে লাগিল। মাতা কলিকাতায় আসিয়া, কোন গৃহস্থের বাড়ী রন্ধনকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া পুত্রকে লেখাপড়া শিখাইলেন। পুত্র ক্রমে বি-এল, পাস করিয়া উকীল হইল,—তখন জননীর জন্মের সাধ, রাঙা বধূ ঘরে আসিল। সেই দিন অভাগী মাতার সংসারের সকল সুখ, সকল আশা ফুরাইল। জননী সেই দিন অবধি নানা অপরাধে অপরাধিনী হইল,—জননী চোর, হাঁড়িতে খায়, বধূকে মর্ বলিয়া, মা তুলিয়া, বাপ কাটিয়া গালি দেয়; সংসারে যত ভাল সামগ্রী, সব আপনি উদরসাৎ করে,—অধিক কি মাতা ক্রমে ডাইন হইল। কিন্তু পুত্রের বড় দয়ার শরীর, মাতার প্রতি বহুকাল হইতে অনুগ্রহও কিছু ছিল এবং পূর্ব্বের কৃত কর্ম্ম মনে করিয়া মাতাকে ডাইন অপরাধে,পুলিশের হাতে সোপরদ্দ না করিয়া, গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। ডাইনী মা—পোড়ার মুখী, তাই কন্না করিয়া গ্রামের প্রান্তভাগে বসিয়া আজ কাঁদিতেছে।

আজ-কাল ছেলেগুলো স্ত্রীকে কি যেন একটা অপূর্ব্ব জিনিষ মনে করে,—তাঁর কথাই বেদ, তাঁর কথাই ব্রহ্ম, তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্রী। যে সকল একরত্তি একরত্তি মেয়ের গলা টিপিলে দুধ বার হয়, সহবৎ শিখাইতে যাহাদিগকে প্রতি কথায় চক্ষু রাঙ্গান উচিত, তাহাদের হাতে এরূপ ক্ষমতা থাকিলে

আর কি রক্ষা আছে?—সংসার ভূকম্পের ন্যায় অবশ্যই টল্‌-টল্‌ কাঁপিবে।

পুত্রের দোষেই বধূগণ এরূপ বিকৃতভাবাপন্ন হইয়া থাকে। পুত্রের আদরের বউ, শাশুড়ীকে রাঙ্গাপদের চরণরেণু অপেক্ষাও নীচ বিবেচনা করেন। বউ রাণী, শাশুড়ী তাঁর বাঁদী। শাশুড়ীর আক্ষেপ উক্তিপূর্ণ এই শ্লোকই তাহার পরিচায়ক;—

বেটা বেয়ানু, বউকে দিনু, বৌয়ের হলাম বাঁদী;
এখন ইচ্ছা হয় যে বাহিরে বসে কাঁদি।

এখন আর সেকাল নাই,—সাবেক আইন উঠিয়া গিয়াছে; খাটিয়া খুটিয়া রাত্রে শয়ন করিলে পর, বৌমা আর শাশুড়ীর পায়ে তৈল মাখান না,—আহারান্তে শাশুড়ীর থালাপাথর মাজা দূরে যাউক,—একটা পাণ বা এক গ্লাস জলও এখন আর পোড়া শাশুড়ীর হাতে তুলিয়া দেন না। পুত্র কৃতবিদ্য হইলে বউ উপযুক্ত হইলে,—কলিকালে জননী সত্য সত্যই চাকরাণী হয়েন। তবে একটু প্রভেদ এই, জননী বিনা মাহিনার চাকরাণী; কেবল পুত্রস্নেহের ভিখারিণী। বধূর হিসাবে শাশুড়ী চোর হইলেও, বস্তুত সে বাজারের পয়সা চুরি করে না। চাকরাণীকে ভর্ৎসনা করিলে, সে অপর ঘরে যায়; জননী ভর্ৎসিত, লাঞ্ছিত, অবমানিত হইলেও, বধূর গৃহে বার মাস ভাতে-জলে থাইয়া অবস্থিতি করে। একমাত্র পুত্রের দোষেই জননীর এরূপ দুরবস্থা। পুত্র, বউকে শাসনে রাখিতে জানে না, সহবৎ দিতে জানে না,—শাসন সহবৎ দূরে যাউক,

বৌয়ের দোষ, পুত্র, গুণ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন,—নচেৎ বউ রাগ করিবেন। ধরিত্রী সর্ব্বংসহা, তাই এত সহিতেছেন; নচেৎ পুত্রের পাপে, বধূর পাপে ধরণীদেবী মনঃক্ষোভে এত দিন অতল জলে ডুবিয়া যাইতেন।

জননী কি এতই অপরাধিনী, এতই পাপিনী যে, এত লাঞ্ছনা করিয়া কি তোমাদের আশা মিটিল না, আবার তাঁহার নামে বঙ্গবাসীতে প্রবন্ধ লেখা? আবার একটী মেয়েলি ছড়া উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছ যে, শাশুড়ী বধূর প্রতি কিরূপ অন্যায় আচরণ করে, এই শ্লোকই তাহার পরিচায়ক। ছি! স্ত্রীর অনুরোধে কি এতটাই করিতে হয়? যদি ছড়ার কথা বলিলে, বৌয়ের বিরুদ্ধে, পুত্রের বিরুদ্ধে একাধারে যুক্ত-ছড়া নাই কি?—পুত্রের উক্তি;

মা! তোমার যে অতি, বেজায় কুমতি
বউকে সমিহ কর না।
এ ধূপের বেলা, সে রাঁধে দু-বেলা
তুমি বুড়ীবেটি! বসে খাও নড় না॥
সে নাকি ঘর-নিকুনী, তুমি নাকি ঘরের গিন্নি
এ শুনেত আমার প্রাণ আর বাঁচে না।
রুখু চুলে নেয়ে, হাত তোলা খেয়ে,
তার সোণার বরণ আর টেকে না॥
যাকে যা সে দেবে, সেই তাহা পাবে,
তা-ছাড়াত কেউ পাবে না॥

বৌএর পায়ের ধূলা-লব, মাথায় করে র'ব
তোমার বাবার কি তা বল না॥

ননদ ভাজ।

সংসারে আমার কি কেঁউ নাই? আমি অবলা, অনাথা, জন্মদুঃখিনী আমার হইয়া আপনারা দুকথা লিখিবেন কেন? আমি নিজের দুঃখে কাতর নহি—এ পোড়া দেহে কি না সয়? সেই দরিদ্রের মাণিক, অন্ধের নড়ি, জীবনের অবলম্বন সেই বাছার আমার, দুঃখ দেখিয়া হৃদয় ফাটিয়া যায়।

এ সংসারে দাদা বই আমি আর কাহাকেও জানি না, দাদা আমার রক্ষাকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা, স্নেহমমতার একমাত্র আধার। অল্প বয়সে শ্বশুরালয় হইতে ভ্রাতৃগৃহে আসিলাম,—কোলে কেবল ছয়মাসের শিশু সন্তান। মাতা পিতা অনেক দিন হারাইয়াছি, জগতের দুর্ল্লভ রত্ন, ইষ্টদেব, মহাপুরুষ স্বামীকেও হারাইলাম। কাঁদিতে কাঁদিতে কেবল দিন কাটিতে লাগিল—স্নেহের সাগর দয়ার ভাণ্ডার ভ্রাতা আমাকে বুঝাইতেন "হাস্যমুখ প্রফুল্লকমলতুল্য সন্তান তোমার কোলে রহিয়াছে, তোমা অপেক্ষা সুখী কে? আর আমি তোমার সহায়, তোমার ভাবনা কিসের? তুমি যদি চক্ষের জল ফেল, আমি গৃহে থাকিব না।" দাদার সেই অমৃতময় বাক্যে মনে বড় আনন্দ হইত।

কলেজের পড়াশেষ হইলে, দাদা বিবাহ করিলেন। ভ্রাতার বিবাহের জন্য আমি বহু দিন হইতে লালায়িত ছিলাম; নবম বৎসরের কন্যা—জন্মের সাধ বধূ গৃহে আসিলেন; আমার অন্তরের যে কত আনন্দ, তাহা আর কাহাকে বলিয়া শেষ করিব। বৌ লেখাপড়া শিল্পকর্ম্ম কিছুই জানিতেন না, পাছে বৌয়ের প্রতি দাদা সন্তুষ্ট না হন, এই ভাবিয়া আমি কত যত্ন করিয়া, কত সাধ্যসাধনা করিয়া, লেখা পড়া শিখাইলাম; ছুঁচের কাজ, পশমের কাজ শিখাইলাম; ভাল সহবৎ পায় নাই, সাধ্যমত কত ভালকথা শিখাইলাম, কত সদুপদেশ দিলাম। বধূর পিতা দরিদ্র ছিল, আমি একে একে নিজের সমস্ত গহনাগুলি বধূর অঙ্গে পরাইয়া দিলাম। দাদাকে বলিলাম, আমার গহনায় কাজ কি?—বউ পরিলেই আমার সুখ। গৃহের যত ভাল ভাল সামগ্রী দাদাকে না দিয়াও বউকে খাওয়াইতাম, স্বহস্তে মাথা বাঁধিয়া দিতাম, আমার যত বহু মূল্যের ভাল কাপড় সবই পরিতে দিতাম। গৃহের প্রাচীনা দাসী বলিত—"দিদি ঠাকুরুণ! বৌকে যে সব দিয়া, আপনি ক্রমে ফকির হইলেন।" আমি ঈষৎ হাসিয়া কিঞ্চিৎ কৃত্রিম কোপে বলিতাম, "দূর বুড়ী পাগ্‌লী, তুই জানিস, আমার প্রাণের সুরেশ অপেক্ষা, বৌকে বেশী ভাল বাসি।"

ক্রমে বউ মানুষ হইলেন। ক্রমে বধূর গুণগ্রাম প্রকাশ পাইতে লাগিল। বিধাতা আমার অদৃষ্টে ভাল লেখেন নাই—আমার দুঃখ করা বৃথা। ক্রমে আমার খাওয়ান, মাখান, পরান

বৌয়ের পছন্দ হইল না—আমার গৃহিণীপনায় বৌয়ের শরীর দগ্ধ হইতে লাগিল। আমি ভাবিতে লাগিলাম, এ আবার কি হইল? অমৃতে হলাহল উঠে কেন? আমি স্বহস্তে জলখাবার দিতে না গেলে দাদা সন্তুষ্ট হইতেন না; বৌ এক দিন আমার হাত হইতে জলখাবার কাড়িয়া লইয়া দাদাকে দিতে গেল। আমি ক্ষান্ত হইলাম; নীরবে এক ফোঁটা জল চক্ষুপ্রান্তে আসিল। ভাল মাছ আসিলে দাদা আমাকে রাঁধিতে বলিতেন; দাদা কয়েক জন বন্ধু বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, আমি বৃহৎ রুই মাছের কালিয়া করিতে গেলাম—সমস্ত উদ্যোগ হইয়াছে, এমন সময় বউ আসিয়া বলিলেন,—"সর, সর এখান থেকে উঠ আমি রাঁধবো।" আমি মনে ভাবিলাম, বউ যদি রাঁধেন, তাহা হইলে কাহাকেও ভক্ষণ করিতে হইবে না,—নিমন্ত্রণ পণ্ড হইবে—দাদাই বা আমাকে বলিবেন কি? প্রকাশ্যে বলিলাম, "বউ আজ থাক, আর একদিন তুমি রেঁধো।" আমার এই অপরাধ। আর সে কোথা যায়? বউ তখন সৃষ্টিসংহারিণী মূর্ত্তি ধরিলেন,—সে মূর্ত্তি আমি কখন দেখি নাই,—কখন কল্পনায়ও ভাবি নাই,—বিকট কণ্ঠে বলিলেন—"কি বলিলি হতভাগিনি, (আমার দোষেই নাটক পড়িয়াছিলেন) আমি আর এক দিন রাঁধবো? এ কার ঘর, কার দোয়ার, তুই জানিস্?—আজ দূর করে দিলে তোকে রাখে কে? তোর অনেক দোষ সহ্য করিয়াছি, কিন্তু আর সহ্য হয় না। তুমি এখনই দূর হ—!" আমি অবাক্

হইলাম, কোন কথার উত্তর দিলাম না, কেবল চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তখনও নিস্তার নাই—পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই। বধূ উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—"অ্যাঃ বড় শক্ত কথা বলা গেছে কি না,—তাই আবার কাঁদিতে বোস্‌লেন, খবরদার, এখানে চোখের জল ফেলতে পাবে না—আমাদের অমঙ্গল হবে। উচিত বল্লেই রাগ হয়—চখে জল আসে। কথায় কথায় চোখে জল। মাছের কালিয়া কোর্ত্তেন, আর ব্যাটার জন্য একবাটী লুকায়ে রাখতেন, সেটা আর হলো না কি না—তাই অমনি চোখে জল এলো।" তখন আর আমি থাকিতে পারিলাম না,—বলিলাম, "বউ, অমন কথা আমাকে বলো না,—আমি ছেলেকে কোন জিনিষ লুকায়ে খাওয়াই নাই—আমাকে যা বল্‌তে হয় বল, বাছাকে আমার কোন কথা বলো না।" "বল্‌বো একশ-বার বল্‌বো। কার খেয়ে তোর ছেলে এত বড় হলো?" বলা বাহুল্য, বধূর গভীর গর্জ্জন অন্দরমহল ভেদ করিয়া সদর মহলে গিয়াছিল; দাদা বউয়ের কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া তীব্রবেগে গৃহে আসিলেন; বউ দাদাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি গিয়া নিজ কক্ষে অর্গল-বদ্ধ করিলেন—দাদা আমাকে সম্মুখে পাইয়া, কাহার দোষ না বুঝিয়া আমাকেই কতকগুলা বকিলেন; বলি-লেন, আজ ৩।৪ জন লোক আছে, তোমার এরূপ গণ্ডগোল করা উচিত কি? এই বলিয়া দাদা বাহিরে গেলেন। আমার দুঃখের উপর দুঃখ হইল—প্রথমে ভাবিয়াছিলাম, আর রাঁধিব

না, কিন্তু না রাঁধিলে ফল বিষময় হইবে বলিয়া মনোদুঃখে রন্ধনকার্য্য সম্পন্ন করিলাম।

ক্রমে সকলের আহার হইল, দিবাবসান হইল; বধূ তখনও খিল খোলেন নাই; দাদাও জানিতেন না, বধূ এরূপ ভাবে গোষা-ঘরে শায়িত। সন্ধ্যার সময় জল খাইতে আসিয়া তিনি সমস্ত বিবরণ জানিতে পারিলেন। বউ দাদার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিল, তাহা আর কি বলিব? কিন্তু দাদার প্রকৃতি পরিবর্ত্তন হইয়াছে দেখিলাম; দাদা মন্ত্রৌষধ-গুণে যেন নতশির সর্প হইলেন। আমি নিশ্চয় বুঝিলাম, আমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে। বউ দাদাকে যখন কটুকাটব্য প্রয়োগ করেন, তাহাতে নিতান্ত আশ্চর্য্য হইলাম, সন্দেহ নাই; বধূর পাদ-পদ্ম ভ্রাতার করতলধৃত হইলেও যখন মানিনীর মান ভাঙ্গিল না—তখন গভীর বিস্ময়াপ্লুত হইয়াছিলাম সন্দেহ নাই; কিন্তু যখন অন্তরালে দাঁড়াইয়া শেষ-কথা শুনিলাম, সে বিষম কথা এখনও ভাবিলে বুক ফাটিয়া যায়; তখন মনে হইল, কেবল অবলা-বধের জন্য বিধাতা বুঝি দুষ্ট সরস্বতীকে আমার ভ্রাতৃ-কণ্ঠে অদ্য বসাইয়াছেন। আমার সেই গুণময় স্নেহের সাগর ভ্রাতার হঠাৎ এরূপ বিপরীত মতি হইল কেন? তখন আমি ইহার কিছুই কারণ বুঝিতে পারিলাম না। ইচ্ছা হইল, তখনই পুত্রের—প্রাণধন সুরেশের, হাত ধরিয়া এ গৃহ হইতে বাহির হই।

আজ জীবনের প্রথমাঙ্ক শেষ করিলাম; শেষাঙ্ক পরে

বলিব। বঙ্গের ঘরে ঘরে, ভগিনীর এইরূপ দশা কি না, আমি জানি না; আমার ইতিহাস মাত্র কেবল বলিলাম।

শ্রীমতী——

রমণী-রত্ন।

কিশোরী বাবু ভাল-মানুষের অগ্রগণ্য। দেড় শত খানি টাকা মাহিনা পান, ঘরে কেবল মাত্র শ্রীমতী লক্ষ্মীরূপিণী সুধামুখী স্ত্রী,—তথাচ কিছুতে কুলায় না, সংসার অচল, কষ্টের অবধি নাই। গৃহ হইতে আফিস্ দেড় ক্রোশের কম নহে; রৌদ্র প্রখর হউক, বৃষ্টি মুষল ধারে হউক, এক আনা দিয়া শেয়ারে গাড়ী করিবার সঙ্গতি নাই; কিশোরী বাবু স্কন্ধদেশে ছাতা রাখিয়া, বোতাম-বিহীন চাপকান আঁটিয়া ছিন্ন পাদুকায় মর্ম্মাহত হইয়া, ঠুক ঠুক করিয়া সেই একই ভাবে অবিরাম চলিতেছেন। কিশোরী বাবুর চেহারা দেখিলে মনে হয়, যেন পিতৃ-মাতৃ-দায় উপস্থিত, অথবা কোনরূপ প্রগাঢ় অম্লশূল ব্যারাম আছে।

গৃহলক্ষ্মীরও দুঃখের অবধি নাই; তিনি মনের মত ক্ষীর সর পান না; ভাল বারাণসী সাড়ী নাই—মতির মালা নাই—বোসেদের বৌয়ের মত জড়াও বালা নাই। তাঁহার কিছুই নাই। এতগুলি গুরুতর অভাবে, সেই অবলা, সরলা বঙ্গীয় বালার চোখ দিয়া কখন জলধারা প্রবাহিত হয়, মুখ দিয়া

কখন বজ্রধ্বনি বহির্গত হয়, পদভরে কখন ভূমিকম্প উপস্থিত হয়। প্রতিবেশিনীগণ কাণাকাণি করে ; ঘোষেদের বৌ একলা মানুষ কার সঙ্গে সদাই এত বচসা করে ? কিন্তু যার যাতনা সেই জানে। কোমল প্রাণে—আর কত কষ্ট সহ্য হইবে বল ? ঢের সহ্যগুণ—তাই সুধামুখী আজও স্বামীর ঘরে রহিয়াছেন।

তিনি যে দুদিন উপবাসী আছেন, তাহা কি চোখ-খাগী পাড়ার মেয়েরা দেখিয়াছে ? তাঁর যে মহাশোকে অন্তর দগ্ধ হইতেছে, তাহা কি কেহ ভাবিতেছে ? উঃ, আজ প্রায় এক সপ্তাহ—একযুগ অতীত হইল, তথাচ তাঁহার সেই সাধের গজমুক্তা-পরিশোভিত ডায়মন-কাটা নথ আসিয়া উপস্থিত হইল না। রমণী সর্ব্বংসহা, তাই তিনি এত সহিতেছেন, নতুবা এত দিন সুধামুখীর দেহ পঞ্চভূতে মিশান উচিত ছিল।

গজমুক্তার কথা কেহ কেহ পুরাণে শুনিয়াছেন ; কিন্তু ডায়মন-কাটা নথ যে কিরূপ, তাহা বোধ হয় অনেকেই দেখেন নাই। ঐ নথের কথা এক দিন ডেপুটী বাবুর স্ত্রী, মুন্সেফ বাবুর স্ত্রীর মুখে শুনিয়াছিলেন ; মুন্সেফ বাবুর স্ত্রী আবার, নাপিতিনী কামাইতে আসিলে, তাহার মুখে এইরূপ শুনিয়াছিলেন,—"ও-বাড়ীর মিত্তিরদের বড়াগিন্নীর জন্য বড়কর্ত্তা একটী ডায়মন-কাটা নথ গড়াইয়াছেন,—আহা সে নথটী কি চমৎকার! শুনলেম সেটীতে গজমুক্তা আছে। মিত্তির গিন্নীর আজ আর আহ্লাদ রাখিবার জায়গা নাই ; সোয়ামী ভাল-

থাস্‌লেই এই রকম হয়।" এইরূপে নাপিতিনী হইতে মুন্সেফ বাবুর স্ত্রী, মুন্সেফ বাবুর স্ত্রী হইতে ডেপুটী বাবুর স্ত্রী, আর ডেপুটী বাবুর স্ত্রী হইতে আমাদের সুধামুখী ডায়মন-কাটা নথের বিষয় শ্রবণ করেন। এইরূপ বার্ত্তা শুনিয়া সুধামুখী কিশোরী বাবুকে তলব করিলেন,—এবং হুকুম প্রচার করিলেন যে, এক সপ্তাহের মধ্যে মিত্তিরদের বড়'গিন্নীর মত নথ চাই। কিশোরী বাবু অনেক অনুসন্ধান করিয়া পাঁচ দিনের পর বলিলেন, ওরূপ নথ বাজারে পাওয়া যায় না। স্বামিমুখে এই নিদারুণ সংবাদ পাইয়া নিতান্ত মর্ম্মব্যথা পাইলেন; বুঝিলেন, তাঁহার অদৃষ্টে বিধাতা সুখ লেখেন নাই, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত মহাপাপের ফল এতদিনে ফলিতেছে; তাঁহার দুঃখময় নারীজন্মকে ধিক্কার দিলেন; অবশেষে ভাবিলেন, স্বামী যার বশ নহে—এরূপ প্রতিকূল, তার বাঁচিয়া সুখ কি? সেই দুঃখসন্তপ্তা গৃহলক্ষ্মী প্রতিজ্ঞা করিলেন, আমি অনাহারে প্রাণত্যাগ করিব। প্রতিজ্ঞাকালে শ্রীমুখ হইতে বজ্রাঘাতের ন্যায় যে ভীষণ শব্দ উত্থিত হয়, তাহাতে কিশোরী বাবু মূর্চ্ছা যাইবার উপক্রম হইলেন। তিনি ক্রমে যখন সব বুঝিলেন, তখন তিনি আরও বিবর্ণ হইলেন; ভাবিতে লাগিলেন, কি উপায়ে অগ্নিস্ফুলিঙ্গময়ী স্ত্রীর সম্মুখে উপস্থিত হইবেন। কিশোরী বাবু বাল্যকালে বেত্ররূপদণ্ডধারী গুরুমহাশয়কে তাদৃশ ভয় করিতেন না, অথবা নিজ প্রভু সাহেবের কাছে যাইতেও তত ভয় করেন না; কিন্তু মহা-মনিব স্ত্রীকে দেখিলেই ভয়ে জড় সড়, যেন হাড়িকাষ্ঠের

নিকট মেষশাবক। আজ ভয়ের উপর ভয়; যে উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি দেখিলে দেবতা, রাক্ষস, যক্ষ পলাইয়া যায়, মানুষ-কিশোরী কোন্ ছার? কিন্তু, অহহ!—কিশোরী বাবুর দোষেই ত তাঁহার কোমলপ্রাণা স্ত্রী এরূপ বিকৃত ভাবাপন্না হইয়াছেন! রমণী-রত্নের চক্ষু রক্তবর্ণ, অধর-ওষ্ঠ বিকম্পিত, দন্ত দুপাটী কিটি মিটি শব্দকারী, নাসিকা ঊনপঞ্চাশ পবনের ক্রীড়াভূমি, বক্ষে যেন কুলকাষ্ঠের আগুণের হোম হইতেছে। যেমূর্ত্তিতে পূতনা গোপবালক শ্রীকৃষ্ণের প্রাণসংহারার্থ উদ্যত হইয়াছিলেন, এ মূর্ত্তি তদপেক্ষাও ভয়ঙ্করী; যে মূর্ত্তিতে মহারাক্ষসী ভীষণবদনা ভীষণা, স-পাঞ্চালী-পঞ্চপাণ্ডবের স্বর্গপথ-গতি রুদ্ধ করিয়াছিল, সে মূর্ত্তি আজ অতি কোমল কমনীয় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ক্ষুদ্র পতঙ্গ কিশোরী বাবু সে দাবানল-সদৃশ, অভ্রভেদিশিখ মহাগ্নির নিকট যাইয়া কি করিবেন?

তখন:—কাতর, অশ্রুপূর্ণলোচন, ভয়চকিত-আনন, কম্পিত-বক্ষ কিশোরী কৃতাঞ্জলিপুটে, গললগ্নীকৃতবাসে, মধুসূদন নাম জপ করিতে করিতে সেই প্রলয়কর্ত্রী অগ্নিময়ী মহাদেবীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। হরকোপানলে রতিপতি ভস্ম হইয়াছিল, কলিতে রতিকোপানলে বুঝি বা হর ভস্ম হয়। কিশোরী, মহাদেবী সুধামুখীর স্তব আরম্ভ করিলেন,—'হে অগতির গতি! কিশোরীর সর্ব্বস্ব—যাঁর উদর পুরিলে কিশোরীর উদর পূর্ণ হয়, ক্ষুধায় ক্ষুধা, হাসিতে হাসি, ক্রন্দনে ক্রন্দন—সেই দেবী আমার প্রতি আজ প্রসন্না হও; যাঁহার ইচ্ছায়

সংসার চলে, অনিচ্ছায় সংসার লোপ হয়, যিনি ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফলদাত্রী—সেই দেবী প্রসন্না হও; যিনি চক্ষু বুজিলে ভুবন অন্ধকার, যাঁর কুটিলকটাক্ষে লোকপাল মূর্চ্ছিত,—যিনি সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী—সৃষ্টিস্থিতি-সংহারকর্ত্রী—সেই দেবী কাতর, কিঙ্কর, নাচার, বেচারা আমার প্রতি প্রসন্না হও। তুমি ঈশ্বরের ঈশ্বর, বিধাতার বিধাতা, অনন্তের অনন্ত, তুমি চন্দ্র, তুমি সূর্য্য, তুমি রাহু—আমি তোমা বই আর কাহাকেও জানি না, হে দেবী প্রসন্না হও।"

ইতি দেবীস্তবমাহাত্ম্যে প্রথম অধ্যায়।

পুরুষ-রত্ন।

কালীকৃষ্ণ বাবু স্ত্রীকে বড়ই ভালবাসেন, উচ্চ শিক্ষা দিতে চাহেন, সভ্য করিতে চাহেন, কিন্তু হতভাগিনী স্ত্রী তাহা বুঝে না, স্বামীর উপদেশ শুনে না। স্ত্রীটে এমনি বোকা যে, প্রণয় কি, কিসে হয়, তাহা আজও বুঝিল না। কালীকৃষ্ণ বাবু সহচরগণের নিকট দুঃখ করেন, "আমার উপযুক্ত স্ত্রী হইল না—এ জন্ম আমার বৃথা গেল।"

কালীকৃষ্ণ নবীন বাবু, ইংরেজিতে কথা কন; ইংরেজীতে চিঠি লেখেন; ইংরেজীতে ভাবেন। কালীকৃষ্ণ লোকমুখে এমনও শুনিয়াছেন, তিনি ঘরে খিল দিয়া কথা কহিলে,

বাহিরের লোকের ঠিক ইংরেজের কথা বলিয়া ভ্রম হয়। ২৪ ঘণ্টা টেড়িকাটা, কিন্তু বিশেষ কসুরত এই রাত্রের টেঁড়ি, প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের পরও, সেই একই ভাবে থাকে। সভ্য জাতির পোষাক অবশ্যই পরেন, কিন্তু এরূপ সভ্যতার পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছেন যে, হারমনকোম্পানীর বাটীর বস্ত্র ব্যতীত তাঁহার শ্রীঅঙ্গের কষ্ট বোধ হয়। এক দিন প্রতিবেশী-দরজী—মহম্মদ আলি অতি বিনম্রভাবে তাঁহাকে সেলাম করিয়া বলিল, "হুজুর! সাহেব বাড়ীতে কাপড় শেলাই আমার শেখা—আপনার কোট পেণ্টুলান যদি আমাকে ফরমাইস দেন, তাহা হইলে গরীব একমুঠা অন্ন করিয়া খায়।" এই কথা শুনিয়া হঠাৎ কালীকৃষ্ণ বাবুর শরীর ক্রোধে, ঘৃণায়, অপমানে থর থর কাঁপিতে লাগিল। নয়নদ্বয় জবাকুসুমের বর্ণ ধারণ করিল; অধিক কি—যেন বক্ষে শূলবিদ্ধ, ভগবতীপদ-দলিত মহিষাসুরের ন্যায় তীব্রলোমহর্ষণ আকৃতি হইল! গভীর গর্জ্জনে বলিয়া উঠিলেন, "ক্যায়া তোম্‌সে হ্যাম কাপ্‌ড়া লেঙ্গে?" এই বলিয়া চেয়ার হইতে বীরমূর্ত্তিতে লম্ফ প্রদান করিয়া উঠিলেন; এবং তাঁহার কথবার্টসেন-ভবনের চর্ম্মপাদুকা-শোভিত দক্ষিণ পদ, গরীব দরজীর ক্ষীণবক্ষে সজোরে পতিত হইল। দরজী পড়িয়া গেল। বাবু "ক্যোই হ্যায়" বলিয়া মহাচীৎকার করিয়া উঠিলেন। চাপরাসী অমনি "খোদাবন্দ" হাঁকিয়া দৌড়িয়া আসিল। বাবু হুকুম দিলেন, "গর্দ্দান পাক্‌ড়কে ইস্কো নিকালো।" দরজী তখন অঙ্গের ধূলি ঝাড়িয়া উঠিয়া বলিল,

"সাহেব! ম্যঁয়নে কেয়া কসুর কিয়া?" বাঙ্গালী-সাহেব "চুপরও" বলিলেন এবং চাপরাসীর প্রতি রক্তবর্ণ চক্ষুতে তাকাইলেন। চাপরাসী তখন তাহাকে অর্দ্ধ চন্দ্র দিতে দিতে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। খলিফা, চাপরাসীকে, "ক্যায়া কসুর কিয়া?"—এই কথা বিনীতস্বরে বলিতে বলিতে চলিল। চপরাসী বলিতে লাগিল "কেয়া জানে ভেইয়া!"

বাবু এইরূপে রুদ্রমূর্ত্তিতে অসুরদলন করিয়া মহাশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। উপযুক্ত অনুগত ভৃত্য এক গ্লাস সুধা আনিয়া সম্মুখে ধরিল। কিন্তু মহা সংগ্রামের পর সামান্য সুধায় কি হইবে? অমৃতের কলসী না হইলে, সে তৃষা ভাঙ্গে কি? ভৃত্য ইঙ্গিতে মনিবের নিদারুণ ক্লান্তি বুঝিয়া মনোগত কার্য্য করিল। বাবু এইরূপে প্রকৃতিস্থ হইয়া, চুরুট-ধূমে গৃহব্যাপ্ত করিয়া, লণ্ডন-রহস্য নামক ইংরেজী কেতাব পড়িতে লাগিলেন।

এমন সময় প্রাণের বন্ধু মোহিনীমোহন ঢুলু ঢুলু নেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একটুকু অমৃতের জন্য দেবাসুরে সংগ্রাম বাধিয়াছিল, কিন্তু অদ্য কালীবাবুর মজলিস অমৃতময় হইয়া উঠিল। তখন মোহিনীমোহন বাবু বলিলেন, "What about the reformation? ছি! সকলি তোমার কথার কথা। কাজে কিছুই করিতে পারিলে না। You know reformation like charity, ought to begin at home!' কালীবাবু বলিলেন

—"Oh that obstinate girl! the curse of my life! আমি কি করিব বল! স্ত্রীকি আমার কথা শুনে? নইলে আমার এত কষ্ট কিসের? তুমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে কথা কহিবে, তাহাতে আপত্তি কি ভাই?

মোহিনী। আচ্ছা—সে বিষয়টার কি হলো?

কালী। সে কথা বলিলে, আরও সে ক্রুদ্ধ হয়। ভাই! আমি একদিন অনেক সাধ্যসাধনা করিয়া স্ত্রীকে বলিয়াছিলাম, তুমি যদি এক ফোঁটাও মদ এক ছটাক জলে মিশাইয়া খাও, তাহা হইলে, এমন কি, আমি রাত্রে বেড়ান বন্ধ করি। কিন্তু ঈশ্বর আমার প্রতিকূল, সে সুখ এ পোড়া অদৃষ্টে ঘটিবে কেন? আমার আত্মঘাতী হইতে ইচ্ছা হয়।

মোহিনী। "তুমি বড় কাপুরুষ! স্ত্রী-বশ করিতে পারিলে না হে! তোমার জীবনে ধিক্!—অথবা সমাজ-সংস্করণ-কার্য্যে তোমার আন্তরিক ইচ্ছা নাই। চেষ্টার অসাধ্য কার্য্য আছে কি?"—"আন্তরিক ইচ্ছা নাই"—এই কথাটী কালী বাবুর হৃদয়ে বড় বিষম বাজিল, ক্রমে চক্ষে জল আসিল। ক্রোধে, ক্ষোভে বলিলেন—"আজ যেরূপে পারি, স্ত্রীকে সভ্যতালোকে আনিব।"

তখন অতি ব্যগ্রচিত্তে স্ত্রীকে সংস্করণ করিতে উঠিলেন। বৈটকখানা হইতে মস্ মস্ শব্দে গৃহে প্রবেশ করিলেন। রাত্রি নয়টার অধিক হয় নাই। কালী বাবুর স্ত্রী—সপ্তদশ-বর্ষীয়া রমণী, নিজকক্ষে পালঙ্গে অধোবদনে বসিয়া আছেন;

শয়নের সময় হইলেও শয়ন করেন নাই—একাকিনী ম্লানমুখে বসিয়া কি ভাবিতেছেন ! চক্ষুঃকোণে জলবিন্দু । বালিকা-কালে পিতামাতার বড় আদরের মেয়ে ছিলেন—যাঁর চক্ষে এক ফোঁটা জল দেখিলে, জনক জননী কাতর হইত, সে বাপ মা আজ কোথায় ? সনাথিনী হইয়া আজ অনাথা ! মহামূল্য পর্য্যঙ্ক, সুরঞ্জিত শয্যা, মনোহর অলঙ্কার, সুন্দর দীপালোক—সকলি মলিন । রমণী এক একবার অস্ফুটস্বরে বলিতেছেন, "মা, আমায় প্রতিদিন কেন যে এ সব গহনা পরিতে বলেন, তাহা ত বলিতে পারি না ।" এই বলিয়া কবরী হইতে সুবর্ণগোলাপ উন্মোচন করিলেন, গলদেশ হইতে হীরক-খচিত চিক খসাইতে উদ্যত হইলেন, এমন সময় স্বামীর পাদুকাধ্বনি যেন সিঁড়িতে শুনিতে পাইলেন, একাগ্রচিত্তে কাণ পাতিয়া রহিলেন । এক একবার মনে করিতে লাগিলেন, এমন অসময়ে, এ রাত্রে তিনি কেনই বা এখানে আসিবেন ? কিন্তু ক্রমে যখন নিশ্চয়ই বুঝিলেন, স্বামীই বটেন, তখন অতি ব্যগ্রচিত্ত হইলেন । কি বলিয়া যে স্বামীকে সম্ভাষণ করিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না । রমণী-হৃদয় আহ্লাদে একটু দুলিয়া উঠিল । ঝটিতি—কেহ যেন দেখিতে না পায়, এই ভাবে সুবর্ণ গোলাপটী আবার পরিলেন এবং পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া রহিলেন । এমন সময় পুরুষপ্রবর আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।

কালী বাবু, সহধর্ম্মিণীকে যেন ঈষৎ তুষ্টভাবে বলিলেন,—"মাই ডিয়ার, ঘুমিয়েছ নাকি ?—তুমি জান, আমি তোমাকে

কত ভাল বাসি !—Thou the soul of my life ! দেখ দেখি, তোমায় কত গহনা দিয়াছি ?—শীঘ্র উঠিয়া ব'স।" এই বলিয়া কালী বাবু নিকটস্থ চেয়ারে উপবেশন করিলেন ; স্ত্রী খাটের এক পার্শ্বে ঈষৎ অবগুণ্ঠন দিয়া বসিয়া রহিলেন। কালী বাবু বলিলেন, "ওকি, তুমি কথা কহিতেছ না কেন ? আজ লজ্জা করিলে চলিবে না। লজ্জা আমি বুঝি না—তোমাকে শীঘ্র কথা কহিতে হইবে,—আমি বৃথা সময় নষ্ট করিতে পারিব না" স্ত্রী দেখিলেন, স্বামী সহজ নাই, কি করেন, ধীরে ধীরে, ভয়ে ভয়ে, অস্ফুট স্বরে কহিলেন—"আমাকে কি বলিবেন, বলুন।" কালী বাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন—"তুমি স্বামী সম্বোধন করিতে জান না, তোমার Education বড় কম। আমি তোমার স্বামী, আমি তোমাকে শিক্ষা দিব।" রমণী আজ স্বামীকে যেন কিছু অনুকূল দেখিয়া একটু সাহস পাইয়া বলিলেন, "আপনি, কৈ আমাকে ত এক দিনও লেখা-পড়া শিখিবার কথা বলেন নাই ?" কালী বাবু বলিলেন, "না, তোমার তিলার্দ্ধও শিখিবার ইচ্ছা নাই ; ইচ্ছা থাকিলে—আমার স্ত্রী হইয়া তুমি মুর্খ, তুমি অসভ্য হইতে না।" স্ত্রী তখন ভাব গতিক দেখিয়া একটু ভীত ও দুঃখিত হইলেন। কালী বাবু আরও বলিতে লাগিলেন—"তুমি আমার স্ত্রী হইয়া আজও যে সুরার গৌরব বুঝিলে না, ইহাই আমার দুঃখ—সাহেবদের দৃষ্টান্ত তুমি কি দেখ নাই ? নীরব থাকিও না, স্বামীর প্রশ্নের উত্তর দাও।" স্ত্রী তখন নিতান্ত

মর্ম্মাহত হইলেন ; বুঝিলেন বিধাতা নিশ্চয় বাম হইয়াছেন ; —চক্ষুর্দ্বয় ছল ছল করিতে লাগিল। কিন্তু স্বামীকে নাছোড়-বান্দা দেখিয়া অবনতবদনে ধীরে ধীরে বলিলেন,—"আমি আর আপনাকে কি বলিব?"—স্বামী তখন একটু ক্রোধ এবং ঘৃণা দেখাইয়া বলিলেন—"Nonsense! তুমি স্বামীর কথা শুনিবে কি না?—তোমার Education চাই। মোহিনী বাবু তোমার শিক্ষক হইবেন; তাঁহার সহিত তোমার আজ আলাপ করাইয়া দিব, তিনি তোমাকে রোজ এক ঘণ্টা পড়াইবেন। তিনি যখন আমার bosom friend, তখন তোমারও bosom friend"। এই কথা শুনিয়া স্ত্রী বড়ই কাতর হইলেন; বুঝিলেন, আবার সেই সর্ব্বনেশে কথা উঠিয়াছে,—ভয়ে প্রফুল্ল-মুখ-কমল একেবারে বিশুষ্ক হইয়া গেল, অতি মৃদুস্বরে, বিনয়ে, অশ্রুপূর্ণলোচনে বলিলেন—"আমাকে ক্ষমা করুন, ইহা ছাড়া আপনি যা আমাকে বলিবেন, আমি তাহাই করিব।"

কালী বাবু বলিয়া উঠিলেন—"ওঃ হোঃ, তুমি তোমাদের শাস্ত্রে অবশ্য শুনিয়াছ—স্বামীর আজ্ঞা লঙ্ঘন মহাপাপ। Dont' you remember about a month ago তোমার হস্তে একগ্লাস ব্রাণ্ডি দিয়াছিলাম; তুমি স্বামীর অবমাননা করিয়া স্বামীর সাক্ষাতে তাহা ভূতলে ফেলিয়া দিলে—a downright insult! কোন অশিক্ষিত, দুশ্চরিত্র স্বামীর হস্তে পড়িলে, সেই দিনই উত্তম শিক্ষা পাইতে; আমি বলিতেছি,

তোমার নরকেও স্থান নাই। তুমি এডুকেশন পাও নাই—সুরার মর্ম্ম কি বুঝিবে? ইংরেজী পুস্তকে পড়িয়াছি, ব্রাণ্ডি ব্যতীত স্ত্রী-পুরুষের পবিত্রপ্রণয় জন্মে না। আমি তোমার স্বামী, তোমাকে ব্রাণ্ডি খাওয়াইয়া, ফ্রেণ্ড মোহিনীর সহিত কথা কহাইয়া তোমাকে এডুকেশন দিব। তুমি সহজে না আস, বলপূর্ব্বক বাহিরে লইয়া যাইবার আমার অধিকার আছে। উঠ, চল, বন্ধু-মোহিনীর কাছে চল।—এই বলিয়া স্ত্রীর নিকট ক্রমশ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। স্ত্রীর চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইতে লাগিল, কেবল ধীরে ধীরে, করুণস্বরে বলিতে লাগিলেন—"আমায় ক্ষমা করুন, আমায় ক্ষমা করুন।"

এদিকে কালীবাবুর গলার গভীর নির্ঘোষ শুনিতে পাইয়া ভগিনী লক্ষ্মী দ্রুতবেগে আসিয়া পড়িল,—হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিতে লাগিল, "বউ কাঁদ্চো কেন? কি হয়েছে?" এমন সময় বৃদ্ধা জননী গুটি গুটি আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"বাবা কালী! বৌমাকে কি এমন করিয়া মারিতে হয়? ছি! বাবা, লোকে শুন্‌লে বলিবে কি?"

কালীকৃষ্ণ বাবু উত্তর করিলেন—"মাতা! তুমি কিছুই বুঝ নাই; আমি সমাজ-সংস্করণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, বঙ্গের দুর্দ্দশা দূরীকরণার্থ কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলাম, কিন্তু ভগবানের সেরূপ ইচ্ছা নহে—O it will take centuries to reform your country.—What can a Cato do against a base degenerate world!"

বৃদ্ধা, কন্যাকে বলিল, "লক্ষ্মি! একটু জল আনিয়া শীঘ্র বাছার মাথায় দাও।"

কালী বাবু অবশেষে "Alas my country!" এইরূপ উচ্চারণ করিতে করিতে বহির্ব্বাটীতে আসিলেন। বন্ধু মোহিনী বলিলেন—"Quite discomfited? Cheer up my good old fellow; persevere and you will succeed."

বঙ্গের ভরসা।

এ সব কথা বলি কাকে? এ দুঃখের কথা শুনেই বা কে? আমার এক জন প্রতিবেশী বন্ধু মাতাল হইয়া উঠিল। জানিতে পারিয়া আমি তাহাকে ভর্ৎসনা করিলাম, সেদিন সে চুপ করিয়া রহিল। আর এক দিন উপদেশ দিতে গেলেম, সেদিন সে আর নীরবে না থাকিয়া বলিল, "আমি অর্থহীন লেখাপড়া কম জানি বলিয়াই কি এত লাঞ্ছনা দিতেছেন? আপনার আশে পাশে আমা অপেক্ষা যে দুরন্ত অপরাধে অপরাধী রহিয়াছে, সে মহাপাপীদের সহিত আপনি হাসিয়া কথা কন কেন? কৈ তাহাদিগকে ত একদিনও একটা চড়া কথা বলেন নাই?—তবে আমি দরিদ্র-সন্তান, টো টো করিয়া বেড়াই বলিয়াই কি আমাকে গালি দেওয়া আপনার সহজ? আপনার যত রোখ সবই কি আমার উপর?" আমি নিস্তব্ধ, উত্তর দিতে পারিলাম না, ভাবিলাম, কথা ত বড়

মিথ্যা নয়। "পাড়ার নবদূর্ব্বাদলশ্যাম—নবীন নাগর গুণের সাগর, ধর্ম্মের আকর সেই গোপিনী-মনোমোহন সুরা-সেবনে আজ বুদ্ধিহীন, কর্ম্মকাণ্ড-বিহীন,—যাঁর অর্দ্ধাঙ্গী সহ-ধর্ম্মিণী গৃহের ক্রীতদাসী অপেক্ষাও অধম, যাঁর গর্ভধারিণী জননী কাঠকুড়ানী অপেক্ষাও ম্লানমুখী, সেই কুলাঙ্গার পুরুষের সহিত পথে দেখা হইলে, তুমি তাহার সেই পাপপঙ্কিল হস্তে হস্ত দিয়া, "সেকেণ্ড" কর কেন?—সেই দুরাচার ২।৪ টা পাস করিয়াছে বলিয়া কি?—না, মাসে ২।৪ শত টাকা রোজগার করে বলিয়া? তখন কি তোমার ঘৃণা বোধ হয় না? তোমার যত বাক্‌পটুতা গরীবের কাছে?"

সমাজের উচ্চস্থানীয় লোক—কৃতবিদ্য এবং ধনবান্ ব্যক্তি কোথায় উপদেশ দিয়া, নিজের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া জন-সাধারণকে সৎপথে আনিব,—কিন্তু তাহা না হইয়া, আজ তদ্বিপরীত ঘটিতেছে। কবি উপন্যাস লেখক, ডেপুটী, উকীল, জমিদারপুত্র ইত্যাদি—ইহাঁদের অনেকেই পাপস্রোতে—মত্ততায় গা ঢালিয়া দিয়াছেন। কবি বলিয়া থাকেন—"সুরাপান না করিলে, সহধর্ম্মিণী ব্যতীত অপরা স্ত্রীতে আনু-রক্তি না হইলে, প্রকৃত কবিত্ব খোলে না।—পৃথিবীর ইতিহাস পাঠ কর, ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবে। সেক্সপিয়র, বাইরণ, ভাল্টেয়ার, রুসো, মাইকেল কি ছিলেন?" ছি! এ সব লোকের সঙ্গে কি তর্ক করিতে আছে?

এক দিন কোন এক সম্প্রদায় সুপণ্ডিত লোকের মজলীসে

উপস্থিত হইলাম। সম্মুখে দেখিলাম, এক বৃহৎ টেবিল; তদুপরি সুস্বাদু, সতেজ, নিস্তেজ, দ্রবময় পদার্থপূর্ণ—নীল পীত, লোহিত রঙের বোতল। তৎপার্শ্বে রৌপ্য-নির্ম্মিত পাত্রে কটলেট, চপ, রোষ্ট। মাতালগণ গ্লাসে সুধা ঢালিতেছেন,—বক্ষ, হৃদয় পরিতৃপ্ত করিয়া অশ্লীল গল্প করিতেছেন, মধ্যে মধ্যে স্বদেশানুরাগের কথার ঢেউ উঠিতেছে; বলিতেছেন, দেশে লোকশিক্ষার প্রচার চাই, জয়েন্টষ্টক-কোম্পানী করিয়া দেশে কাগজের কল, কাপড়ের কল, দিয়াশেলায়ের কল চাই,, দেশে কৃষিবিদ্যালয় সংস্থাপিত হওয়া চাই। এই কথা বলিতে বলিতে আবার ব্রাণ্ডি ঢালিয়া বদন-সুধাকরে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। তেজ চড়িয়া উঠিল, ধমনীতে আর্য্যশোণিত দ্বিগুণতর-বেগে বহিতে লাগিল, একজন বলিয়া উঠিলেন—দেশ উদ্ধার কথায় হইবে না, কার্য্য চাই কার্য্য চাই। তখন সভা হইতে ব্রেভো ব্রেভো, শব্দ উত্থিত হইল। আবার সেই রোগশোক-বিনাশিনী, চতুর্ব্বর্গফলদাত্রী ব্রাণ্ডি মহাপাত্রে ঢালিত হইয়া সকলের উদরে—গিরিগহ্বরে নিহিত হইল; "কথায় আবশ্যক নাই—কার্য্য চাই কার্য্য চাই" সকলে এই বুলি ধরিলেন,—অবিরাম অবিশ্রান্ত, শ্রাবণের বারিধারার ন্যায়—"কার্য্য চাই"—এক প্রহর কাল কেবল এই শব্দ। অনন্তর মাতালগণ মহাবিষে জর্জ্জরীভূত হইয়া ক্রমে ক্রমে ধরাশায়ী হইলেন।

আর এক দিন মনে পড়ে।—একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী স্থানান্তরিত হইলেন। নগরের কতকগুলি সম্ভ্রান্ত কৃতবিদ্য

লোক বাগানে ভোজ দিয়া তাঁহাকে বিদায় দিবেন স্থির করিলেন। বলিতে লজ্জা বোধ হয়, সেই প্রীতি-ভোজনের প্রধান আয়োজনই—সুরা এবং বার-বনিতা। যাঁহাদের সৌম্যমূর্ত্তি দেখিয়া ভক্তি হইত, যাঁহাদের কথা শুনিয়া প্রাণ জুড়াইত, সেই নাগরিক মহোদয়গণের মদবিহ্বল-দেহ, জড়ীভূত ভাঙা-ভাঙা কথা দেখিয়া শুনিয়া সে দিন তাঁহাদিগকে পিশাচ অপেক্ষাও অধম বলিয়া বোধ হইল। যাহাঁরা দেশের উদ্ধারকর্ত্তা বলিয়া ভাণ করেন, খোলাভাঁটীর প্রাদুর্ভাব দেখিয়া যাহাঁরা প্রবন্ধ লেখেন, বক্তৃতা করেন, জনসাধারণ যাহাঁদের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিতে চাহে, সেই উচ্চপদস্থ এবং সম্ভ্রান্ত লোকের দশা যখন এইরূপ হইল, তখন আর কাহাকে কি বলিব? রামধন তাড়ি খাইয়া পড়িয়া আছে দেখিয়া দুঃখ করিলে কি হইবে, এদিকে যে তোমার শ্রীনীলকণ্ঠ—বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, শিক্ষিত, সঙ্গতিপন্ন, ভারত-মাতার আশা শ্রীনীলকণ্ঠ—এক্সা-নং-ওয়ান টানিয়া পড়িয়া আছে, মুখে মাছি ভন্ ভন্ করিতেছে, তাহা কি তুমি দেখিতে পাইতেছ না? তাই ভাবি, এ দুঃখের কথা বলি কাকে? খোলাভাঁটীতে নিম্নশ্রেণীর লোক বুলিয়া গেল, ব্রাণ্ডিতে উচ্চ-শ্রেণীর লোক মাতিয়া গেল,—দেশ ক্রমে আরও নীচে বসিতে লাগিল। যে কয়জন সাধু আছেন, কুসংসর্গে পড়িয়া তাঁহাদের কোন্ দিন যে কি বিপদ্ ঘটিবে, তাহা কে বলিতে পারে? সাধুগণের উচিত, যাহারা—ধনবান্ বিদ্বান্ ক্ষমতাশালী হইলেও তাহার সহিত কথা-

বার্ত্তা না কওয়া, তাহার উপর বিজাতীয় ঘৃণা প্রদর্শন করা, সেই পামরের মুখ পানে তাকাইলেও পাপ হয়—এরূপ বিবেচনা করা। সামাজিক দৃঢ়-শাসন না থাকিলে, মাতলামীর শাসন হইবার সম্ভাবনা নাই।

পত্নী-ভক্তি।

"যদিদং হৃদয়ং তব তদিদং হৃদয়ং মম"—এই কথা বলিয়া, বিবাহ করিয়া আনিয়াছি বলিয়া, আমি কিছু আর চোরের দায়ে ধরা পড়ি নাই; স্ত্রীকে বিবাহ করিতে যে অর্থব্যয় হইয়া গিয়াছে, আমার ঘরে আজীবন খাটিলেও, তাহার সে ঋণের এক অংশও শোধ যায় না। তাই বা বার মাস ঘরে থাকে কই? মধ্যে মধ্যে বাপের বাড়ী গিয়া কামাই করা আছে। কিন্তু ঘোর কলি উপস্থিত, স্ত্রীলোক বেইমান; এত যে উপকার করিলাম, তাহার কিছুই মানে না, বুঝে না। আমি না বিবাহ করিলে তাহাকে এতদিন হয়ত আইবড় থাকিতে হইত, সে কথা মনেও ভাবে না। এত অর্থ ব্যয় করিয়া, ঘরে আনিয়া, দুবেলা নিয়মিত খোরাক দিতেও ক্রুটী করি নাই, বৎসরে দু'জোড়া কাপড়, দু'খানা গামছা, রোজ তেল, জলখাবার এক পয়সা বরাদ্দ করিয়া দিয়াছি, তথাচ আমার যশ নাই, সদাই আমার উপর তর্জ্জন গর্জ্জন। স্ত্রীর বলিবার যো নাই—যে খাবার মাখিবার কষ্ট হয়, নিজে শাক

করেন, নিজেই ভাত বাড়েন। একজন আলাপীর নিকট বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি, নিজের জন্য চাপিয়া চাপিয়া ভাত বাড়িয়া তাহার মধ্যে মাছ লুকাইয়া রাখেন, অবশেষে আমাকে ভাত দেন। আমি এ সব কথা ধরি না; গায়ে মাখি না, মনে করি, অনেক দিন বাড়িতে আছে, থাক্,—কত কমূনে যায়! আর এখন ত্যাগ করিলেও লোকসান, বিবাহে অনেক টাকা ব্যয় হইয়াছে।

কিন্তু ভালোর ভালাই নাই; আমি যত নরম হইতেছি, সে তত গরম হইয়া উঠিতেছে। কুকুরকে প্রশ্রয় দিলে, ক্রমে সে মাথায় উঠে—ইহা শাস্ত্রের লিখন। সদাই খন্ খন্ ঝন্ ঝন্। রাত্রে বেড়াইয়া আসিতে একটু দেরি হইলে, অমনি আমার উপর চক্ষু রক্তবর্ণ করা হয়, ডাকিলে উত্তর দেওয়া হয় না, আপনার গরবে সদাই গস্-গস্। বলি, আমার ঘরে থাকিয়া আমার খাইয়া, আমার টাকা নষ্ট করিয়া, আমারই উপর রাগ? আমার কথায় অবহেলা? না বেড়াইলে স্বাস্থ্য থাকে কি? আর যদিই আমি কোন দিন রাত্রে ঘরে না আসি, তাহাতে উহার ক্ষতি কি? তাহাতে উহার লাভ বইত লোকসান নাই? আমার ভাত, ডাল মাছ, তরকারি এবং উহার নিজের অন্নব্যঞ্জন—এই উভয়ের অন্ন, একলা খাইতে পাইবে। আর গ্রীষ্মকালে এই সুবিস্তৃত শয্যায় সটান হইয়া একলা শয়ন করিতে পাইবে। অগ্নি সম্মুখে, বলিতে পারি, একদিনও আমার অন্নব্যঞ্জনের জন্য আপত্তি করি নাই। স্ত্রীর

গুণের কথা অধিক আর কি বলিব? রাত্রি একটার সময় আমি এক দিন বেড়াইয়া ঘরে এলাম, সেদিন বড়ই কষ্ট পাইয়াছি, ক্ষুধার লেশমাত্র নাই, বলিলাম, ভাত খাইব না। কিন্তু স্ত্রীটা এমনি দুষ্ট-বুদ্ধি—আর আমাকে জ্বালাতন করা তাহার জীবনের এক প্রধান উদ্দেশ্য—সে বারম্বার আমাকে বলিতে লাগিল, "ভাত খাও, ভাত খাও।" আমি যত বলি খাব না, সে তত বলে "খাও খাও!" আমার রাগে সর্ব্বশরীর থর থর কাঁপিতে লাগিল, দক্ষিণ হস্তে বজ্রমুষ্টি উত্তোলন করিলাম, বলিলাম—"রে যন্ত্রণাদায়িনি, আমার হাড়-কালিকারিণি, ফের যদি আমাকে খাইবার কথা বল, তবে এই বজ্রমুষ্টি তোমার নাসিকাগ্রে পাতিত হইবে।" তখনও নিস্তার নাই, ঈশ্বর আমার অদৃষ্টে সুখ লেখেন নাই,—মন্দমতি স্ত্রীটা তখন "খাও খাও" ছাড়িয়া ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া কান্দিতে আরম্ভ করিল, যেন কালসাপিনী গর্জ্জাইতে লাগিল। এইবার সহৃদয় পাঠক বিবেচনা করুন,—আচ্ছা, আমি মুটাটী উঁচাইয়াছি মাত্র, মারিয়াছি কি? সুতরাং অবশ্যই নাকে আঘাত লাগে নাই! তবে কাঁদে কেন?—কেবল আমাকে রাত্রে ঘুমাইতে দিবে না বলিয়া। ক্রমে মিহি বাজখেঁয়ে নাকি সুর ধরিলেন, যেন ঝিঁঝি পোকা ডাকিতে লাগিল।

আমি গতিক দেখিয়া বলিলাম, "তুমি ঘরে বোসে অমন ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিতে পারিবে না, বাস্তুভীটায় চোখের জল ফেলিলে অকল্যাণ হবে, সদর রাস্তায় যাও।" মহাশয়,

বলিব কি?—তখনও উঠে না, আমি কি করি, হাত ধরিয়া বাহির করিয়া খিড়কির দ্বারে খিল দিয়া আসি, তবে সে রাত্রি নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতে পারি। স্ত্রীটার জ্বালায় এক এক দিন ইচ্ছা হয়, আগে ওকে মারিয়া, তার পর আমি ফাঁসি যাই। সকলে দেখুন, স্ত্রী আমার স্বাধীনতা লোপ করিতে চাহে, ভ্রমণে বাধা, আহারে বাধা, অনাহারে বাধা, এত অন্যায় কে সহে? যে স্বাধীনতার জন্য আমেরিকায় রুধিরের নদী বহিয়াছিল, যে স্বাধীনতার জন্য ইংরেজ তাহাদের দু'তিনটা রাজাকে হত্যা করে, স্ত্রী সেই পবিত্র উচ্চ স্বাধীনতা লোপ করিতে চাহে। কিন্তু স্ত্রীর চরিত্র যেমন মন্দ হউক না কেন, আমি ত তার সম্পর্কে স্বামী, তাই সকল সহ্য করিয়া থাকি। এক দিন স্ত্রীর বালিশের নীচে একখানি লুক্কায়িত পুস্তক (বোধোদয়) দেখিতে পাইলাম, আমি অধিক ভৎর্সনা না করিয়া কেবল বলিলাম, "খবরদার, স্ত্রীলোকের পুস্তক পড়িতে নাই, আর যদি এ ঘরে কোন পুস্তক দেখি, তবে তোমার রাত্রে দুই দিন আহার বন্ধ করিয়া দিব।" কিন্তু স্ত্রী এরূপ দুষ্ট যে, আমার উপদেশ না শুনিয়া, আমার কথায় "হাঁ" কি "না" জবাব না দিয়া, কেবল গোঁজ হইয়া, মুখ হেঁট করিয়া রহিল। যাহা হউক, এক রকম ক্ষমা ঘৃণা করিয়া আমি দিন কাটাইতেছি; তবে দুঃখ এই আমার যেমন মন, তার তিলার্দ্ধও যদি স্ত্রীর মন হইত, তবে সংসার কি সুখের হইত! আমার স্ত্রীকে সুমতি দিবার উপায় কেহ

বলিয়া দিতে পারেন ? আমি কিছু টাকা খরচ করিতেও প্রস্তুত আছি,—যদি স্ত্রীটী আমার বশ হয়। আহা! অপরের স্ত্রী দেখিলে চক্ষু জুড়ায়; কেমন আজ্ঞানুবর্ত্তিনী, কেমন মধুরহাসিনী; তারা কেমন আধ-আধ-অমৃতমাখা ভাষায় কথা কয়, কাছে বসিলে আর উঠিতে ইচ্ছা হয় না; আর আমার স্ত্রী সদাই বিশ্বম্ভর-মুখে বসিয়া আছেন,—রাঙাপদে যেন কত অপরাধই করা গিয়াছে। সকলের বিবাহে একই মন্ত্র, একই অর্থ-ব্যয়, কিন্তু আমার অদৃষ্ট মন্দ, তাই বিপরীত ফল ফলে। আমি ধন্য দয়াশীল পুরুষ, তাই এখনও এরূপ কাল-সাপিনী স্ত্রীকে ঘরে রাখিয়াছি।

হঠাৎ কবি।

দিব্য করিয়া বলিতে পারি, যদি আমি দুই মাসের অধিক ঘর ছাড়িয়া পশ্চিম-প্রদেশে আসিয়া থাকি। ইহার মধ্যেই একটী বড় আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমার মন, যুগপৎ হর্ষ ও বিস্ময়রসে আপ্লুত হইল। আমাদের প্রতি-বেশী গোবর ভায়া হঠাৎ প্রকৃত কবি হইয়া উঠিয়াছেন। সংবাদপত্রে, মাসিকপত্রে সর্ব্বদাই এই রকম দেখিতে পাই;— "শ্রীগোবর্দ্ধন চক্রবর্ত্তী প্রকৃত কবি, জ্বলন্ত কবি, ঊর্দ্ধগামী কবি; ইঁহার কাব্যসুধারস-পানে মুনিঋষিযোগীরও হৃদয় বিচলিত হয়" এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমার মন বড় চঞ্চল

হইল, রাত্রে আর ভাল ঘুম হয় না, কেবল ভাবি, গোবর ত সেই, সারাদিন ফিক্ ফিক্ হাসে, চেরাসিঁথিটি কাটে, আর মিহি কাপড় খানি পরে; সে গোবর এই অল্প দিন মধ্যে কবি হইল কিসে? গোবরের ত গুণের মধ্যে বার দুই তিন এণ্ট্রেন্স ফেল, আর প্রতিদিন প্রাতঃ সন্ধ্যা গল্প করা, এবং রাজা বাদ্‌সা মারা। গোবর না পড়ে পণ্ডিত হ'লো, আমরা পড়ে শুনেও কিছু করিতে পারিলাম না। ইচ্ছা হইল, সর্ব্ব-কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া গোবরকে যাইয়া একবার দেখিব—এক-বার নয়ন ভরিয়া আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিব। পরদিনই অমনি ডাক গাড়ীতে রওনা হইলাম; শীঘ্রই বাটী আসিয়া পৌঁছিলাম; স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কথা নাই বার্ত্তা নাই, হঠাৎ আসার কারণ কি?" আমি কি উত্তর দিব ভাবিয়া পাই না, বলিলাম "আসিতে কি নাই?" মা জিজ্ঞাসা করেন, "বাবা শরীর গতিক ভাল আছে ত? চাকরীর ত কোন গোলমাল হয় নাই?" বন্ধুবান্ধবগণ বলিলেন—"এবার যে খুব ঘন ঘন বাড়ী আসিবার ধূম দেখিতেছি।" আমি কাহাকে কি উত্তর দিব, কিছুই স্থির করিতে পারি না; ঘোর বিপদে পড়িলাম, আম্‌তা আম্‌তা করিয়া সব সারিলাম।

বন্ধুদের সহিত এ, ও, তা গল্প করিতে করিতে কথার ছলে জিজ্ঞাসা করিলাম, "গোবর কেমন আছে?" তাঁহারা গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আপনি কি শুনেন নাই, গোবর্দ্ধন বাবু সম্প্রতি নট-নিকুঞ্জ নামে একখানি মহাকাব্য রচনা

করিয়াছেন? আজ কাল তাঁহার নিকট অনেক বড় লোকের চিঠি আসিতেছে; সকলেই তাঁহার কবিত্বের প্রশংসা করিতেছেন।” আমি বলিলাম, “বল কি হে?—গোবর এক দিনে কবি হইল কিরূপে?” তাঁহারা বলিলেন,—“সত্য সত্যই গোবর্দ্ধন কবি হইয়াছেন, তাঁহার প্রকৃতির অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে।” আমি উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলাম। বন্ধুগণ যেন একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, আপনি হাসিবেন না, গোবর্দ্ধন বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলে, আপনার ভ্রম দূর হইবে।

আমি গোপনে গোবরের আরও কিছু সংবাদ লইলাম; কিন্তু সকলেই বলেন, গোবর কবি হইয়াছেন। শুনিলাম, তিনি এখন সর্ব্বদাই নীরবে থাকেন, কেবল একমনে ভাবেন; কাহারও সঙ্গে কথাও কন না, লোকও ভাল ঠাওরাইতে পারেন না, কাহারও সঙ্গে যদিই কথা কহিতে হয়, তবে পদ্যে কথা কন,—গদ্য আর মুখ দিয়া উচ্চারণ হয় না। গোবরের সঙ্গে দেখা করিবার লালসা ক্রমশই বলবতী হইতে লাগিল; দশটার মধ্যে আহার করিয়া তাড়াতাড়ি গোবরের ভবনে গেলাম। দেখিলাম, দ্বারে চাপরাসী; আমি কিছু না মানিয়া ঘরে ঢুকিতে যাইতেছি, চাপরাসী ছাড়িবে কেন? সে কার্ড চাহিল। আমার ত সে সব কিছুই নাই,—চাপরাসীকে বলিলাম, “বাপু হে! অনেকদূর হইতে আসিয়াছি, একবার দ্বার ছাড়িয়া দাও।” দ্বারী তথাচ দ্বার ছাড়ে না। হাঁকা-হাঁকি করিয়া যে গোবরকে ডাকিব, তাহারও যো নাই, চাপ-

রাসী বিকট চক্ষে কেবল বলিতেছে, "আস্তে, আস্তে বাবু।" অবশেষে কিছু বুদ্ধি খরচ করায় সহজেই দ্বার উন্মুক্ত হইল। গৃহে গিয়া যাহা দেখিলাম, তাহা অপূর্ব্ব অননুভূত বটে। দেখিলাম, একটী মনুষ্য ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া বসিয়া আছে, চক্ষের পলক পড়িতেছে কি না, সন্দেহ; কলেবর শ্বেতবস্ত্রমণ্ডিত। দক্ষিণ হস্তে পেন্সিল, বাম হস্তে কাগজ। রূপ দেখিয়া প্রথমে সেই নিশ্চল মূর্ত্তিকে স্ত্রী কি পুরুষ কিছুই ঠিক করিতে পারি নাই; ক্রমে বুঝিলাম, আমাদের গোবর্দ্ধনই বটেন। গোব-রের রংটা খাঁড়ি মুসুর ডেলের মত, আজ কাল আবার খুব মাজা, ঘসা; চেহারা একহারা, গোঁফের রেখা ঈষৎ উঠি-য়াছে মাত্র,—চুল লম্বা, তাহাতে চেরা সিঁথি—পটলচেরা চক্ষের চাহনী কেমন-কেমন,—কাজেই প্রথমে নারীজাতি বলিয়া ভ্রম হয়। যাহা হউক, ক্রমে গোবরের সম্মুখে গিয়া বসিলাম, তখনও গোবর নীরব; আমিও সাহস করিয়া কোন কথা কহিতে পারিতেছি না, কি জানি, যদি কোন মহাধ্যান ভঙ্গ হয়। প্রায় ৮।১০ মিনিট পরে, গোবর আমার পানে চক্ষু ফিরাইলেন, খানিক চাহিয়া থাকিয়া, ধীরে ধীরে ভাঙ্গা-ভাঙ্গা নাকি সুরে বলিতে লাগিলেন;—

কে তুমি, কি নাম তব, নিবাস কোথায়?
কিবা প্রয়োজনে বল হেথা আগমন?
প্রাণ দিয়া, দেহ দিয়া, করিব উদ্ধার
তব কার্য্য; ইথে কভু নাহিক অন্যথা।

যথায় দধীচি মুনি দেহ অস্থি দিয়া
উদ্ধারিল দেবগণে, মারি বৃত্রাসুরে।

গোবরের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া আমি ত অবাক্; ভাবিলাম ব্যাপারটা কি? বলিলাম, ভায়া আমাকে কি চিনিতে পারিতেছ না?—চিরকাল এক সঙ্গে বেড়াইয়াছি, ছেলেবেলায়, যে "দেবেন দাদা" তোমায় মানে বলিয়া দিত, আমিই সেই দেবেন্দ্র।

ওঃ হো, বুঝিয়াছি শ্রীদেবেন্দ্রনাথ তুমি,
রাজীবের বংশ তুমি করেছ উজ্জ্বল;
তুমি মম বালবন্ধু; সখে! বল দেখি
হাত ধরাধরি করি দু-জনে মনের সুখে,
খেলিতাম কত খেলা ভাগিরথী-তটে,—
কপোত কপোতী যথা,—জাহ্নবী-সলিল
যবে মাখিত জোছনা উলটী পালটী।

তখন আমি আর থাকিতে না পারিয়া ভায়াকে সকল কথা ফুটিয়া বলিলাম,—"গোবর! তুমি কেবল অমন কবিতা আওড়াইতেছ কেন?—সোজা সুজি কথা কওনা—গোবর উত্তর করিলেন,

গদ্যপদ্য ছন্দোবন্দ কিছু নাহি জানি,
দেবী-কৃপা সব,—যা বলান, তাই বলি।
বাক্‌দেবী বীণাপাণি, বীণার ঝঙ্কার
হৃদয় কমলে মম দিতেছে সতত।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "গোবর! কবে হইতে তোমার কবিত্ব শক্তি জন্মিল? গোবর উত্তর করিলেন,

চিরদিন ছিল কবিত্বে শক্তি,
চিরদিন ছিল কবিত্বে ভক্তি,
(তবে) এত দিন ছিল ধরিয়া মরিচা,
ভূগর্ভে হীরক না রহে সাঁচা।
এখন ডেকেছে কোটালে বান,
খরনদী অতি তরঙ্গ তুফান,
আগে ভেসে যায় যার ব্রহ্মাণ্ড বাগান।

আমি জিজ্ঞাসিলাম, ভাই গোবর! তোমার কবিত্ব কেবল কি মুখে?—কাগজ কলমে হয় কখন? গোবর বলিলেন,—

দেখ তবে রাজীব-বংশ-ধুরন্ধর।
কবিতা লিখি কত মনোহর॥

এই কথা বলিয়া তিনি ভাল কাগজ ও কলম লইলেন; দোয়াতটী সম্মুখে সরাইয়া আনিতে গেলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে দোয়াত আনিবার সময় হঠাৎ আমার নূতন ইস্ত্রীকরা পিরিহাণে কালি পড়িয়া গেল। আমি মনে মনে ভাবিতেছি, কি গ্রহ, কি উৎপাত, ব্যস্ত হইয়া কালী পুঁছিবার উপক্রম করিতেছি,—কিন্তু কবিহৃদয় অমনি উথলিয়া উঠিল, গোবর বলিলেন,—

আহা কি সুন্দর শোভা পিরাণ-উপর
সৌদামিনী কোলে যথা নবীন নীরদ ;
বকশ্রেণী-মাঝে কাকের সঙ্গতি মরি,
অথবা যেমতি সাদা-কৃষ্ণ-বক্ষে, কালো-
ভৃগু-পদচিহ্ন ;—মুনিমনোহর নয়নরঞ্জন।

গোবরের কার্য্য দেখিয়া আমার মনে হাসি, দুঃখ, বিস্ময় একেবারে উদয় হইল। বেলা দুইটা বাজে দেখিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছি ; এমন সময় গৃহদাসী আসিয়া বলিল, "দাদা বাবু ! বেলা অনেক হইয়াছে, মাঠাকরুণ এখনও ভাত খেতে পান নাই, আপনি শীঘ্র আসুন"—গোবর উত্তর করিলেন,—

যাও দাসি ! ধীরে ধীরে মন্থর-গমনে ;
পার্থিব মাতাকে বল—"ভাত খাবো না।"

দাসী কি বকিতে বকিতে চলিয়া গেল। গোবরের জননী শুনিলেন, ছেলে ভাত খাবে না ; বুড়ী তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল। তিন প্রহর বেলা, না খেয়ে পিত্তি পড়ে একটা ব্যারাম করবে, আজ ক দিন থেকে সদরে চুপ করে ঘরের কোণে থেকে তার যে কি হচ্চে, কিছুই বুঝিতে পারিনে। যাই আমি একবার। এই বলিয়া বৃদ্ধা বাহিরে পুত্রের দিকে ধাবমান হইলেন। দাসী বলিল, সে ঘরে ও বাড়ীর ছোট বাবু আছেন। বৃদ্ধা বলিল, সে আমার পেটের ছেলের মত, থাকুক। জননী কিছু উগ্রস্বভাবা ; কিঞ্চিৎ ক্রোধভরে

বলিলেন—"বলি গোবরা, ভাত খেলে না—তুই কি মনে করেছিস্ বল্ দেখি ?—গোবর তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়া যোড়-হস্তে বলিলেন—

এস মাতঃ জগদম্বে ! শক্তিরূপা তুমি,
প্রণতি তোমার পদে করি বার বার।

মাতা বলিলেন—"ভাত খেয়ে আয়, পাগলের মত বকিতে হইবে না।"

গোবর। ক্ষুধার নাহিক লেশ ; কবিতা অমৃত—
পানে সদা সিক্ত প্রাণে,—মৃত্যুঞ্জয় আমি।
কি আর পার্থিব অন্ন—ধানের প্রপৌত্র
তারে খাব আমি ? মাতা ফিরি যাও ঘরে,
দাসেগো মা ! রেখো মনে—এ মিনতি তব পদে।

মাতা বলিলেন, "তুই কি সত্য সত্যই পাগল হলি নাকি ? এই বলিয়া যেন কোন প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য দ্রুত গৃহাভিমুখে ধাবমান হইলেন। গোবর, মাতার প্রণাম বন্দনা করিতে লাগিলেন,—

কজ্জল-পূরিত লোচন-ভারে,
স্তনযুগ শোভিত মুক্তা-হারে—

এমন সময়ে বৃদ্ধা জননী এক কলসী জল আনিয়াই গোবরের মাথায় তাড়াতাড়ি ঢালিয়া দিলেন,—বলিলেন, এত-খানি বেলা, তবু স্নান নাই—কাজেই মাথা গরম হয়ে উঠেছে, বাছা তাই এতটা বকিতেছে। দাসীকে বলিলেন—মাথায়

শীঘ্র বিষ্ণুতৈল দাও। তখনও নিস্তার নাই; গোবর বলিতে লাগিলেন;—

কিবা মনোরম সলিল প্রপাত!
হেরেছি গোমুখী-গণ্ডে জাহ্নবী পতন,
হেরি নাই কভু এহেন জলের ঢেউ॥

এইরূপ ব্যাপার চলিতে লাগিল। আমি খুড়িকে বলিলাম—"তিন মাস কাল বিষ্ণুতৈল মাখান ও প্রাতস্নান করান চাহি"—এই বলিয়াই চলিয়া আসিলাম।

বিবাহ-রহস্য।

১ম বৈরাগ্য।

কামিনী বাবুর ক্রমে বয়স হইয়া উঠিল; তিনি ইংরেজী পড়েন, টেড়ি কাটেন, পমেটম মাখেন, বক্তৃতা দেন, গান করেন। তিনি আবার খুব ভাল ছেলে; প্রতিবেশিগণের মতে অঙ্কশাস্ত্রে আর একটু অধিক ব্যুৎপন্ন হইলে, তিনি এতদিনে সব কয়টা পাস করিতে পারিতেন। এরূপ গুণময়, জ্ঞানময় ছেলের দেখিতে দেখিতে ক্রমে ১৮ বৎসর হইয়া উঠিল। আর কি বিবাহ না দিলে সাজে? কামিনী বাবুর পিতাকে সুহৃদ্বর্গ বুঝাইতে লাগিলেন,—"মহাশয়! করিতেছেন কি? পুত্র উপযুক্ত হইয়াছে, বিবাহের কাল বহিয়া যাইতেছে—আপনারও পৌত্র-মুখ দেখিবার সময় উত্তীর্ণ

হইতেছে, আর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়।" পিতা বলিলেন "কামিনীর আমার, ইংরেজী পড়ে কেমন এক-রকম মেজাজ হইয়াছে; শুনিয়াছি, সে এখন বিবাহ করিতে চাহে না,—সে রাজি থাকিলে কি এতদিনে বিবাহ বাকী থাকিত?" সুহৃদ্গণ উত্তর দিলেন,—"আজকাল ছেলে-পিলের ঐ কেমন একরকম কথা হয়েছে,—আপনি সাবধান হবেন, এখন বিবাহ না দিতে পারিলে, বোধ হয় আপনি আর কখনই দিতে পারিবেন না—বাঁশ কাঁচা বেলায় না নোয়াইলে, পাকা বেলায় আর নোয়ান যায় না।—আমরা আপনার অনেক কালের বন্ধু, তাই এ কথা বলিতেছি।"

কামিনী বাবু দিব্য নব্য ছোকরা, ফুটফুটেটী, ঠোঁট দুটী লাল,—যেন আলতা দেওয়া, হাতে একখানি গোলাপী রঙের রুমাল, ঘাম থাক বা না থাক,—সদাই তা দিয়া মুখটী মুছিতেছেন। জনসমাজে প্রচার ছিল, কামিনীবাবু বিবাহ করিবেন না। তিনি একবার বক্তৃতা দিয়াছিলেন, অল্প বয়সে বিবাহ করা বড় দোষ, সন্তান দুর্ব্বল হয়, পবিত্র প্রণয় জন্মে না, আর স্ত্রীপুরুষ দীর্ঘজীবী হয় না। লোকে বুঝিল, কামিনী বুঝি সন্ন্যাসী হইবেন; বংশ লোপ, পিতার নাম লোপ করিবেন। কিন্তু কামিনীকুমার অতি মিহি কালাপেড়ে ধুতি না হলে পরিতেন না, মাথাকে দ্বিভাগে বিভক্ত করিয়া চেরা সিঁতি কাটিয়া পেটো পাড়িতেন,—কখনও নয়-আনা সাত-আনা ভাগ হইবার যো থাকে নাই। তার উপর গন্ধ দ্রব্যের ছিটা

দিতেন ; রোজ একখানি সুগন্ধি সাবান করপদ্ম সজ্বর্ষণে ক্ষয় হইত, বিদ্যাসুন্দরের ভাল ভাল স্থান খুঁজিয়া পড়িতেন ; দুষ্ট লোকে এমনও কাণাকাণি করিত যে, কামিনী সন্ধ্যা ও সকালে লুকাইয়া বাসরঘরের গানের আখ্ড়া দিতেন। লোকে যা বলে বলুক, কামিনী কিন্তু বিবাহের নামে শিহরিয়া উঠিতেন, বলিতেন,—"ছি! ও পাপ কথা আমার কাছে কহিও না?" কামিনী বাবুত সমাজ-সংস্করণের জন্য, স্বদেশ উদ্ধারের জন্য বিবাহ করিবেন না বলিয়া নিশ্চিন্ত আছেন ; কিন্তু ওদিকে তাঁহার পিতা-মাতার দুঃখের অবধি নাই,—হায় হায়! ছেলেটা কি হলো? এমন জানিলে কে তাহাকে ইংরেজী স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিত?—সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখ অধিক মায়ের। তাঁর খেতে শুতে, উঠিতে বসিতে, কিছুতেই সুখ নাই। ম্লানময়ী অধোমুখে বসিয়া আছেন,—এমন সময় পাড়ার পক্ক-কেশা, গলিত-দশনা, বৃদ্ধ-প্রপিতামহী আসিয়া উপস্থিত। তিনি পাড়ার সর্ব্বময়কর্ত্রী, বিধানদাত্রী ; দশখানা গ্রামের লোক তাঁহার স্বকৃত শাস্ত্রানুসারে চালিত হয়। নবদ্বীপ, কাশী, কাঞ্চীর শাস্ত্রসঙ্গত-মত, তাঁহার মতের নিকট পদ-দলিত। তিনি মেয়ে-পালেমেণ্টের গ্ল্যাড ষ্টোন, মেয়ে-আদালতের রমেশ মিত্র, মেয়ে-পুলীশের মনরো,—এবং মেয়েলি-শাস্ত্রের মনু। সেই মহামেয়ে অষ্টাঙ্গ দুলাইয়া, গরব-গমনে তালে তালে পা ফেলিয়া আসিতেছেন। বৃদ্ধাকে দেখিয়া কামিনীর মা সসম্ভ্রমে উঠিয়া, অতি মধুর ভাষায়

সম্মান-সূচক সম্ভাষণ করিয়া সযত্নে উপবেশনের আসন পাতিয়া দিলেন। বৃদ্ধা ঈষৎ ভ্রূকুটী করিয়া বলিলেন "তোমার বাড়ীতে আমি বসিতে আসি নাই,—কেবল দুটা কথা বলিয়া যাইব।" মাতা তটস্থ, ভীত, ব্যাকুলচিত্ত, যোড়হস্ত—"কেন কি হইয়াছে?" "কেন, কি হইয়াছে? জান না, সংসার মজাইতে বসিয়াছ, পরকাল নষ্ট করিতে বসিয়াছ, এর পর ভিটায় যে সন্ধ্যা পাবে না,—এত বড় আইবুড় ছেলে এখনও ঘরে পুষিয়া রাখিয়াছ? যত দিন না ছেলের বিয়ে দিয়ে বউ ঘরে আন, তত দিনত তোমার হাতের জল শুদ্ধ হইবে না!—তোদের দোষ নাই, দিন কাল বড়ই খারাপ পড়েছে,—এখনকার মা-মাসী আপন আপন সোয়ামী লইয়াই ব্যস্ত—আত্মসুখে রত, খৃষ্টানি কাল পড়েছে, তোর দোষ কি? বাছার কেমন নবীন নধর গঠন! ঈষৎ গোঁফের রেখা! হতভাগী, কোন্ প্রাণে তুই বেটার বিয়ে না দিয়ে সংসারে আছিস্, ঘর কর্‌চিস্?" তখন কামিনীর মা অতি কাতর হইয়া, যোড়হস্তে, অশ্রুপূর্ণ-লোচনে উত্তর করিলেন—"আমার অদৃষ্ট বড় মন্দ, তাঁকে বলি, সে হচ্চে-হবে বলে, বড় গ্রাহ্য করে না, ছেলের কাছে বিয়ের কথা পাড়্‌লে সেও কোন উত্তর দেয় না; কাণা-ঘুষা শুনি, কামিনী নাকি বেশী বয়স না হইলে বিবাহ কর্‌বে না, আমি একলা মেয়ে মানুষ, কেবল অন্তরে অন্তরে গুম্‌রে মর্‌তেছি।" বৃদ্ধা উত্তর করিল "দূর পাগ্‌লি! আজও স্বামী বশ করিতে শিখ্‌লি না?—এর পর তোদের দশা হবে

কি ?—ছিছি ! এক দিনের কথার চোটে সোয়ামীকে ত্রিভুবন দেখাইয়া দিতে পারিস্ না ? আমি ব'লে চলিলাম ; আমাকে ও-পাড়ার বোসেদের বাড়ী যেতে হবে।" এই বলিয়া বৃদ্ধা চলিয়া গেল।

সত্য সত্যই তখন দুঃখ, রাগ, অভিমান যুগপৎ আসিয়া রমণীর হৃদয় অধিকার করিল। শ্রীরাধিকার নয়ন যুগল টল্ টল্, চল্ চল্, ছল্ ছল্ করিতে লাগিল, মন্দাকিনী-বারিধারা নয়ন-কোণ হইতে অল্পে অল্পে পড়িতে লাগিল। মানময়ী কোমলাঙ্গে অভিমান-রূপ কঠিন বর্ম্ম পরিয়া জলমগ্ন চক্ষু রক্তজবা করত যেন যোদ্ধৃবেশধারিণী হইয়া খট্টাঙ্গে বসিলেন—যেন সিংহবাহিনী ভগবতী মহিষাসুর-বধের মনস্থ করিলেন। এমন সময়ে সেই চাকুরে-স্বামী শ্রীকৃষ্ণকিশোর—সেই কর্ম্ম-ক্ষেত্রের হলধর, সংসারতরীর গুণটানামাঝি, সেই কামিনীর মায়ের সুখ-মোক্ষ-দাতা—আজ্ঞাকারী, অবশ্যপোষ্য—চাকুরে পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকিশোর দিবসের কার্য্য-অবসানে, গুটি গুটি গৃহে আসিয়া উপস্থিত। অর্দ্ধাঙ্গীর রূপ দেখিয়া তিনি বুঝিলেন, আজিকার গতিক বড় ভাল নহে, আজিকার এই রূপ আধা-কোমল, আধা-কঠোর নহে—গঙ্গা যমুনার সঙ্গম নহে। এ মূর্ত্তি সৃষ্টিসংহারিণী—প্রলয়কারিণী—ডাকিলে উত্তর নাই, নিশ্চল, নিস্পন্দ, অসাড়। চক্ষু দিয়া থেকে থেকে টুপ্ টুপ্ ঝুর্ ঝুর্ কেবল মুক্তাফল বৃষ্টি হইতেছে!—তাহা যেন হেনিরি-রাইফলের গুলির ন্যায় কৃষ্ণকিশোরের বক্ষে

বিঁধিতেছে, আর থাকিতে পারিলেন না, আর সহ্য হইল না,—তখন সকল দায়ের দায়ী, গরীব বেচারা কৃষ্ণকিশোর যথাবিধি শাস্ত্রানুসারে অর্দ্ধাঙ্গীর মান ভঙ্গ করিলেন,—শেষ সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, "আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অদ্য হইতে সাত দিনের মধ্যে যাহাতে কামিনীর মত করিয়া তাহার বিবাহ দিতে পারি, তাহার অবশ্যই চেষ্টা করিব।"

বিবাহ-রহস্য।

২য়—পড়িবার গৃহে।

কামিনী বাবু পিতার একমাত্র সন্তান,—নয়নের তারা, অঞ্চলের নিধি, সাত রাজার ধন একটী মাণিক। আদুরে আব্দারে ছেলে কামিনী যা বলে, তাই হয়; যা চায়, তাই পায়;—মা বাপ কামিনীর মনে কিছু ক্ষোভ রাখেন নাই। কামিনীর পড়িবার ঘরটী বেশ সাজান; বার্ণিস করা—সবুজ রঙের বনাত-মোড়া একখানি দিব্য টেবিল, তার চারি ধারে চার খানি চেয়ার; টেবিলের উপর স্থূল সূক্ষ্ম লঘু গুরু হরেক রকম কাচনির্ম্মিত নানা বর্ণের জিনিষ আছে; টেবিলের অগ্রভাগটাকে প্রথমদৃষ্টে অস্লার কোম্পানীর দোকানের মুখপাত ব'লে মনে হয়। "এতগুলি কাচদ্রব্য টেবিলে কেন?" জিজ্ঞাসা করিলে, কামিনী বাবু মিহি সুরে সাধুভাষায় বলেন, "সমীরণ-সাহায্যে কাগজপত্র উড়িয়া

খাইবারভয়ে ও-গুলি এখানে সর্ব্বদা সাবধানে সুরক্ষিত হয়।” টেবিলের পুরোভাগে একখানি প্রকাণ্ড দর্পণ—ছোকরা বাবু চেয়ারে বসিলে পায়ের নখ হইতে কেশের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত তাঁহার সর্ব্বাঙ্গের প্রায় সমুদায় অংশ এককালে দৃষ্ট হয়। দক্ষিণপার্শ্বে মেহগনি কাঠের একটী লাল রঙের বাক্স; বাক্সে কি আছে, তাহা কে জানে? কিন্তু বাক্স তুলিলে, এরূপ একটা যোজনভেদী অভ্রভেদী সুগন্ধ বাহির হয় যে, তাহাতে মনে হয়, যেন পৃথিবীর সমুদায় প্রদেশের যাবতীয় গন্ধদ্রব্যের তিল তিল লইয়া তিলোত্তমা-গন্ধরস সৃষ্ট হইয়া, ঐ বাক্সে অন্তর্নিবিষ্ট আছে। টেবিলের উপরে সারি দেওয়া কেতাব-শ্রেণী; সকলগুলিরই প্রায় লাল রঙের মলাট; চসার, সেক্ষপীয়র, মিল্‌টন, ভলেট্যার রূসোঁ, বাইরণ সকলি আছেন; —দান্তে, কোমৎ, মিল, স্পেন্সার, বাইবেল, কোরাণ, ঋগ্বেদ, বিষ্ণুপুরাণ বর্ত্তমান। দেশী, বিলাতী নানা জাতীয় নভেল নাটকের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। টেবিলের ঈশান কোণে, ঈষৎ প্রচ্ছন্নভাবে, ওয়েবেষ্টার অভিধানের অন্তরালে ৺বট-তলার সৃষ্টি “কি মজার শনিবার” “দাঁতে মিশি” “কমলে-ভ্রমর” “জীবন-তারা” “বিদ্যাসুন্দর” “মানভঞ্জন” “কলঙ্ক-ভঞ্জন” “বস্ত্রহরণ” প্রভৃতি গ্রন্থাবলী অনন্য অবনতমুখে বিরাজিত। গৃহের দেওয়ালের চারি ভিত্তিতে সংলগ্ন নানা জাতীয় স্ত্রীলোকের নয় দশটী ছবি—সেগুলি গ্লাসকেসে ঢাকা।—কোথাও কোন লাবণ্যময়ী হাস্যমুখী অনূঢ়া ইহুদি

যুবতী একটী গোলাপের তোড়া লইয়া প্রিয়জনের হস্তে অর্পণ করিতেছেন। কোথাও বা বেশভূষায় সুসজ্জিতা, ধবলকান্তি, বক্রগ্রীব আড়নয়নবিশিষ্টা ইংরেজমহিলা ইংরেজপুরুষের সহিত হাতধরাধরি করিয়া খোসগল্প করিতে করিতে চলিয়াছেন! কোন পটে বিলাতী সাহেব-বিবির নাচ হইতেছে—মধ্যে মধ্যে কত রঙ্গরস বহিয়া যাইতেছে! যেখানে শ্রীযুত সচরাচর উপবেশন করেন, ঠিক্ তাহার সম্মুখে দেওয়ালের গায়ে একটী অপূর্ণযৌবনা বাঙ্গালী রমণী পালঙ্কের উপর তাকিয়া ঠেস্ দিয়া ঈষৎ হেলিয়া বসিয়া আছেন,—ওষ্ঠাধর লাল—যেন হিঙ্গুল মাখান, তাঁহার নবনীলনীরদতুল্য কেশদাম খাটের রেলিং হইতে বিলম্বিত হইয়া যেন ভূপৃষ্ঠ চুম্বনে উদ্যত; এই নবীনার পরিধান অতি মিহি কালাপেড়ে সাটী, দক্ষিণ-হস্তে একখানি পুস্তক—নয়নের নীচে সন্নিবিষ্ট। এ হেন প্রকোষ্ঠে শ্রীযুক্ত বাবু কামিনীকুমার টেবিলের সম্মুখে চেয়ারে উপবিষ্ট।

কার্ত্তিক মাস উপস্থিত। পরীক্ষা নিকট। কামিনী বাবু এর এবার বি-এ, পরীক্ষা দিবেন। এইরূপ প্রচার ছিল, গতবারে শরীরের অসুস্থতানিবন্ধন অঙ্কশাস্ত্রে কেবল সিকি নম্বর কম হওয়াতে কামিনী বাবু ফেল হয়েন। কিন্তু আর আর বিষয়ে খুব বেশী নম্বর পাইয়াছিলেন। পরীক্ষার পড়া শুনা ত সব সাবেক তৈয়ারি আছে, তাই কামিনী বাবু এবার অপরাপর বাঙ্গালা, ইংরাজী পুস্তক পাঠে অধিক জ্ঞান সঞ্চয়

করিতেছিলেন। একান্ত একাগ্রতার সহিত চিত্তকে সংযম করিয়া, ভালে দৃঢ় সংকল্পের ত্রিবলীরেখা ধারণ করত, কামিনী বাবু "যৌবনে অপূর্ব্ব সম্মিলন" নামক নাটক পাঠ করিতেছেন,—দক্ষিণ পার্শ্বে নিধুর টপ্পা গ্রন্থখানি সমাদরে অবস্থিত। এমন সময় দূর হইতে চটীজুতা-বিশিষ্ট মনুষ্যের পদধ্বনি শ্রুত হইল। কামিনী কুমার অমনি আস্তে আস্তে সেই পুস্তকখানি, পুস্তকরাশির মধ্যে মিশাইয়া দিয়া, নিধু বাবুর গ্রন্থকে অঙ্কশাস্ত্রের নোট বুকে ঢাকিয়া ফেলিয়া জন ষ্টুয়ার্ট মিলের "Principles of Political Econo" গ্রহণ করিলেন। শীঘ্রহস্ত কামিনী অতি অল্প সময়ের মধ্যে এ কার্য্য সমাধা করিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার সম্মুখে এক প্রবীণ পুরুষমূর্ত্তি উপস্থিত হইল। পুরুষের নাম হরিহর দাস; গ্রাম সম্পর্কে কামিনীর খুড়ো। কামিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়ের এখানে কি জন্য আগমন?" খুড়া বলিলেন; "বাছা, তোমার সঙ্গে আজ আমার দুটা কথা আছে, আমার কথাটী রক্ষা করিতে হইবে।" কামিনী বলিলেন,—"আপনাকে আমি যথেষ্ট মান্য করি, কথা রক্ষা করিবার হইলে, অবশ্যই করিব।" খুড়া বলিতে লাগিলেন "দেখ, তোমার মা বাপের তোমা বই আর কেহই নাই; তুমি অন্ধের নড়ি, তোমার বিবাহ দিয়া স্বর্গ প্রাপ্তি হইলেই তাঁহাদের সুখ। তুমি যদি বিবাহ না কর, তাহা হইলে, তোমার মা বাপ সংসার ত্যাগ করিয়া বিবাগী হইয়া কাশীবাস করিবেন,—পিতা মাতাকে

এরূপ কষ্ট দেওয়া ভাল কি? আমি বলিতেছি, আমার কথা রাখ,—এই অগ্রহায়ণ মাসে শুভলগ্নে তোমার শুভ বিবাহ—কার্য্য সম্পন্ন হউক।" এই কথা শুনিবামাত্র কামিনী বাবু চমকিয়া উঠিলেন—যেন হঠাৎ শত কামান তাঁহার সম্মুখে দাগা হইল—ভীত, স্তম্ভিত, বিস্মিত, ক্ষুব্ধ ভাবে কর্ণযুগলে হস্ত দিয়া বলিলেন—"মহাশয়! অদ্য ভট্টারকবারে আমার সাক্ষাতে অমন কথা বলিবেন না, ও নিদারুণ বাক্য শুনিয়া আমার শরীর শিহরিয়া উঠিতেছে।—আপনি কি মিল, স্পেন্সার, ডারউইন, কোমৎ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদের গ্রন্থ পড়েন নাই?—এ বাল্যকালে পাঠাভ্যাসের সময় ওসব কথা কি?—আমি এখন বিবাহ কি তাহা বুঝি নাই, পবিত্র-প্রণয় কাহাকে বলে, তাহাও ভাল জানি না, বিবাহের পর দম্পতীর কর্ত্তব্য কি, সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে কি করিতে হইবে, তাহাও শিখি নাই। বিবাহবিষয়ে অনভিজ্ঞ এমন অবোধ শিশুকে কেন আপনারা হাতে পায়ে পাষাণ বেঁধে অগাধ জলে ভাসাইয়া দিবেন। বিশেষ আমি এখন বালক,—এখনও আমার সর্ব্বাঙ্গের পুষ্টিসাধন হয় নাই; হাড় সকল এখনও নরম আছে; এমন সময় বিবাহ করিলে আমাদের নিজের ও দেশের অমঙ্গল আছে। যাহা হউক, আপনি একে খুড়ো, তায় বয়সে বড়, আপনাকে বেশী বলা সাজে না। এখন আমাকে মাপ করিবেন, ও পাপ কথা ছাড়া আমাকে যা বলিবেন, আমি তাহাই করিব।" খুড়া অবাক্, মুখে আর

বাক্য সরে না, শরীর ঘামিতে আরম্ভ করিল; অতি ধীরে ধীরে অস্ফুট স্বরে বলিলেন—"বাপু! আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই।" কামিনী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"ও সব পাশ্চাত্য মত—যে মত লইয়া ভারত উদ্ধার হইবে—আপনারা সেকেলে মানুষ, উহা ভাল বুঝিতে পারিবেন না;—সোজা কথায় বলি—"আমার এখন ১৮ বৎসর বঃয়য়ক্রম হইয়াছে, আর ১২ বৎসর অতীত হইলে, অর্থাৎ ৩০ বৎসর বয়সে বিবাহ করা উচিত। যদি জনক-জননী একান্ত দুঃখিত হয়েন, তাহা হইলে আরও পাঁচ বৎসর কমে বিবাহ করিতে পারি। কিন্তু সে কার্য্য করিতে হইলে এখন থেকে তার উদ্যোগ করা চাই। আমি স্বয়ং কন্যাকে দেখিব, তাহার বিদ্যাবুদ্ধি পাণ্ডিত্য রূপ গুণ ক্রমান্বয়ে এক বৎসর ধরিয়া পরীক্ষা করিব; ইহাতে যদি উভয়ের মনের মিল হয় এবং কন্যার পিতা যদি সদ্বংশজাত ও ধনবান্ হন—আমি-হেন জামাতাকে কন্যা-সম্প্রদান করিতে যদি তিনি উপযুক্ত পাত্র হন, তবে তখন সেই কন্যার, আমার সহিত একদিন বিবাহের প্রস্তাব করিতে পারেন। তখন খুড়া একটু কুপিত হইয়া বলিলেন, "বাপু হে! তুমি বালক বলিয়া বুঝাইতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি বালক হইয়া বৃদ্ধকে বুঝাইতে বসিয়াছ। বালক হইয়া তোমার যদি এত বুদ্ধি, তবে বিবাহের নামে আপনাকে বুদ্ধিশুদ্ধি-হীন শিশু বল কেন?—আর যে সকল কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছ, তাহা আমি কি,—স্বর্গ হইতে আমার প্রপিতামহ আসিলেও বুঝিতে সক্ষম

হইবেন না।—তাই বলি বাপু, পিতা মাতার মনে আর কষ্ট দিও না,—ভিটায় সন্ধ্যা দিবার যোগাড় কর।” কামিনীকুমারও কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—“আপনারা যদি আমার কথা না বুঝিতে পারেন, তাহাতে আমার অপরাধ নাই,—আপনাদের সুশিক্ষার অভাবই না বুঝিবার কারণ। আমার মতে আমার প্রণালীর অনুযায়ী আমি বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছি, অপরের মতে বিবাহ হইতে পারে না, বিবাহ বড় শক্ত বিষয়।” খুড়া তখন আস্তে আস্তে বলিলেন—“তাই বল, তোমার কিরূপ বিবাহের প্রণালী, তোমার পিতাকে সেই কথাই বলিব।” কামিনী বলিলেন “সে কথা ত পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে?” খুড়া—“আমি বাপু ওসব কথা ভাল বুঝিতে পারি নাই।” কামিনী বলিলেন—“আচ্ছা তবে কল্য আপনাকে লিখিয়া জানাইব।” তখন গ্রাম্য-খুল্লতাত ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন। বিধাতা, তিন বিন্দু সুধা স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে ফেলিয়াছিলেন—১ বিন্দু, ইলিস মাছের ডিমে; ১ বিন্দু পাকা আমে, আর এক বিন্দু ঘটকের মুখে। কামিনী আজ সেই খুড়ারূপী ঘটকের অমৃত-বিনিন্দিত বাক্যে বড় পুলকিত হইলেন—যেন সুধাপানে বিহ্বল হইলেন; খুড়া উঠিয়া গেলে, মিহিস্বরে এই গানটি ধরিলেন,—

ওহে যোগি-রাজ! কোথা হে বিরাজ!
রমণীসমাজ, আসা কি আশায়।

বিবাহ-রহস্য।

৩য়—পলায়ন।

এত দিন বি, এ, পরীক্ষার হাঙ্গামে কামিনী বাবু বিবাহের পাপ-কথা মুখে আনেন নাই, কাহাকেও আনিতে দেন নাই। জন-সমাজে প্রচার ছিল, তিনি সেই সুসজ্জিত সুরম্য গৃহে খিল দিয়া, সমস্ত দিন বিদ্যা-চর্চ্চায় রত থাকিতেন! কেবল স্বাস্থ্য-রক্ষার অনুরোধে বৈকালে—৪টা না বাজিতেই, বেশভূষায় ভূষিত হইয়া কন্দর্পের গর্ব্ব থর্ব্ব করিয়া সেই ঈষৎ বাঁকা হেলান-নয়নে, সেই গন্ধদ্রব্যপূর্ণ সুরঞ্জিত কেশে, কামিনী বাবু, ভ্রমণে বহির্গত হইতেন। সে সময়ে তাঁহার অপূর্ব্ব বাহার দেখিলে মনে হইত, যেন ইন্দ্রদেব, প্রফুল্লমন্দার-পুষ্পময় নন্দনকাননটীকে সঙ্গে লইয়া শচী-সম্ভাষণে যাত্রা করিয়াছেন। এইরূপ প্রত্যহ স্বাস্থ্যরক্ষা করিয়া, বাবুজী প্রায় রাত্রি দশটার পর, গৃহাভিমুখে আসিতেন; আবার সেইরূপ নিজকক্ষে অর্গল বদ্ধ করিয়া নিঝুমভাবে সরস্বতীর উপাসনা করিতেন।

এক্ষণে ত পরীক্ষা শেষ হইল। অবোধ পিতামাতা পুনরায় পুত্রের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। কামিনী বাবু জানাইলেন, উপযুক্ত মনোমত পাত্রী, শ্বশুর ও সম্বন্ধী পাইলে, তিনি বিবাহ করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক নহেন। কামিনী বাবু বিবাহ সম্বন্ধে যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, অন্তত লোকে যাহা বলে,—তাহা আমরা প্রকাশ করিলাম,

যথা,—"পাত্রীটীর ধমনীতে নিয়তই যে আর্য্য-শোণিত বহিতেছে, ইহার বিশেষ প্রমাণ থাকা চাহি। মাতৃকুলে ডেপুটীপদপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী এবং পসারওয়ালা উকীল, সমুদায়ে তিন চারি জন থাকা আবশ্যক। পিতৃকুলে,—পিতা, নিঃসন্তান হইবে,—এবং নিদান পক্ষে তাঁহার পঁচিশ হাজার টাকা জমিদারীতে আয় থাকিবে। কন্যার রঙ—তুষারনিভ শ্বেতবর্ণও নহে, নবোদিত বাল-সূর্য্যের ন্যায় লালবর্ণও নহে, অথবা অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত বসোরা-দেশ-সম্ভূত গোলাপপুষ্পের ন্যায় বর্ণও নহে—খাঁটি দুধে-আল্‌তা মিশাইলে যাহা হয়, তাহাও নহে। এ রঙ কেমন এক প্রকার বর্ণনাতীত হইবে। তার পর শ্বশুর সাড়ে বার হাজার টাকার গহনা দিবেন, বিবাহের পর দিন হইতে বরকে পকেট খরচের জন্য মাসিক ১০০৲ টাকা দিবেন। কন্যার সঙ্গে দুইটী দাসী আসিবে, তাহার খোরাকী ও মাহিনা শ্বশুর দিবেন। এবং মৃত্যুর ছয়মাস পূর্ব্বে শ্বশুর তাঁহার সমস্ত বিষয় কামিনীর নামে উইল করিয়া যাইবেন। এই সকল স্থির হইলে, দেখিতে হইবে, কন্যাটী পবিত্র প্রেম বুঝে কি না, বিবাহের পর দিন হইতে কামিনী বাবুর সহিত ইংরেজীতে কথাবার্ত্তা কহিতে পারে কি না, এবং আচার-ব্যবহার হাব-ভাব ইংরেজী-মতে কি না? এই সকল সম্পূর্ণরূপে ঠিক হইলে, অবশেষে কন্যাটীর ধর্ম্ম সম্বন্ধে পজিটিভিষ্ট হওয়া চাই।" কামিনী বাবুর বিবাহের ফর্দ্দ শুনিয়া মা বাপ হত-বুদ্ধি হইলেন, প্রতিবেশি-মণ্ডল অবাক্ হইয়া গালে হাত

দিলেন, চাক্‌রাণীকুল পরস্পর আঁখি-ঠারাঠারি করিয়া মুচ্‌কে হাসি হাসিল।

বিধু বাবু কামিনীর সহপাঠী; বড় স্পষ্টবক্তা লোক,—পাড়ায় তাঁহার পসার অধিক। কামিনীর পিতা বিধুকে অনুরোধ করিলেন,—"দেখ বাপু, কামিনীর মনের কথা কি, তাহা তুমি না হইলে কেহ বুঝিতে পারিবে না;—একবার তুমি তাহাকে বুঝাইয়া বল। বিধু বাবু অমনি কামিনীর নিকট আসিয়া উপস্থিত; বলিলেন,—"কি হে কামিনী, আজ-কাল কেমন আছ?—তোমার নাকি বিবাহ হবে? বেশ বেশ! এ বয়সে অর্দ্ধাঙ্গী না হলে সাজে কি?—শুনিতেছি, তোমার ক'নে পছন্দ হইতেছে না; বল দেখি ভাই! তুমি কিরূপ স্ত্রী চাও?" কামিনী বাবু যেন হঠাৎ বিরক্ত হইয়া গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন—"ছি! তুমি সর্ব্বদা স্ত্রী-লোকের কথা কও কেন?—আমি ও-সব কথা ভাল বাসি না; নারীজাতি পরম পবিত্র; তাঁহাদের কথা লইয়া ঠাট্টা-তামাসা করিতে নাই, ওরূপ কথায় তাঁহাদের অঙ্গে কালিমা স্পর্শ করিতে পারে, অপর কথা কও।" বিধু বাবু হাসিয়া বলিলেন, "তত্ত্ব কথা পরে হবে;—ডারউইনের থিয়রি—Survival of the fittest এ সব কথা শেষে হবে; একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সেই ত আমরা চিরকালটা এক সঙ্গে পড়িতাম, সেই আজীবন নোট মুখস্ত করে, গলা ভেঙ্গে গিয়াছে;—তবে আমার অপরাধের মধ্যে আমি গত বৎসর

বি, এ, পাস হই, তুমি ফেল হও!—জিজ্ঞাসা করি, তুমি ইহার মধ্যে এত নীতিজ্ঞ হইলে কিরূপে? স্ত্রীলোকের নামে অমন চম্‌কে উঠ কেন? এদিকে বিবাহের নামে ত কম্পিত-কলেবর দুর্ব্বাসা, ওদিকে ফর্দ্দ দিবার সময় যেন পাকা মুচ্ছুদ্দি। আমরা ভাই মোটা-বুদ্ধি লোক; বড় কিছু বুঝি না, তুমি ইহারই মধ্যে পবিত্র প্রণয় বুঝেছ। তুমি যেরূপ কন্যার ফর-মাইস্ করেছ, তাহা বেদে নাই, কোরাণে নাই, বাইবেলে নাই, এত শিখিলে কোথায়? আমাকে আজ সব বুঝাইতে হইবে।"

কামিনী বাবু দেখিলেন, আজ শক্ত লোকের হাতে পড়িয়াছেন,—নিস্তার নাই। ক্রমে একটু নরম হইয়া বলি-লেন—"তোমার ভাই চিরকালটা, এক রকমেই গেল, কেবল সেই ঠাট্টা, আর তামাসা নিয়েই আছ।" বিধু বাবু উত্তর করিলেন, "তামাসা নয়, সত্য সত্যই জিজ্ঞাসা করিতেছি, পবিত্র প্রণয়ের অর্থ কি? আমরা বি, এ, পাস হয়েছি বটে, কিন্তু তোমার পড়াশুনা অনেক;—আমার অপেক্ষা তোমার জ্ঞানের প্রসর অধিক; কামিনী বাবু ধীরে গম্ভীরে উত্তর করিলেন "পবিত্র প্রণয় বর্ণমাতীত, তাহা কেবল হৃদয়ে ধারণ করিতে হয়, দেহের সহিত তাহার কোন সংস্রব নাই, কেবল মনের সঙ্গে তাহার দেখাশুনা; সেই অনির্ব্বচনীয় প্রণয় না জন্মিলে, বিবাহ করিতে নাই—সে প্রণয়রস বিনা সংসার বৃথা, শরীর বৃথা, প্রাণ বৃথা!" বিধু বাবু বলিলেন,

—"সেই অনির্ব্বচনীয় জিনিষটা কি একবার শুনিতে পাই না ?"

তখন কামিনী বাবুর হৃদয়ে উচ্ছ্বাস উঠিল। কল্পনা-দেবীর আবির্ভাবে আর পার্থিব গদ্যে কথা কহিতে পারিলেন না,—অবিরল অবিশ্রান্ত কবিতামালা স্বতঃ মুখ-নিঃসৃত হইতে লাগিল ;—

হায় সখে ! কেমনে বর্ণিব তাহা—
যাহা জাগরণে স্বপ্ন, স্বপ্নে জাগরণ,
যাহা ধরাধামে স্বর্গ, নরকে বৈকুণ্ঠ,
হৃৎপথে যে ভাব উদিলে, হৃদি কাঁপে
গুরু গুরু,—যথা যবে প্রভাত-কমলে
শিশিরের বিন্দু, কাঁপে প্রভঞ্জন-বলে।
কেমনে বর্ণিব—দীন আমি—কোথা পাব
রত্নরাজি—সে ভাবময়ী, সে মধুময়ী
নারীমূর্ত্তি—জেগে উঠে মৃত দেহ যার
দরশনে,—হায় যথা উঠেছিল জেগে
কপিবৃন্দ শ্রীরাম লক্ষ্মণ আদি,—ত্রেতায়—

বিধু হাসিয়া বলিলেন—"আর না, থাম ভাই ! আমি বুঝিয়াছি। এখন কথা হইতেছে, ও-সব বাজে কথা—ভণ্ডামি রাখ—সংসারে যা রয় বসে, তাই কর, পাগলের মত পবিত্র প্রণয় ভেবে মিছে দিন কাটিও না, গৃহকার্য্যে মন দাও—টেড়িকেটে, পোষাক এঁটে বেড়ালে ত দিন যায় না।

মা বাপকে আর মনোব্যথা দিও না। আর শুধু পবিত্র প্রণয় কৈ?—১২ হাজার টাকার গহনা চাহি—জিজ্ঞাসা করি, স্ত্রী ৫ হাজার টাকার মতির মালা গলায় না দিলে কি পবিত্র প্রণয় জন্মে না? লেখা পড়া শিখেছ,—বক্তৃতা দাও, গহনাপ্রথা, পণপ্রথা ভাল নয় বল—এখন কি?—একটী ভাল কন্যা স্থির হয়েছে; কন্যাটী রূপে বল, গুণে বল, বংশে বল, তোমার অপেক্ষা ঢের ভাল।" কামিনী বলিলেন,—"শুধু রূপ, গুণ, বংশ লইয়া কি করিব?" বিধু উত্তর করিল,—"ধুনা দিতে হবে।" কামিনী—"তোমার কেবল তামাসা, বলি কতদূর ইংরেজি পড়েছে? বিধু—হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের সোসিওলজী মুখস্ত করিয়াছে—হবেত? ইংরাজীতে আউট না হ'লে কি বিবাহ করা হয় না? ১০।১১ বৎসরেরের মেয়ে তোমার জন্য কত ইংরেজী পড়িবে বল? কন্যাটী বাঙ্গালা বেশ জানে, ইংরেজীও একটু একটু শিখিতেছে?"

কামিনী দুঃখিত হইয়া উত্তর করিলেন—"মাপ কর ভাই!—আমার বিবাহে কাজ নাই।—পিতাকে বলিও তিনি যেন পুত্রের কোন আশা ভরসা না করেন,—আমি চলিলাম; আমি সন্ন্যাসী হইয়া দেশে দেশে ফিরিব।" বিধু বলিলেন—"তুমি কুপুত্র।" বিধুর মুখে কামিনীর বৃত্তান্ত শুনিয়া পিতার চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িতে লাগিল। গৃহে হাহারব উঠিল—মাতা মুর্চ্ছিত হইলেন। সেই দিন হইতে কামিনীকে আর দেখিতে পাওয়া গেল না—দুষ্ট লোকে

কাণাকাণি করে, বিবাগী হইবার সময় কামিনীর পকেটে ছাকাটপ্পার একখানা খাতা ছিল, কেহ কেহ বলে, সেটা গানের খাতা নহে, দাশুরায়ের ছেঁড়া পাঁচালি,—কিন্তু যাঁহারা সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা বলেন,—পাঁচালি ও খাতা দুইই ছিল।

কাল্পনিক স্বদেশানুরাগ।

দিনের পর দিন যাইতেছে, কালচক্র চোখের উপর বুকের মাঝে অনবরত ঘুরিতেছে,—বল দেখি ভাই! কি গতিতে তোমার এই ক্ষণভঙ্গুর জীবন অতিবাহিত হইতেছে? এ দাস-জীবনের বদ্ধ-স্রোত, এ মহাশ্মশানের দগ্ধমরু দিয়া চিরদিনই কি অমনি একই ভাবে ধীকি ধীকি বহিবে?—কখনই কি আর সে বেগ, সে তরঙ্গ-বিক্রম, সে স্ফূর্ত্তি দেখা দিবে না?—গিরিকন্দর-বিদীর্ণকারিণী স্রোতস্বতী আর কি কখন দুরন্ত ঐরাবত ভাসাইতে সক্ষম হইবে না? তোমরা যা বল, যা ভাব, ভাই! আমি কিন্তু চারিদিকেই ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন নিবিড় অনন্ত অন্ধকার দেখিতেছি—নির্জীব, ক্ষীণ, মুমূর্ষুপ্রায় দেহ ধূলায় লুটাইতেছে,—জ্ঞান নাই, চৈতন্য নাই, উত্থানশক্তি নাই—শৃগালকুক্কুর সদাই পদাঘাত করিতেছে; এ নিস্পন্দ, নিশ্চল, অসাড় জীবনের উদ্দেশ্য নাই, আশা নাই,—এ শ্মশানে কেবল একমাত্র শবরাশির হাট!

আর সহ্য হইল না। স্বদেশহিতৈষী যুবক দাঁড়াইয়া উঠিলেন। কক্ষ হেলাইয়া, বক্ষ ফুলাইয়া, হস্ত নাড়িয়া, মুখ বিকৃত করিয়া, সুর ভাঁজিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে সে গগনভেদী বিকট রাক্ষসী-সুর, মেঘগর্জ্জনের ন্যায় ধ্বনিত হইতে লাগিল—গোরু, মানুষ অস্থির হইয়া পড়িল, আসন্ন-প্রসবা রমণী ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ত্রাহি মধুসূদন, ত্রাহি মধুসূদন, ডাক ছাড়িতে লাগিল। সেই গারিবল্ডীর অবতার, ওয়াশিংটনের প্রপৌত্র, কসথের মাসতুত ভাই, আরাবী পাশার সম্বন্ধী—তখন ম্লেচ্ছভাষায় চীৎকার করিতে লাগি-লেন—কোন্ মূর্খ বলে, ভারত নির্জীব?—আমি যে বক্তৃতা দিয়া—দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায়, বাড়ী বাড়ী বক্তৃতা দিয়া, ভারতকে সজীব করিয়া তুলিয়াছি! ঐ দেখ, রাস্তা দিয়া কত লোক বেগে চলিয়া যাইতেছে। এন্ট্রেন্স পরীক্ষায় এবার যে ৩২ শত ছাত্র উপস্থিত হইল, সে আমারই বক্তৃতাবলে; এই যে ৯ আইন উঠিয়া গেল, সে আমারই বক্তৃতাবলে; এই যে রমেশ মিত্র হাইকোর্টের চীফ্ জষ্টিস হইলেন, সে আমারই বক্তৃতাবলে; অধিক আর কি বলিব, এই যে আত্মশাসনপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইতে চলিল, তাহাও আমারই বক্তৃতার বলে।—বক্তৃতা, বক্তৃতা, বক্তৃতা,—অচিরে ভারত উদ্ধার হইবে! ভারতবাসি! ভয় নাই, আমি আছি; বক্তৃতা দিয়া তোমাদের সকল অভাব মোচন করিব;—বক্তৃতায় তোমাদের শত শত সহস্র সহস্র

কলের জাহাজ সমুদ্রবক্ষে ভাসিয়া উঠিবে; বক্তৃতায় দেশান্তরে কলের তাঁত প্রস্তুত হইবে; বক্তৃতায় বঙ্গের কৃষককুল কলের লাঙ্গল পাইবে; বক্তৃতায় ইহকালে ইন্দ্রপদ, পরকালে মোক্ষপদ, লাভ হইবে। হা ভারতবর্ষ! তোমার সন্তানগণ বুঝে না যে, তুমি কি পদার্থ! আমি একলা মানুষ—কদিক দেখিব? আমাকে একটী দোসর দাও, তখন আমি আরও তোমাকে ঊর্দ্ধে তুলিতে পারিব। হা ভারতবাসি! হা প্রাণের ভাই! হা অভেদ-আত্মা! এস ভাই! একবার কাছে দাঁড়াও। তোমরাই আমার সম্বল, তোমরাই আমার সহায়, তোমরাই আমার সম্পত্তি। আমি তোমাদের জন্য দিবানিশি চক্ষের জল ফেলিতেছি,—তোমাদের জন্য আমার উদরে অন্ন রুচে না, রাত্রে ঘুম হয় না; তোমাদের জন্য ভাবিয়া ভাবিয়াই আমি এরূপ জীর্ণ-শীর্ণকায়। অদ্য আর না—বিদায়!"

আমি ভাবিলাম, লোকটা কে?—বিশেষ তথ্য জানিতে হইবে; পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলাম। রাত্রি প্রায় ৯টা হইল। বাবু তাঁহার বসিবার ঘরে প্রবেশ করিলেন; আমি বাহিরের বারান্দায় প্রচ্ছন্নভাবে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। একটী বালক আসিয়া মৃদুস্বরে বাবুকে বলিল, "দাদা স্কুলের মাহিনা দিন।" দেশহিতৈষী দাদা বলিলেন, "আমার হাতে টাকা নাই, কিছুকাল অপেক্ষা কর।" ছোট ভাইটী বলিলেন,—"দাদা, কাল মাহিনা না দিলে নাম কাটিয়া

দিবে,—আপনি ত বলেছিলেন, আজ নিশ্চয়ই দিবেন।” বালকের চোখ ছল ছল করিতে লাগিল। দাদা তখন চক্ষু রক্তবর্ণ করিলেন——দন্তে দন্তে সংঘর্ষণ করিলেন,—“তোমার যে স্কুলের মাহিনা দিব স্বীকার করিয়াছি, তাহার কিছু রেজষ্টরী লেখাপড়া আছে বলিতে পার?—এই বক্তৃতা করিয়া আসিলাম, এখন বিরক্ত করিও না; এখন এখান হইতে চলিয়া যাও। তুমি আমার পিতার পুত্র না হইলে, এখনি উপযুক্ত শাস্তি দিতাম।” বালক তখন অধোমুখে সজলনেত্রে প্রস্থান করিল।

মলিনবস্ত্রপরিধানা, পরিপাণ্ডুমুখকান্তি, বৃদ্ধা জননী গুটি গুটি আসিয়া উপস্থিত—দেশহিতৈষী পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—“বাছা গোপাল, আজ সমস্ত দিন তোমাকে দেখিতে পাই নাই, তাই এত রাত্রে এখানে এলাম। কাল একাদশী, আমার হাতে একটি পয়সাও নাই, বাছা তুই আমার পেটের ছেলে, তোকে না বলেই বা বলি কাকে, আমার আজ সমস্ত দিন আহার হয় নাই—বড় ক্ষুধা হয়েছে, আমাকে আজ কিছু পয়সা দে।” স্বদেশানুরাগী যুবক উত্তর করিলেন,—“তোমার পয়সা পয়সা বুলি আর ঘুচিল না—এত রাত্রে আমি তোমার জন্য পয়সা বার করে বসে আছি কি না, দে বলিলেই অমনি পয়সা পাইবে। আর তোমার কাছে যে পয়সা নাই, তাহা আমি একদিনের জন্যও বিশ্বাস করিতে পারি না; বাবা যত টাকা রোজগার করিতেন,

সবই তোমার হাতেই দিয়াছিলেন, সে সব টাকা কোথায় গেল? কেবল, আমাকে ফাঁকি দিয়ে তোমার অপর ছেলে-দিগকে সেই টাকাগুলি দিবে মনে করিয়াছ! তাহা পারিবে না, আদালত খোলা আছে। তোমাকে দেখিয়া আমার সর্ব্বশরীর জ্বালা করিতেছে;—তোমার সকলি ভণ্ডামি;—তোমার মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছি, তুমি দিব্য করিয়া আহার করিয়াছ; আমরা বহুদর্শী লোক, রাজ-নীতি বুঝি, আমাদের নিকট ফাঁকি দিবার যো নাই। মিছা গোল করিও না, কাযের ক্ষতি হয়।" জননী বলিলেন—"বাছা! আমি মিছা কথা কহি নাই—বাছা! তোর দিব্য করে বলছি, আজ আমার খাওয়া হয় নাই। কোথা কি পাব? তুমি ও মাসে তিনটী টাকা দিয়েছিলে, তাতেই সে মাসটী বেশ চলেছিল। গোপাল! এ বুড়ো মাকে আর কষ্ট দিস্ না।" জননীর চক্ষু দিয়া দরদর ধারে জল পড়িতে লাগিল।

স্বদেশানুরাগী পুত্র বলিলেন—"এখন কাঁদলে কি হবে?—ও মায়াকান্না ঢের দেখিছি। একটুতে চোখ্ দিয়ে জল পড়ে,—যেন থিয়েটারের অভিনেত্রী। তোমার কাছে যদি কিছুই না থাকে, আমার বিশ্বাস, তবুও অন্ততঃ এখনও দশ হাজার টাকা মজুদ আছে।"

মাতা বলিতে লাগিলেন,—"গোপাল, তোকে আর কি লুকাব?—আমার অদৃষ্ট মন্দ,—পূর্ব্বজন্মে কোন পুত্রবতী

মাতাকে কষ্ট দিয়া থাকিব, তাই এ জন্মে তার ফলভোগ করিতেছি। বাছা! আমার হাতে টাকা কি করে থাক্‌বে? তোর বাপ যখন স্বর্গে যায়, তখন তোরা সব শিশু,—সেই অবধি বিশ বৎসর কাল, একটী পয়সা কেহ রোজগার করিয়া দেয় নাই; সেই টাকা থেকে আমি তোদের ভরণপোষণ করেছি—লোক-লৌকতা রেখেছি,—স্কুলের মাহিনা দিয়াছি, ঘরে মাষ্টার-রাখিয়া পড়াইয়াছি। গোপাল! বোধ হয়, তোর মনে আছে, শেষে বাড়ী বাঁধা পড়ে—বাছা! আমি কার জন্য টাকা লুকায়ে রাখিব বল?—তোরাই ত আমার সর্ব্বস্ব, জীবনের জীবন। বাছা! আমার অঙ্গে তিন হাজার টাকার গহনা ছিল, একে একে সবই বাঁধা পড়ে। শেষ কেবল তোমার পিতৃদত্ত একটী অঙ্গুরী ছিল—তাহাতে তোমার পিতার প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল,—সর্ব্বস্ব হারাইয়া সেটী আমি রাখিয়াছিলাম, কিন্তু বাছা সেটীও আর নাই”—

জননীর কণ্ঠরোধ হইল।

বাবু বলিলেন—“Halo! How have you lost that? আমি পিতার জীবন-চরিত লিখিব মনে করিয়াছি, তাঁহার চেহারা পাইলে পুস্তকে একটী প্রতিমূর্ত্তি দিবার ইচ্ছা ছিল। —তুমি বড় ডোক্‌লা, ছি! ছি! কি রকমে তাহা নষ্ট করিলে?”

জননী বলিলেন—“গোপাল! তোমার জন্য তাহা হারাইয়াছি। তখন আমাদের বড় কষ্ট—তোমার পরীক্ষা

দিবার জন্য ২০৲ টাকা চাই ;—তুমি ছল ছল নয়নে আসিয়া বলিলে,—"মা কি হবে—আমি তোমার মুখ দেখিয়া বলিলাম, বাছা! ভাবিস্ না।—আমি সেই অঙ্গুরী বেচিয়া তোমায় ২০৲ টাকা দিলাম,—বাছা তোমারাই আমার সব—এ সংসারে আমার আর কে আছে ?" বুদ্ধিমান্ পুত্র বলিলেন—"তোমার কথায় আমার বিশ্বাস নাই। জননী বলিলেন—"গোপাল! বিশ্বাস করিয়া কাজ নাই,—আমি তোমার বৃদ্ধ মা, আমি দুটী পয়সা ভিক্ষা করিতেছি,—এ রাত্রে আমি কোথায় পয়সা পাব, —আমার বড় কষ্ট হইতেছে।" স্বদেশহিতৈষী পুত্রের তখনও ক্ষমা নাই, বলিলেন—"তুমি বিরক্ত করিও না,—তোমার জ্বালায় অস্থির হইয়াছি ;—খুজরা পয়সা দিব না, হিসাব-গোল হইবে, আমি কাল বৈকালে তোমাকে এ মাসের দরুণ ৩৲ টাকা দিব—শীঘ্র এখান হইতে চলিয়া যাও।—Local Self-Government এর Scheme আজই draft করিতে হইবে।"

জননী ঊর্দ্ধমুখে যোড়হস্তে সজলচক্ষে ভগবান্‌কে ডাকিলেন, "ভগবন্! আর আমায় যন্ত্রণা দিও না—যম! আমায় গ্রহণ কর"—মনে মনে বলিলেন—চক্ষের জল ফেলিব না, বাছার অমঙ্গল হইবে, এই বলিয়া জননী ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।

ক্রমে রাত্রি হইল। আমি কাণ্ড দেখিয়া অবাক্ হইয়া পলাইবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় দেখিলাম, বাবুজী বাক্স হইতে নূতন জড়াও স্বর্ণ চুড়ি বাহির করিয়া লইলেন,

এবং দ্রুতপদে অন্দরাভিমুখে চলিয়া গেলেন। আমি ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া আসিলাম, ইহাঁরাই কি আমাদের স্বদেশহিতৈষী? ইহাঁরাই কি আমাদের দেশের গারিবল্ডী, ম্যাট্‌সিনি?—যেমন দেশ, তেমনি তার গারিবল্ডী।

স্বদেশানুরাগ বড় শক্ত পদার্থ। সহজে দেশের প্রতি মমতা জন্মে না,—শিক্ষা চাই, সচরাচর একপুরুষে প্রকৃত দেশহিতৈষিতা জন্মে না। দুঃখ এই, আমাদের দেশে অনেক বিড়াল তপস্বী হইয়াছেন,—আগাছা জন্মিয়া জঙ্গলময় দেশকে আরও জঙ্গলময় করিতেছেন। স্বদেশের জন্য প্রাণ দিতে হয়, হৃদয়ের শোণিত দিতে হয়, স্বার্থত্যাগ করিতে হয়। আমাদের দেশের স্বদেশানুরাগী পুরুষের আত্মত্যাগ দূরে যাউক,—দুই পয়সার জন্য কাতর। ম্যাট্‌সিনি জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া, সংসারসুখ ছাড়িয়া, অর্থলোভ দমন করিয়া কতকাল অন্নকষ্টে থাকিয়া স্বদেশের কার্য্যে ঘুরিয়াছিলেন। তেমনটী এখানে কে আছেন? আমাদের দেশের লোকের কার্য্য দেখিয়া ধিক্কার জন্মিয়াছে। সকলি কাল্পনিক, সকলি মৌখিক। তাই বলিতে হয়, দেশ অন্ধকারময়; বাঙ্গালী যে জড় পদার্থ, সেই জড় পদার্থই আছে,—যেরূপ নির্জীব ক্ষীণবল ছিল, এখনও সেইরূপই আছে। শক্তি বৃদ্ধি হয় নাই,—চলিতে শিখে নাই, হামাগুড়ি দিয়া সেইরূপই চলিতেছে,—চক্ষু ফুটে নাই—পরের চোখে সেইরূপই আবছাওয়া দেখিতেছে;—লাভের মধ্যে এখন আমরা ভণ্ডতপস্বীর

প্রতাপে মারা যাইতেছি। ইহার প্রতিকার না হইলে আমাদিগের আর মঙ্গল নাই।

ভারত মাতার শ্রাদ্ধ।

প্রথম সর্গ।

কাঁদে গয়ারাম, গুরু গভীর গর্জ্জনে,—
"Awake, O ! mother, arise, awake"
কথা ক মা, জ্যেষ্ঠ পুত্র আমি—গয়ারাম ;
তোর তরে খেটে খেটে গায়ে নাই রক্ত ;
ব'কে ব'কে ভেঙ্গে গেছে গলা ; লিখে লিখে 'নিব'
কত ভোতা—জে' মার্কা ; কি আর অধিক ক'ব,
কোমরে ধরেছে ফিক্—গাঁটে গেঁটে-বাত
—ভ্রমি কত রে পথে দেশ দেশান্তরে।
আবার ডাগর ডাকে ডাকি গো জননি !
"Awake, O ! mother, arise awake"
তথাপি ভারতমাতা নাহি দিল সাড়া ;
স্তিমিত নয়নযুগ্ম মলিন বদন,
বিশুষ্ক অধর-প্রান্ত, নিশ্চল শরীর,
এলো থেলো কেশরাশি—আছেন পড়িয়া।
তখন ফুকারি কেঁদে উঠে গয়ারাম,
মা মোলো মা মোলো বুঝি হ'ল সর্ব্বনাশ !

কোথা হে মিষ্টার যদু, মিস্ ক্ষুদিরাম,
মিসেস্ পাঁচী বা কোথা—এস অসময়ে ;
এ সাধের মায়ে বুঝি নারিনু বাঁচাতে।
মাতার সঙ্কট শুনি, এলো ধাওয়াধাই,
ভজহরি, পাঁচকড়ি, ক্ষুদিরাম যদু—
বাম করে স্ত্রীলোকের ধাত দেখে ক্ষুদি,—
যদু চোঙ বসাইল জননীর বুকে,
পাঁচু ব্রাণ্ডি ঢেলে দিল জননীর মুখে
—মিশাইয়া জুস্ তাহে বাচ্ছা মোরগের ;—
ভজহরি ক্ষুরে করি মুড়াইল মাথা ;
গয়ারাম উচ্চরবে ডাকিল আবার
Awake O "Mother ! arise awake"
তথাপি নিঠুর মাতা না দিলা উত্তর।
তখন বুঝিল সবে নিশ্চয় মরণ।
ধরাধরি করি মায়ে করিল বাহির।
বিলপিল ভক্তবৃন্দ করি হায় হায়।
হরি হরি বলো সবে সর্গ হলো সায়॥

দ্বিতীয় সর্গ।

কৃষ্ণ-অঙ্গে কালো-কোট পরে গয়ারাম ;
কালো কোটে বসাইল কালো-রং ফিতা—

ত্রিকালোয় গয়ারাম সাজিল অদ্ভুত—
ভূষো-মাখা ভোম্‌রা যেন ঢাকা দিল মেঘে।
একে একে, দুয়ে দুয়ে সন্তান সকল
অশৌচ গ্রহণ করে মায়ের লাগিয়া।
তখন বিরলে বসি ভাবিল যুকতি,—
"কিরূপে হইবে শ্রাদ্ধ, কিরূপে সদ্‌গতি."
উত্তরিল ভজহরি করি যোড় কর,—
"শুন মন দিয়া, এ যে বিষয় ব্যাপার—
পুড়াবে কি মাতৃ-অঙ্গ জাহ্নবীর কূলে ?"
ছি ছি ছি, ছি ছি ছি ধ্বনি করে গয়ারাম ;—
"কি কহিলি, রে বর্ব্বর! বাঙ্গালী-কুলের কালী
ঊনবিংশ শতাব্দীর এই শেষ ভাগ—
আলোকিত দেশ যত সভ্যতা আলোকে,—
অসভ্যতা-পণা এবে, দাহি দেহ! শুধু
দাহ নহে—গঙ্গা উপকূলে—! Prejudice!
Thy name is Traitor!! শুনিবে যখন ;
ইংলণ্ডবাসী এ কথা ঃ কাটি করি কালী
দিবে মুখে ;—হাসালি জগৎ,—উপযুক্ত
শিষ্য তুই না পারিলি হ'তে ভাগ্যদোষে।
ছল ছল চোখে পুন বলে ভজহরি,
"না বুঝিয়া গুরুদেব কেন দাও গালি ?
এই কি বিশ্বাস তব,—আমিই বলিব

দাহিবারে দেহ ?—সভ্যভূমিসম্মানিত
নহে যাহা ?—যুনানী-মণ্ডলে যাহা নহে
প্রচলিত ?—গোর দিব মাকে, সার কথা
এই।" ক্যাবাৎ ক্যাবাৎ ধ্বনি উঠিল সভায়
ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্ বলি দিল করতালি।
"কোথা দিবে মাতৃগোর ?" হাঁকে গয়ারাম।
"ওয়েষ্টমিনিষ্টার-আবি নামে কাছে পুণ্যভূমি,
বিলাতের এক প্রান্তে,—সতীসাধ্বী রাণী
এলিজেবেথের পাশে, গোরিব মায়েরে ;
অথবা ফরাসী-ভূমে, শ্রীমতী রোলন্দ
আছেন শয়ান যথা—পতিপরায়ণা
গুণবতী সতী। আনন্দলহরী-লীলা
খেলিল সভায় ; উঠিল সুখের ঝড়,
মড়্মড়ি কাঁপিল গেহ ;—ফুরাইল সর্গ।

তৃতীয় সর্গ।

মায়ের ছরাদ হবে—দিন স্থির হয় কবে
ভক্তগণ ভাবিয়া আকুল।
খৃষ্টের জনমক্ষণ, স্থির করে ভক্তগণ,
সেই দিনে সব সুপ্রতুল॥

কিবা শ্রাদ্ধ-আয়োজন, কিবা তার উপকরণ
কার হাতে দিব যজ্ঞভার।
কোথা হ'তে টাকা পাই, উপায় চিন্তহ ভাই,
অসময়ে ভাব নাম তাঁর॥
শ্রাদ্ধ হবে টৌনহলে পৌরহিত্য জন্‌বুলে
মন খুলে করিনু অর্পণ।
উৎসর্গ হইবে বৃষ,———মায়ের সপ্ত পুরুষ
স্বর্গধামে করিবে গমন॥
টাকা চাই টাকা চাই, কোথা গেলে টাকা পাই,
কেমনে পূরিবে মনস্কাম।
গয়ারাম বলে ছি! টাকার ভাবনা কি,
টাকা তোলা কত বড় কাম॥
চাঁদার বাঁধহ খাতা, রূল টান পাতা পাতা,
নাম রাখ শ্রাদ্ধ-ফণ্ড বলি।
দেশে দেশে সবে ফিরি, সহি লও বাড়ী বাড়ী,
ত্বরাত্বরি কাঁধে লও ঝুলি॥
কলিকালে হদ্দমুদ্দ, মায়ের হইবে শ্রাদ্ধ,
আদ্যক্রিয়া ভারত-ভিতর।
পিণ্ডি দিবে গয়ারাম, পূর্ণ হবে মনস্কাম,
করতলে ধর্ম্ম-অর্থ—বর॥
চাঁদার খাতা বগলে, চলেছে মা-মরা-ছেলে,
মুখে উড়ে চুরটের ধূম।

"ভিক্ষা দাও গো প্রতিবাসী! মা মরেছে দেখ আসি,
শ্রাদ্ধ হ'বে মহা ঘটা ধুম ?"
দ্বিজ কবিরত্ন ভণে, ঝলি পুরি দাও ধনে,
জননীর হইবে উদ্ধার।
বাসি মড়া ঘরে পচে, টাকা দিলে মান বাঁচে,
সর্গশেষ হৈল এইবার॥

চতুর্থ সর্গ।

তেজঃপুঞ্জ যোগী এক, গৌরাঙ্গ বরণ,
ধবক্ ধবক্ জ্বলে চক্ষু, ভালে শশিকলা,—
কহিতে লাগিল ধীরে, সুগম্ভীর স্বরে—
"কেন বাপু, ক্ষিপ্তপ্রায় ভ্রম অকারণ ?
কে কহিল,—মরেছেন, ভারত-জননী ?
অনন্ত অক্ষয় মাতা মরিবার নয়!"
উত্তরিল গয়ারাম হাসি হাসি মুখে,—
কি বলিলে ? মরে নাই মা ? ভণ্ড যতি
তুই!—ডেকেছি ইংরেজী ছন্দে শতবার
মাকে,—সাড়া নাহি দিল তবু মাতা! ক্ষুদী
বলে, ফরাসী ভাষায় ডাকিয়াছি আমি,—
বলে ভজহরি, জননীরে জর্ম্মাণেতে
সম্বোধিছি কত, তবু নিরুত্তর হায়!

যথা যবে পোড়া শোল মাছে, দিয়া নুন
কচুটিলে আর নাহি রঙ্গে ভঙ্গে নড়ে ;
—যদিও পুকুরে তাহা ফেলাইয়া দাও।
কহিতেন যোগিবর, "ভ্রান্ত বড় তোরা।
ডাক্ দেখি রসনায় সেই সুধা নাম,
—মা, মা, বলে—কাতরা জননী উঠিবেন
জেগে ;—চুম্বি মুখ, সন্তানে দিবেন কোল।"
ঐ শোন্ কি বোল বলিছে মাতা মোরে,
পুত্র! বল দেখি সত্য করি, এতক্ষণ
বিকৃত ভাষায় কা'রা, বিকৃত বদনে,
বিকৃত স্বরেতে ডেকেছিল কার নাম?
—কিছু বুঝি নাই ;—ডাকে ওষ্ঠাগত প্রাণ।"
গয়ারাম বলে ওহে ভজহরি ভাই—
মাতাকে পেয়েছে পেত্নী,—মড়া কয় কথা!
চলহ পলাই সবে এ কুস্থান হ'তে :
জীবন হারাই বুঝি এ শ্রাদ্ধ-সঙ্কটে!
ছাড়িব না পিণ্ড দান, চাঁদার আদায়!
হরি হরি বল সবে পালা হলো সায়।

সম্পূর্ণ।

বাঙ্গালী-চরিত।

দ্বিতীয় ভাগ।

পূজার চিঠি।

১২৯০ সাল, ১৫ই আশ্বিন, রাত্রি ৮টা।

(স্ত্রী, স্বামীকে)

প্রাণের নগেন !

আমি তোমায় এত পত্র লিখি, কিন্তু তুমি তার সময়ে উত্তর দাও না। তোমার জন্য মন যে কি করে, তা আর কি বল্‌বো। রোজ রোজ এক এক খানি তোমার পত্র পেলে তবুও কতক সন্তুষ্ট থাকি, কিন্তু তাতেও বঞ্চিত ; সপ্তাহে দুখানি বৈ পত্র লেখ না। তোমার জন্য ভেবে ভেবে শরীর শুখিয়ে যাচ্চে ; খেতে পারি না, মুখে অন্ন রোচে না, এ অধিনী কেবল সারাদিন তোমার জন্য ভাবে। সকালে ঘুম থেকে শাশুড়ী উঠিয়ে দিলে, অমনি যাহোক একটু জল খেয়ে তোমার জন্য ভাবি ; স্নানের পর তিনি আবার জল খেতে দেন, না-পারি-

না-পারি করে, অতিকষ্টে জল খেতে খেতেই তোমার কথা কত মনে পড়ে! তারপর মধ্যাহ্নে তিনি আবার সম্মুখে এক রাশ ভাত বেড়ে ধরেন, তাকি আমার আর পোড়া ক্ষিদে আছে! কিন্তু কি করি, শাশুড়ী বকেন, রাগ করেন, তিনি যে আমাকে জ্বালা-যন্ত্রণা দেন, তাত তোমার অগোচর নাই! (সে সব কথায় এখন কায নাই; ঈশ্বর যদি দিন দেন, তুমি ঘরে এলে সব কথা হবে) আমি কেবল তোমার খাতিরে তাঁকে কিছু না বলে, ভয়ে ভয়ে ভাতগুলি খাই! তখন যে কত কষ্ট হয়, সে কথা আর কি বল্‌বো—একে অনিচ্ছায় ভাত খেয়ে শারীরিক ব্যথা, তার উপর তোমার জন্য মানসিক কষ্ট! নাথ! তখন এই উভয় কষ্টে অচেতন হয়ে, বিছানায় শুয়ে, ঘুমিয়ে পড়ি—ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও তোমার কথা ভাবি—তাই কি এ পোড়া কপালে একটু সুস্থির হ'য়ে ঘুমাবার যো আছে যে, তোমার কথা একটু ভাব্‌বো আর কষ্ট লাঘব কর্‌বো? বলিলে বিশ্বাস কর্‌বে না, সন্ধ্যা না হ'তে হতেই শাশুড়ী আমাকে "উঠ উঠ সন্ধ্যা হলো" বলে জোর করে উঠিয়ে দেন। আমি কাঁচা ঘুমে উঠে চক্ষু মেলিতে পারি না, কেবল ঢুলি, এতেও নিস্তার নাই; তখন ঘরের সকল কাযই খুটি নাটি ঊনকোটি চৌষট্টী কর্‌তে হয়—যেটী না কর্‌বো, সেটীত আর হবে না! আর শাশুড়ী তখন একগাছা কাঠের মালা লয়ে, পা মেলিয়ে বসে, হরিনাম ঠক্‌ঠকাতে বসেন, কারো সঙ্গে কথা কন না; আমার যে তখন খেটে খেটে

মুখে রক্ত উঠ্‌ছে, তা একবারও দেখেন্ না। নাথ! তখনও তোমার কথা ভাবি। এ সংসারে তোমা বই আর কাহাকেও জানি না। আমার যে এখানে এত কষ্ট এত দুঃখে কাল যাচ্চে, সে জন্য আমি কিছুই চিন্তিত নহি,—আমার ভাবনা, পাছে তোমার সেখানে কষ্ট হয়!

আজিকার ডাকে তোমার পত্র না পেয়ে মন বড় ব্যাকুল হয়েছে। বড়-সাহেব সত্য সত্যই কি পূজার সময়ে তোমায় ছুটি দিবেন না? পূজার সময় তোমার বাটী না আসা হলে ত আমি বাঁচিব না! এ দাসী নিতান্তই প্রাণে মরিবে! এ সংসারে কিছুরই কাঙ্গালী নহি, কোন সাধ নাই, কেবল তোমার চরণযুগল-দর্শনপ্রার্থী। নাথ! অধিনীর মুখপানে চেও। আমি পূর্ব্বের পত্রে যে সকল জিনিসের ফর্দ্দ দিয়েছিলাম, তাহার কিছুই চাই না, কেবল তুমি একবার এসো। পাছে তুমি মনে কর, আমি রাগ করেছি, তাই,- যে দুই একটি জিনিষ না হলে নয়, তাহারই ফর্দ্দ দিলাম। আমার জন্য এক খানি গুলবাহার ঢাকাই কাপড় আনিবে। দেখ, যেন মুখুয্যেদের ছোট বউয়ের মত ঢাকাই হয়; ওবাড়ীর বড়কর্ত্তা ঢাকা থেকে যেমন কাপড় আনিতেন, ঠিক সে রকম [illegible] হলেও চল্‌তে পারে। পূজার সময়ে পাঁচ-বাড়ীর বউ-[illegible] সঙ্গে দেখা করিতে হয়, নেহাত খারাপ ঢাকাই পরে কেমন করে পাঁচ জনের সাক্ষাতে বার হ'বো! আমি নিজের জন্য তত দুঃখিত নহি, পাছে অপরের কাছে তোমার মুখ হেঁট হয়—

এইটীই আমার বড় দুঃখ। কেহ যে, তোমার নিন্দা করিবে, তাহা আমি সহিতে পারিব না। আর এক যোড়া খুব মিহি, চটাল কালার পাছাপেড়ে লাল-বাগানে কাপড় চাই। এটীরও বিশেষ দরকার। প্রত্যহ একখানি ঢাকাই পরিলে লোকে বলিবে, বুঝি উহার ঐ খানি বৈ আর কাপড় নাই; পাছে কেহ তোমায় দোষে, ইহাই আমার ভয়। আর একটা আমার সাটীনের জামা চাই—সেত দেবার কথাই আছে। বাক্স, সাবান, পমেটম, তাস, পশম, আতর, গোলাপ, ল্যাবেণ্ডার,—ঘোষেদের মেজবৌয়ের মত একটী ভাল শিশি, হরি কাকার মত এক খানি ছুরি, ওবাড়ীর দামিনী দিদির মত এক খানি কাঁচি, গোলাপফুলের মত ৮টী কাঁচের পুতুল—এইগুলি সব মনে করে কিনো। আর একটা বিষয় মনে পড়িয়ে দিই; পাক-দেওয়া বালা ও ফুল-ঝুমকাটী ভুলো না; আর বছরের মত পুজার সময়ে ষষ্ঠীর দিন এসে যেন বলো না—"সেক্‌রা দিলে না।" এবৎসর ওদুটি গহনা না হলে লোকের কাছে মুখ দেখান ভার হবে! বিশেষ মল্লিকা দিদির এবারে ৪।৫ খানা নূতন গহনা হয়েছে; আমি যে তার কাছে সব পুরাতন সাবেক গহনাগুলি পরিব, তা কখন পারিব না। গহনা না পরিতে হয়, তাও স্বীকার; তবু সব পুরাণ গহনা পরিতে পারিব না। ভাল কথা মনে পড়িল—পুরাণ গহনাগুলি নূতন রং করাতে হবে। তাহার শীঘ্র বন্দোবস্ত ক'রে কলিকাতা হইতে লোক পাঠাইয়া দিবে। আর আমি কিছুই চাই না—কেবল

একটি ভাই আছে, তাহার জন্য ধুতি, চাদর, জুতা জামা অবশ্য অবশ্য আনিবে; মায়ের জন্য একখানি ভাল পাটের কাপড় আনিবে—মা তোমায় কত আশীর্ব্বাদ কর্‌বেন! তোমার একে ৪০৲ টাকা মাহিনা; আর কিছু বেশী খরচপত্র করে কায নাই; বেশী কোথা পাবে? দুটাকা থাক্‌লে আখেরে কায দেখ্‌বে! আমার শাশুড়ীর জন্য এ বছর আর কাপড় আনিতে হইবে না; তিনি কাপড়ের মর্ম্ম বুঝেন না; গত বৎসর যে থান কাপড়খানি দিয়াছিলে, তাহাই শাশুড়ী পুত পুত করে তুলে রেখেছেন। সে কাপড় পোকায় কেটে নষ্ট কর্‌তেছে, বস্তা পচা হতেছে, এমন দেবার দরকার কি আছে? সে এক টাকা থাকিলে আমার মলের বাণির দেনা শোধ যাবে! কিন্তু তুমি খর্‌চে-মানুষ বলে কিছুতেই তোমার কুলায় না। ঠাকুরঝির জন্যও কাপড় আনিতে হবে না—তুমি একলা মানুষ—কোথা পাবে?—পাঁচ জনকে লইয়াই তোমার ঝঞ্ঝাট। আমি না হয় তাহাকে এক খানা আমার আর বছরের কাপড় দিব। বেশ বুঝেশুঝে খরচপত্র করিবে—অসময়ে কেউ দু-টাকা দেয় না। কিন্তু তুমি আমার কথা শুন কৈ?—আমার কথা শুনিলে কি এত দিন মলের বাণির দেনা থাকে; পূর্ব্ব পত্রে লিখেছিলে, আমার জন্য নব-বৃন্দাবন প্রভৃতি বই আনিবে; যদি খরচের টানাটানি হয়, তবে তাহা আর আনিয়া কায নাই। আমি এ সব বুঝি, বই না আনিলে রাগ করিব কি?—না; বুঝিব, তোমার সঙ্গতি নাই কোথা

পাবে?—কিন্তু লোকে বুঝে কৈ? এই ত আমার দুঃখ। অধিনীর নিবেদন ইতি।

তোমারই কুসুম।

পুনঃ—

আমি আশা-পথ চাহিয়া আছি। এ অবলার প্রতি দয়া করিয়া যেমন করে হউক, ছুটিতে পূজার সময়ে বাটী আসিবে। যদি আমার কপাল মন্দ হয়, যদি একান্তই না আসতে পার, তবে ফর্দ্দমত জিনিষগুলি পাঠাইতে যেন বিলম্ব না হয়, চতুর্থীর পূর্ব্বেই যেন পাই। এ দাসী তোমা বই আর কাহাকেও জানে না।

তোমারই কুঃ—

মহাগীতি।

আয় মা কল্পনা সতি! গাব প্রেমরঙ্গে
গৌড়ভূমে আজ নগেন-কুসুম-গীত—
এক ফোঁটা সুধা—আনন্দে করিবে পান
বঙ্গবাসী যত, নিরবধি। ত্রেতায় যেমতি
চোর রত্নাকর, কবি রত্নাকর এবে
অতুল জগতে গেয়েছিল, মহা-গীত
রামসীতা-কথা। ইংরেজী-এলেমহীন
চোর সে বাল্মীকি, তবু গেয়েছিল ভাল।

সাধু আমি—নারীরূপ হেরি নাই কভু
নয়ন ভরিয়া ; জানি লাটীন ইংরেজী,
বাঙ্গালার ত কথাই নাই—অবশ্যই গাব ভাল।
তেঁই দেবি ! নমি তব পদে বারে বার
অবনী লুটায়ে ! শুনিয়াছ মধু-মাসে
সহকার-শাখে, কোকিল-কাকলী, মধুসম ;
বাঁশরী স্বরলহরী যমুনা-পুলিনে,
নারদের বীণাধ্বনি কৈলাস-শিখরে ;
কিন্তু শুন নাই কভু (সাহসি বলিতে পারি)
এহেন মধুর গীত ; শুন মন দিয়া,
প্রাণ দিয়া, নরনারী যত, কলিকালে
বঙ্গভূমে ; শুনেছিল যথা রাজা পরিক্ষীৎ
শুকদেব-মুখে শ্রীমদ্ভাগবত-কথা,
দ্বাপর কলির সন্ধিকালে (শমীকের শাপে)
যমুনার কূলে ছিল যবে রাজ্য-পাট ছাড়ি।
পূর্ব্বের গগন-ভালে উদেছে অরুণ ;
তামাক খাবার টিকে ধরাবে নগেন,
ঝড় ঝড় ঝাড়িছে চকমকি ; চক্ চক্
চকিছে আগুণ ; ফণিমণি দপে যথা
আন্ধার-ভবনে ; কিন্তু ভিজা সোলা হায় !
অব্যর্থ সন্ধান সদা হইতেছে ব্যর্থ !
যথা যবে পরন্তপ পার্থ মহারথী

গিয়াছিল স্বর্গপুরে ইন্দ্রের সদনে—
(হর-কোপানলে কাম যেনরে না পুড়ি)
সুন্দরী উর্ব্বশী ধনী ভেটেছিল পার্থে ;
ব্যর্থ সুররঙ্গিণীর—অব্যর্থ সন্ধান—
করেছিল সে ফাল্গুনি দ্রৌপদী-মোহন।
হেন কালে উতরিল কুসুমের চিঠি
নগেনের হাতে, পত্র দেখে কাঁপে হিয়া,
শুকাইল মুখ—পত্র পড়ে অচেতন
ঘোর ; বীরবাহু-শোকে লঙ্কাপতি যথা
উঠি পুন বিলাপিলা বহু, ক্ষীণ স্বরে ;
"একটি রতন মোরে দিয়াছিল বিধি,
তাও বুঝি ছিঁড়ে লয় কাল এ অকালে ;
বৃথায় মানবজন্ম ধরেছিনু আমি,
প্রেয়সীর আশা কভু নারিনু পূরাতে ;
ইচ্ছি, তুষানলে জুড়াই মনের জ্বালা,
—এদারুণ জ্বালা যদি পারি নিবারিতে ;
অথবা অজ্ঞাতবাসে যোগিবেশ ধরি
ফিরি দেশে দেশে দ্বাদশ বৎসর কাল !
হায় বিধি, জন্মমাত্র আঁতুড়-আগারে—
সৈন্ধব লবণ কেন দেয় নাই মুখে
ভুষ্টা ধাই ; দীন আমি অকৃতী অধম ;
দয়াময় বিভু ! ডাকি হে ডাগর ডাকে

কোথা দ্রৌপদীর লজ্জানিবারণ প্রভু!
তিতি অশ্রুনীরে; ভিজে গণ্ডস্থল; ভিজে
গোঁফ দাড়ি; ভিজে বক্ষ, কক্ষ; ভিজিল রে
কাপড় চোপড়! বহিল শোকের কালাপানি;
যথা যবে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দুর্য্যোধন
আদি শত পুত্র হলে হত, কেঁদেছিল
গান্ধারী জননী। হেন কালে সখা তার
নাম নরহরি, এক পাঠশালের পড়ো,
এবে এক আফিসের সহচর; উপনীত
হলো; জিজ্ঞাসিল "বন্ধু! বল বল
মুখশশী মেঘাবৃত কেন? মন্দাকিনী-
ধারা কেন নয়নের কোণে? কি হয়েছে?
মেরেছে কি কেউ?" উত্তরিল শ্রীনগেন্দ্র
"শুন সখে, মর্ম্ম-কথা মারে নাই কেহ—
আপনার দোষে সদা খাইতেছি মার;
স্বখাদ সলিলে পড়ে হাবুডুবু খাই—
হায় সখে! কি আর বলিব সে বারতা,
স্মরিলে সে কথা হৃদি কাঁপে গুরু গুরু—
ফুটেছে হৃদয়-বৃন্তে একটি কুসুম,
কিন্তু মরুময় হৃদে বল কত দিন
আর সে তিষ্ঠিবে? শুখাবে কুসুম এবে,
শুখাবে হৃদয়? শুখাইবে সেই সঙ্গে

বন্ধু তব ; হায় ! কোথা সে বালক-কাল—
ধূলিখেলা করিতাম যবে পথে পথে !
আন ভাই হলাহল ভখিয়া মরিব,
কিম্বা জ্বাল অগ্নিকুণ্ড পশিব তাহাতে
এ অন্তিমে বন্ধু-কায কর তুমি ভাই !”

এতেক বিলাপি বন্ধু, দিল বন্ধু-হাতে
কুসুমের পত্র। হরিহর পড়ি পত্র,
বুঝিল সকল। বলিলেন, ধীরে ধীরে,
“দেখিতেছি বিধি বাম, রন্ধ্রগত শনি।”
ক্ষণেক নিস্তব্ধ দোঁহে, কতক্ষণ পরে
কহিল নগেন্দ্রনাথ সকাতর স্বরে—
“দুটি ডিক্রী ঝুলিতেছে মস্তক-উপর
স্বর্ণকারের। ভীটা, মাটি, বাটী বাঁধা—
জানত সকলি—মাহিনার কীস্তিবন্দি।
জুতাবুরুষের কড়ি হাতে নাই মোর—
জল খাই ভাঁড়ে, নিজে রাঁধি, শুই চটে,
উনানে পাড়িয়া ফুঁক চোখে ঝাপ্‌সা দেখি
—না লিখিল মৃত্যু কেন বিধাতা ললাটে।”
উত্তরিল হরিহর—“বলি শুন, যাও
গৃহে ; বুঝাও কুসুমে—অবোধ সে নয়,
তোমাগত-প্রাণ—দুঃখে দুঃখ সুখে সুখ
তার।” বলিল নগেন্দ্র, “আশ্বাসে রেখেছি

তারে বার মাস—আজ কেমনে বলিব,
পাপী আমি—"কিছু নাই সব শূন্যাকার !"
প্রিয়া রোষিবেন যবে, কে রোধিবে তবে
সেই রোষ-গতি—কে রোধে নদীর গতি
যবে ধায় সেহ সমুদ্রের পানে দ্রুত ?
দেখিয়াছি দ্রুত ইরম্মদে ধেয়ে যেতে
আকাশের পথে ; দেখিয়াছি বাজবৌরির
গতি ; দেখিয়াছি নক্ষত্র-পতন ; কিন্তু কভু
দেখি নাই আমি (দেখে নাই কেহ কভু)
প্রিয়ার সে রোষগতি। ভাই ! ধরি দাও
দুটী টাকা, পলাই এদেশ হ'তে শীঘ্র"।
বন্ধু দিল টাকা, পলায় নগেন্দ্রনাথ,
একছুটে কাঁদিতে কাঁদিতে,—যথা যবে
মহাভারতের শেষে আশ্রমিক পর্ব্বে—
সঞ্জয় গান্ধারী আর কুন্তী ধৃতরাষ্ট্র,
সংসারের মায়া ত্যজি গিয়াছিল বনে
কলেবর পরিত্যাগ-হেতু। ফুরাইল কথা
এত দূরে। সতেজে লিখিনু ছন্দ বীরদাপে ;
পার্থিব অক্ষর কভু না করি গণনা,
মহাকবি মোরা ; আর কিছু দিন পরে
লিখিব গো ঢালা (গদ্য সম) ব্রাঙ্কভার্স—
গৌড়জন যাহে সদা যাবে গড়াগড়ি।

তত্ত্বকথা।

(১)

দত্তপুরের পালেদের বাড়ী পূজার ভারি ঘটা; ১২ মণ ময়দার বরাদ্দ; এক দল যাত্রার বায়না ৪৫০, টাকা। সেই গ্রামের নিকটবর্ত্তী নারায়ণপুরনিবাসী কৃষ্ণধন মুখুয্যেও পূজা আনিয়াছেন, কিন্তু কর্ত্তাবুড়া বড় কৃপণ, ছেলেদের ইচ্ছা একটু জাঁকজমক হয়। লোকে বলে, বুড়া, যকের ধন আগুলিয়া আছে, কার টাকা খরচ করিবে? অতি কায়ক্লেশে গোছে গাছে তিনি পূজাটি মাত্র আনিয়াছেন। নীলমণি ঠাকুর সপ্তমী পূজার দিন বেলা ১টার সময়ে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ঊর্দ্ধ-শ্বাসে দৌড়িয়া কৃষ্ণধনের বাড়ী উপস্থিত। বুড়া জিজ্ঞাসিল "কেন হে কি হয়েছে, এত হাঁপাইতেছ কেন?" নীলমণি উত্তর করিল—"মহাশয় বল্‌ব কি, বড় বিপদে পড়েছিলাম, ওষ্ঠাগতপ্রাণ হয়েছিল—আগে একটু জল দিন।" বুড়া—"দিচ্চি দিচ্চি—একটু বিশ্রাম কর, হয়েছিল কি বল দেখি?" নীলমণি—"আজ্ঞে আর একটু হলেই মারা পড়েছিনু—পালেদের বাড়ী পূজা দেখ্‌তে গেলাম, পূজা-বাড়ীতে ঢুকেই প্রাণ বা'র হবার উপক্রম হলো, লোকের কলরব, ঘিয়ের গন্ধ, দই ক্ষীরের কাদা, সন্দেশের ছড়াছড়ি, কাঙ্গালীর হুড়াহুড়ি—দেখে শুনে আমার ত্রাহি ত্রাহি ডাক উপস্থিত হলো—কি করি, বাহিরে আসিতে পারিলে বাঁচি, ভাবিলাম কোথায়

গেলে রক্ষা পাই—তাই দৌড়িয়া আপনার বাড়ী পলাইয়া আসিয়াছি। আহা! এখানে মায়ের কেমন প্রশান্তমূর্ত্তি, কোন গোলটি নাই—কি সুখেরই স্থান! মাতঃ জগদম্বে! তুমিই যথার্থ দুর্গা, তোমাকে শত শত প্রণাম।"

(২)

বড় বাড়ীর বারাণশী মিত্র খুব জাঁকজমকে পূজা আনেন। নিমন্ত্রণপত্রে সহর ছাইয়া দেন; কি ছোট, কি বড় কাহারও বলিবার যো নাই যে, তাহার পত্র আসিল না। তবে দুষ্ট লোকে শেষে কাণাকাণি করে যে, বারাণশী বাবু মাছের তেলে মাছই ভাজেন এবং অবশিষ্ট তেলটুকু গড়াইয়া বোতলে পূরিয়া রাখিয়া দেন। দেশের লোকের স্বভাব মন্দ, তাই পাঁচ জনে পাঁচ কথা কয়। কিন্তু বাবু বড় সমদর্শী লোক, সকলের উপর সমান ভাব—যে যেমন, তার উপর তেমনি দয়া। কেমন সুচারু বন্দোবস্ত! যে যেরূপ লোক, তার তেমনি সম্মান রাখেন। তাঁহার তিন রকম জল খাবার সাজান আছে—পাছে উঁচু নীচু হয় বলিয়া স্বয়ং সে বিষয়ের পরিদর্শনে নিযুক্ত আছেন। যিনি ১৬৲ টাকা কিম্বা তদধিক প্রণামী দেন, তাঁহার জন্য ফাষ্টক্লাস জল খাবার;—লুচি, তরকারি, ডাল, মেঠাই, মতিচুর, অমৃতি, রসগোল্লা, নিমকী, খাজা, গজা, বরফী, মণ্ডা, দধি, ক্ষীর ইত্যাদি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে। রৌপ্যপাত্রে জল—মখমলের আসন—গোলাপী খিলি—অম্বরী তামাক। ৮৲ টাকা কিম্বা তদধিক দিলে, সেকেণ্ড

ক্লাস ;—৮ খানি লুচি, তদুপযুক্ত তরকারি, ১টী মতিচুর, ২ খানি জিলিপি, কম্বলের আসন, বাজারে পান, ভেলসা তামাক। ১৲ টাকার অধিক দর্শনী—তৃতীয় শ্রেণীর জল খাবার ;—দুই লুচি এক পয়সা মূল্যের ৪ ক্ষুদ্র গজা, ১টী মেঠাই, তরকারি নাই, ভাঁড়ে জল, কুশাসন, খান-কতক সুপারি, একটান তামাক। বারাণশী বাবু বেশ সূক্ষ্মদর্শী—হিসাবমত, যুক্তিমত এইরূপে ন্যায়ের অনুগমন করেন ; কিন্তু অসভ্য অশিক্ষিত লোকের এমনি দশা মন্দ যে, নিমন্ত্রণ পত্রখানি পাইলেই আহারের লোভে পূজা দেখিতে যায় ; অন্ততঃ তৃতীয়শ্রেণীর দর্শনী লইয়া যাওয়া যে উচিত, তাহা একবার মনেও ভাবে না। বারাণশী বাবু কি করিবেন !—দুষ্টের দমন না হইলে দেশ রক্ষা হয় না, তাদের যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল। শুধু হাতে গেলে, শুধু মুখে ফিরিবার সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন। (N. B. শুধু হাতে অর্থে—১৲ টাকা বা তাহার কম দর্শনী)। সপ্তমী, অষ্টমী, এইভাবে অতীত হইল। নবমীর দিন, চটি-জুতা-পায়ে পিরাণ-হীন অঙ্গে একটা বিটল ব্রাহ্মণ একটি দুয়ানি প্রণামী লইয়া উপস্থিত। বারাণশী বাবু সে অভদ্রের সঙ্গে কথা কহিবেন কেন ? ব্রাহ্মণের কড়চে দুয়ানি দেখিয়াই আপনাকে নিতান্ত অবমানিত বোধ করিলেন। ব্রাহ্মণ চুপ করিয়া বসিয়া আছে,—অপরে ঝড়াঝড় টাকা ফেলিতেছে, এবং যে যে ক্লাসের লোক, তাহাকে সেইরূপ আহার দেওয়া হইতেছে। ব্রাহ্মণ

তখন কি একটা বুঝিল। উঠিয়া, গললগ্নীকৃতবাস হইয়াই ভগবতীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া সেই দুয়ানিটী মায়ের পাদ-পদ্মে ধরিয়া করুণস্বরে বলিল,—"হে! মহার্ঘ্যদরে জলখাবার বিক্রয়-কারিণি মা! গরীব ব্রাহ্মণ—বড় ক্ষুধা—যা পার মা, এই দুয়ানীর মত জল খাবার দাও"। বাবুর পারিষদবর্গ হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল—বেল্লিক ব্রাহ্মণ করে কি? পাগল নাকি? ব্রাহ্মণ উত্তর করিল—"ভাই সকল হে! পাগল নহি—বড়—ক্ষুধা—পেটের দায়! মহামায়া তোমাদের বাবুকে এত টাকা রোজগার করিয়া দিতেছেন, আমাকে কি আর দু আনার লুচি দিতে পারিবেন না?"

বড় বাবুর চিঠি।

(বিজয়ার পর।)

পূজার গোলমালে আমার দেশহিতৈষী কাবের ব্যবসাটা একটু মন্দা গিয়াছিল। অসভ্য দুর্গাপূজাকারীরা (Doorga-poojamakers) তখন পুতুলের গায়ে নশ্বর পার্থিব রং দিতেই ব্যস্ত ছিল। তাহারা তখন দেশের পানে একেবারেই চাহে নাই।—বর্ব্বর বাঙ্গালা নিতান্ত বহিয়া গিয়াছিল, মুর্খতার সহিত উন্মত্ততার যোগ হইলে, যে বিষময় ফল ফলে, তাহাই ঘটিয়াছিল। কেহ বস্তা বস্তা কাপড় কিনিতেছে, কেহ হাঁড়া হাঁড়া সন্দেস দর করিতেছে, কেহ জালা জালা দৈয়ের বায়না

দিতেছে, কেহ স্ত্রীর জন্য অলঙ্কার গড়াইতেছে। এসব কি এ ? ছি! আমি জানি, অসভ্য দেশে পুতুল পূজা থাকিবে; তা, বঙ্গদেশে দুর্গোৎসবটা যে এখনও কিছুদিন থাকিবে, তৎপক্ষে কিছু সন্দেহ নাই; তজ্জন্য তত দুঃখ করি না, কিন্তু আসল কষ্ট এই, ঐ সময় লোক গুলা এত উন্মত্তবৎ বিব্রত হয় কেন ? পুতুলপূজা করিবে, আস্তে আস্তে করুক,—নিঝুম নীরব ভাবে হিন্দুরা পূজা করুক, তাতে আপত্তি করি না। এ মোশাই, একটা ঢাক ঢোল কাঁসি বাজায়ে দেশ তোলপাড় করে তোলে—ছুটীর ক'দিন ত কাণ পাতিবার যো নাই। বিশ্রামের জন্য ছুটী। সেই বিশ্রামের বদলে যখন কেবল পরিশ্রম—কেবল ছুটাছুটি, হুড়াহুড়ি, মারামারি, তখন ছুটীর সম্মান, গৌরব, স্বার্থকতা থাকে কোথা ? কোথাও দেখিবে, সন্দেস লইয়া কেহ ভাঁটা গড়াইতেছে, কোথাও শুকো দয়ের কাদা, কোথাও, ক্ষীরের কোটালে বাণ, কোথাও কাঙ্গালি-বিদায়ের জঘন্য বিকট কলরব, কোথাও অন্নছত্রের ভাতের আসুরিক দুর্গন্ধ—এ ক্ষণভঙ্গুর প্রাণে এত কি সহা যায় ? হিন্দুরা যদি প্রতি বৎসরই এই ভাবে চলে, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের উচিত, ছুটী বন্ধ করিয়া দেওয়া। যদি গবর্ণ-মেণ্ট একান্তই ছুটী বন্ধ না করেন, তাহা হইলে অবশেষে আমি এ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে বাধ্য হইব। অতএব-সাবধান!

ছুটীর সময় এ বৃথা গোলযোগে কত দিকে ক্ষতি দেখুন।

বাজারে জিনিষপত্র হঠাৎ মহার্ঘ্য হয়। ইহাতে দেশের গরীব লোকের যে কত কষ্ট হয়, তাহা ভাবিলে আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। গরীব চাষা লোক টেক্সের দায়েই বিব্রত—তাহার উপর এই হঠাৎ মহার্ঘ্যদরে জিনিষ কিনিতে তাহারা পয়সা পাবে কোথা? আহা! তাহারা মাথার ঘাম দ্বারা তাহাদের রুটী উপার্জ্জন করে। রৌদ্র, বর্ষা, শিশির, শীত, অগ্নি, ঝড়, সর্প, ব্যাঘ্র, না মানিয়া তাহারা সুবৃহৎ ধানবৃক্ষ তৈয়ারি করে। শেষে ধান গাছে উঠিয়া ধানফল পাড়িতে তাহাদিগকে কত কর্ম্মভোগই না করিতে হয়! হায়! সে সব কথা স্মরণ করিলেই আমার বুক ফাটিয়া যায়! হায়! আমি চাষাকুলের কবে উদ্ধার করিতে সক্ষম হইব? হা ঈশ্বর! এমন দিন কি আসিবে না, যবে চাষালোককে আর প্রত্যহ মাঠে এক হাঁটু কাদা ঘাটিতে হইবে না, প্রত্যহ মাঠে ভিজিতে হইবে না,—এমন কি তাহাদিগকে সেই ভয়ঙ্কর ধানবৃক্ষের তলায় একবারও যাইতে হইবে না। কবে তাহা-দের পায়ে বিলাতী বুট দেখিব, গায়ে বিলাতী দরজীর তৈয়ারি বিলাতী কাপড়ের বিলাতী কোট দেখিব, মাথায় বিলাতী ছাতা দেখিব, মুখে বিলাতী চুরট দেখিব, শিরে শোলার বিলাতী হ্যাট্ দেখিব, গলায় বিলাতী গলবন্ধ দেখিব, হাতে বিলাতী কেতাব দেখিব? চাষা এবং বিধবা আমার এ জীবনের প্রধান লক্ষ্য! কুসংস্কারাপন্ন হিন্দু কি এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বিধবাকে মাছ খাইতে দিবে না? কি কুটিল স্বার্থপরতা

দেখ দেখি? মাছ বা মাংস অঙ্গের যে পূর্ণতা সাধন করে, তাহা কি তাহারা বুঝে না? গরীব বিধবা পতি-ধন হারাই-য়াছে বলিয়া কি সে মাছ-ধনও হারাইবে?

এ বঙ্গে কি কোন সামাজিক-ম্যাট্সিনি নাই? যদি থাকেন, তিনি আমার কাছে আসিয়া হাত বাড়াইয়া দিন, আমি তাঁহার সহিত "সেকেণ্ড" করিব্। হায় হায়! কি দুঃখ! বিধবার পায়ে আল্তা নাই, গজেন্দ্রগমনে চলিয়া যাইবার সময় তাঁহার পায়ের চারি গাছা মল ঝম্ ঝম্ বাজে না; শান্তিপুরে নীলাম্বরী মিহি কাপড়ও তিনি পরিতে পান না—সেই মোটা গোধড় থান কেবল কোমলা-ঙ্গের কষ্টদায়ক! আমি একলা—চারি দিকে লক্ষ লক্ষ বিধবা ক'জনকে উদ্ধার করিতে সক্ষম হইব? তাই কেবল কাঁদি।

কি কথা বলিতে বলিতে, কি কথা আসিয়া পড়িয়াছে। মনের আবেগ এমনি! দ্বিতীয় ক্ষতি—বাণিজ্যের। পূজার সময় হঠাৎ বাজার মহার্ঘ্য হওয়ায় সমগ্র সওদাগরবৃন্দের ক্ষতি। এ কথা প্রমাণের জন্য অধিক দূর যাইতে হইবে না। কামস্কট্কা, জুলুদেশ, টিম্বক্টু, থার্ড্রুম এবং আইসলণ্ড—এই পাঁচ স্থানের পাঁচ জন প্রধান পণ্ডিত একমতাবলম্বী হইয়া বলিয়াছেন, "হঠাৎ জিনিষ মহার্ঘ্য হইলেই ব্যবসার ক্ষতি।" সুতরাং এ কথার প্রতিবাদ নাই। ভারতে এরূপ দুঃসাহসী ব্যক্তি কেই বা আছে, যিনি ঐ পণ্ডিতমণ্ডলীর মত খণ্ডন করিয়া

ঔদ্ধত্য দেখাতে পারেন? অতএব নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণীকৃত হইল, ব্যবসার ক্ষতি।

তৃতীয় ক্ষতিটা বড়ই গুরুতর। সকলে প্রণিধানপূর্ব্বক শ্রবণ করুন, নচেৎ ঐ গভীর তত্ত্ব বুঝা বড়ই কঠিন হইবে। ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হিন্দুসন্তান, পূজার সময়, বুড়ো মা বাপ, যুবতী ভগিনী ও ভ্রাতৃজায়া প্রভৃতির জন্য অম্লানবদনে বস্ত্রাদি খরিদ করে! কিন্তু ইহাতে যে স্বাবলম্বন বৃত্তির মূলে কুঠারাঘাত করা হয়, তাহা একবার সে ভুলেও ভাবে না। এই কুরীতি প্রচলিত থাকার দরুণই, ভারত আজ পর-পদানত। আমি রোজগার করিব, অপরে বসিয়া খাইবে, আমার মুখটী পানে চাহিয়া আলস্যে কাল কাটাইবে—বঙ্গের এ জঘন্য প্রথার প্রশ্রয় দেওয়া নিতান্ত গর্হিত। মাতাই হউন, আর পিতাই হউন,—কেহ যে পর-প্রত্যাশী হইয়া জীবন যাপন করিবেন; ইহা আমি অনুমোদন করিতে পারি না। মা বুড়া হইয়াছে, বেশ কথা! খাটিবার শক্তি নাই, আরও উত্তম! সে বোসে বোসে কার্পেটের কায করুক্। যদি বল, মায়ের চোখে চাল্সে ধরিয়াছে, ছানি পড়িবার উপক্রম হইয়াছে, আচ্ছা, তাতে ক্ষতি নাই,—সে চস্‌মা ধরুক্। সলমন-কোম্পানীর বাড়ী থেকে আমি তাকে চস্‌মা কিনে দিতে রাজী আছি, কার্পেটের কাযের জন্য, উপযুক্ত জামীন লইয়া, মূলধন দিতেও অনিচ্ছুক নহি, কিন্তু সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে একটী পয়সাও দিতে পারি না। এরূপ দানে লোকের মনে

ভিক্ষা বৃত্তির লালসা বলবতী হয়! ভিক্ষুক তৃণ অপেক্ষাও লঘু। বাঙ্গালী ক্রমশ এরূপ লঘু হইয়া পড়িলে, দেশ-উদ্ধার কে করিবে? কিন্তু এদিকে দেখ, মা কার্পেটের কায আরম্ভ করিল, মাসে দু-জোড়া করিয়া জুতা বুনিতে লাগিল, মহাজনের টাকার সুদ দিয়া পশমের দাম বাদে মাসে আড়াই টাকা স্বয়ং তাহার রোজগার হইল!—ইহাতে তার কত সুখ ভাব দেখি? মা যখন আপন পরিশ্রমলব্ধ ধনে নিজ রুটী তৈয়ারি করিবে,—তখন তাহার চক্ষু দিয়া কি আনন্দাশ্রু দরদরিতধারে বহির্গত হইবে না? সে রুটী তাহার তখন কত মিষ্ট লাগিবে! বিশেষ, পরিশ্রম ব্যতীত ক্ষুধা হয় না; অক্ষুধায় খাইলে হজম হয় না! হজম না হইলে পেটের অসুখ হয়; পেটের অসুখ হইলে, গৃহস্থের কষ্ট, প্রতিবেশীর কষ্ট, মিউনিসিপালিটীর কষ্ট,—আর নারীজাতি বৃদ্ধ বয়সে পেট-পীড়াগ্রস্তা হইলে নিশ্চয়ই দীর্ঘজীবিনী হয় না। সুতরাং মায়ের আসন্ন-মৃত্যু; আমি উপযুক্ত সন্তান; কেমন করিয়া জীবিত মাকে মৃত্যুপথে পাঠাই বল দেখি? মা কার্পেটের কাযের কারখানা খুলুক, ঐকান্তিক মনে জুতা বুনুক,—ইহাতে আহার ঔষধ দুই হইবে—পরিশ্রমজনিত ক্ষুধার উপর স্বোপার্জ্জিত ধনলব্ধ সুমিষ্ট রুটী পড়িলে, তাহা একেবারে গলিয়া দ্রব হইয়া যাইবে, মায়েরও শরীরের পুষ্টি-সাধন হইবে। এ দেশের হিন্দুরা এ সব কথা বড় বুঝে না, গভীর দার্শনিকতত্ত্ব মোটেই চিন্তা করিতে তাহারা

অক্ষম। তাহারা মা বাপকে আলস্যে কাল কাটাইতে দেখিলেই বড় সুখী হয়,—মা বাপ পায়ের উপর পা দিয়ে বসে থাক্‌বেন, আর আমি রোজগার করে আহার যোগাইব, পরিধেয় বস্ত্র যোগাইব? ছি! স্বাবলম্বন বৃত্তিটা কি দেশ থেকে একেবারে উঠে যাবে? দেশ কি মাটি হবে? এ ঘোর দুর্দ্দশা আমি কখনই চক্ষে দেখিতে পারিব না। আমাদের ইংলণ্ডে, ইংরেজ-বাপ, ইংরেজ-মা, কি ভাবে চলেন, একবার স্থিরচিত্তে ভাব দেখি? সন্তানের চাকুরী স্থানে, ইংরেজ-মা-বাপ উপস্থিত হইলেন, দু দিন বেশ আমোদ আহ্লাদে কাটাইলেন,—প্রত্যাগমনের সময় উপস্থিত। পুত্র তৎক্ষণাৎ মা বাপের আহারের দরুণ একখানি বিল পিতার সম্মুখে ধরিল। পিতাও বেশ উপযুক্ত। তিনি হিসাবে ভুল আছে কি না, ইহা অঙ্ক পাতিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলেন। যেমন হিসাবের গোল মিটিল, অমনি তৎক্ষণাৎ একখানি চেক্ কাটিয়া দিয়া পিতা আহারীয়-দেনা পরিশোধ করিলেন। আহা! কেমন সুবন্দোবস্ত! কেহ কাহারও মুখাপেক্ষী নহে। স্বাবলম্বন বৃত্তির কি অপূর্ব্ব মহিমা! আর এই যত আপদ্, এই পোড়া দেশে! কোথাও কিছু নাই, এই পুতুল পূজার সময় হঠাৎ আমি মা-বাপকে কাপড় দিব কেন? তারা পারে, আপনারা রোজগার করিয়া কাপড় কিনুক। আমি তাহাদের চির-আলস্যের প্রশ্রয় দিবার জন্য কাপড় কিনিয়া দিব কেন? যে স্বাবলম্বন বৃত্তির জোরে ইংরেজ আজ পৃথিবীর রাজা হইয়া-

ছেন, সেই বৃত্তির মূল-শিকড়ে আমি কি আজ কুঠারাঘাত করিব? তবে হাঁ, আমি নিজ-নারীকে সমস্তই দিতে বাধ্য। স্ত্রীকে উত্তম উত্তম কারুকার্য্যসুশোভিত পরিধেয়বস্ত্র, নানাবিধ গন্ধদ্রব্য এবং সুস্বাদু সারগর্ভ আহার্য্য বস্তু, এ সমস্তই ভূত-কালে দিয়াছি, বর্ত্তমানে দিতেছি এবং ভবিষ্যতে দিব। কারণ বিবাহের ইহাই চুক্তি। আমি এ চুক্তি ভঙ্গ করিলে স্ত্রীও বিবাহের চুক্তি ভঙ্গ করিতে পারেন। চুক্তির আইনের নিয়ম এই, কোন চুক্তি স্বেচ্ছায় আংশিক ভঙ্গ করিলে, তাহা সম্পূর্ণ ভগ্ন হইয়া যায়। অতএব পুরুষজাতিকে স্ত্রী জাতির সহিত ব্যবহারে বড়ই সাবধানে চলিতে হয়। সেই জন্যই শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন, স্ত্রীর বাক্যই বেদ। স্ত্রীর বাক্য বেদবৎ না মানিলে পদে পদে বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা। আমার পূজনীয়া শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে; সুশীলা, সুবোধা, সুন্দরী শ্যালিকাগণকে আশ্বিন মাসে বহুমূল্যের বস্ত্রাদি ও প্রচুর মিষ্টান্ন প্রদান করি বটে, কিন্তু তাহা স্ত্রীর সৎপরামর্শে। ইহার জন্য আমি দায়ী নহি। স্ত্রীর বাক্য-লঙ্ঘন আইনে নিষিদ্ধ। সুতরাং আইনে বাধ্য হইয়া আমাকে এ কায করিতে হয়। সেই অর্দ্ধাঙ্গিনী প্রণয়িনী আমার মা-বাপের কাপড় দিতে অনুমতি করুন, আমি এখনি দিব। ইহার যদি কখনও প্রতিবাদ করি, তবে আমার দোষ দিও।

চতুর্থ ক্ষতি বড়ই বিষম। দুধ, অসভ্য হিন্দুর হাতে পড়িয়া মাটি হয়। ছানা দুধের বিকার। কোন গুণ নাই, অসার!

সেই ছানায় কতগুলা চিনি ফেলে হিন্দুরা মিঠাই তৈয়ারি করে। পূজার সময় সেই মিঠাইয়ের ছড়াছড়ি হয়। কেবল পয়সা নষ্ট এবং উদরের কষ্টদায়ক। আরও দেখ, দুধে ছানা তৈয়ারি হওয়ায় দুধের দাম চড়িয়া যায়। চায়ের জন্য দুধ কেবল মাত্র উপযোগী। দুধ মহার্ঘ্য হওয়ায়, জনসাধারণ আর চা দিয়া দুধ খাইতে পায় না। ইহাতে ভারতীয় চাষা-লোকের উন্নতি, না অবনতি? আচ্ছা, একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, মিঠাই খাইতে পয়সা খরচ হয়, সেই ব্যয়ে পূজার সময় কট্‌লেট, কারি, চপ খাইতে ক্ষতি কি? ফাউল অতি উপাদেয় জীব—কেবল মুর্খতার দরুণ, হে হিন্দু! তাহাতে বঞ্চিত হও কেন? বিশেষ তোমরা এখন ম্যালেরিয়াগ্রস্ত, অতি দুর্ব্বল, পূজার তিন দিন ঢালাও চিকেন-ব্রথ খাওনা কেন? কুসংস্কারে পড়িয়া হরিনাম কর, আপত্তি নাই, কিন্তু চিকেন-ব্রথ না খাইলে হরিনাম করিবে কার জোরে? কেবল চিনির ডেলা মিঠাই খাইলে যে ডাইবিটিস্‌ হইবে,—এ ভাবনা কি একবারও ভাব না? সম্মুখে সর্ব্বনাশ উপস্থিত দেখ। আমি একলা, তোমাদিগকে কত বুঝাইব!

হায়! দেখিলাম, দেখাইলাম, বুঝিলাম, বুঝাইলাম, বাঙ্গালীর দুর্গোৎসবটা অতি বদ জিনিষ। পুতুল পূজা করুক, কাপড় কিনুক, ছানা চিনি খাউক, এ সবে তত আপত্তি করিতাম না, যদি পূজাবকাশে বাঙ্গালী একটু সুস্থির হয়ে আমার দেশ-ভক্তির বক্তৃতা শুনিত! কিন্তু অধঃপতনশীল বাঙ্গালী তা

শুনিল কৈ ? মনে করিলাম, বাঙ্গালা দেশ ছাড়িয়া এ সময় উত্তর-পশ্চিমে যাই, তথায় আমার কাযের বিশেষ সুবিধা হইবে। পোর্টমেণ্ট পর্য্যন্ত বাঁধিয়াছিলাম, এমন সময় বিধি বাদ সাধিল। এলাহাবাদ হইতে তারে সংবাদ আসিল, এখানে মহরম উপস্থিত—এখন কিছু এখানে সুবিধা হবে না, আসিও না। লাহোর হইতে সংবাদ পাইলাম, এখানে হিন্দু-মুসলমানে ভয়ানক দাঙ্গা—এবার এলেই মার খেতে হবে। দেখে শুনে আমার হৃদয় দমিয়া গেল। এ দিকে দুর্গোৎসব, ও দিকে মহরম, আমি যাই কোথা ? আমার চলে কিসে ? ব্যবসা যে বন্দ হয়! আমার ডাক ছেড়ে কান্না পাইতেছে! অগো তোমরা কেউ আমাকে কিছু উপায় বলে দিবে গো ?

গহনা-রহস্য।

সুমুখীর নারী-জন্মটা বৃথা গেল! স্বামী অলঙ্কার ত দিতে পারে না। স্বামী কাছারী থেকে এসে শুধু "প্রিয়ে!" সম্বোধন করিলে ত দুঃখ ঘুচে না। বোসেদের বাড়ী বিবাহ উপস্থিত, বোসেদের গিন্নি তাঁহাকে আনিবার জন্য দুই দফা পাল্কী পাঠাইলেন—কিন্তু স্বামী এমনি অবুঝ অকর্ম্মণ্য, নিষ্ঠুর যে, ১২ ঘণ্টার মধ্যে গহনা গড়াইয়া আনাইয়া দিতে পারিল না। সুমুখীর আজ দুঃখের অবধি নাই, দুঃখের এক বারে প্যাসেফিক্ ওসেন, ধূ ধূ একাকার, কূল-কিনারা নাই। গহনা

অভাবে সইয়ের বাড়ী নিমন্ত্রণ রাখিতে যাইতে পারিলেন না,—এই হৃদয়-কুসুমশোষী দারুণ দুর্ভর দুঃখে সুমুখীর নয়নকোণ হইতে বিন্দু বিন্দু বারিধারা উভয় গণ্ডে পতিত—যেন প্রফুল্লিত পঙ্কজে শিশিরবিন্দু, মরি, মরি!

নিদয় বিধাতা কেন রে তাহারে,
ভারতে পাঠালে রমণী করে রে!

এ যন্ত্রণা শূল-ব্যাধির গুরুতর যন্ত্রণা হইতেও গুরুতর! সুমুখীর ঢের সহ্য গুণ—তাই সুমুখী এখনও দাঁড়াইয়া আছেন, নচেৎ গলদেশে রজ্জু বাঁধিয়া এতক্ষণ জীবাত্মাকে পাপ-দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতেন।

সুমুখীর স্বামীর নাম ভজহরি—তিনি নব্য-বঙ্গ, এম এ, বি, এল—উকীল।

ঐ অনারারি পদে তিনি আজ কিছু কম এক বৎসর প্রতিষ্ঠিত। ভজহরি এ দিকে ছেলে ভাল; কিন্তু এত লেখাপড়া শিখিয়াও যে তাহার কথার ঠিক থাকে না, ইহাই বড় পরিতাপের বিষয়। যখন তিনি বি-এ, ক্লাশে পড়েন, তখন অবধি সুমুখীকে লোভ দেখাইতেন যে, বি, এ, পাস করিতে পারিলেই গহনা দিব। বি এর পর, এম, এ—তখনও কিছু সুবিধা হইল না। তথাচ সেই মিথ্যাবাদী পুরুষ সরলা রমণীকে লোভ দেখাইতে ছাড়ে না—সুমুখীকে বলিলেন—"প্রিয়ে! নিশ্চয় বলিতেছি, যে দিন উকীল হইব, তার পর দিন এক স্যুট গহনা দিব"। তার পর কালক্রমে উকীল হইলেন,

সুমুখীর আশা-পথ বিকসিত হইয়া উঠিল। ভজহরি বাবু প্রথমে যে দিন বাহালি পরয়াণা হাতে করিয়া শাম্‌লা আঁটিয়া কাছারী যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, তাঁহারই কথামত সেই দিন সুমুখী এক খানি গহনার ফর্দ্দ তাঁহার হাতে দিলেন। স্বামী হৃষ্টচিত্তে স্ত্রীর হাত হইতে গহনার ফর্দ্দ গ্রহণ করিলেন। স্ত্রী তখন আহ্লাদে ডগমগ হইয়া স্বামীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। কিন্তু এ ঘটনার পর এক বৎসর অতীত হইতে চলিল, ভজহরি এমনি পাষণ্ড, গহনা দূরে যাউক, ফর্দ্দখানি পর্য্যন্ত ফেলিয়া দিয়াছেন। (বলেন হারাইয়া গিয়াছে) ছি! ভজহরি! এই কি তোমার ধর্ম্ম? তার পর সুমুখীর সইয়ের কন্যার বিবাহ স্থির হইল;—ভজহরি ফের বলিলেন,—বিবাহের পূর্ব্বে চিক্, চুড়ি, মাথার ফুল—এই তিনটি নূতন গহনা দিবই দিব। আজ সেই বিবাহের দিন। এখনও গহনা পান নাই। সুমুখী কি স্বামীর নামে, ফৌজদারী আদালতে বঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতার জন্য অভিযোগ করিতে পারেন না? আর মনঃকষ্টের ও মানহানির ক্ষতিপূরণের জন্য দেওয়ানি আদালতে আর এক নম্বর নালিস করিতে পারেন না?

সন্ধ্যা উপস্থিত হইয়াছে; সুমুখী গহনা পান নাই, নিমন্ত্রণ রাখিতে যাইতে পারেন নাই; কিন্তু সইয়ের মেয়ের বিবাহে না গেলেও নহে—কি করিয়াই বা যান, নূতন গহনা নাই—সব পুরাতন,—তাঁহার সেই বিবাহ-কালের গহনা।

মহাবিপদ! তবে এখনও এক আশা আছে; স্বামী অদ্য কাছারী না গিয়া গহনার অন্বেষণে বাহির হইয়াছেন।

ওদিকে ভজহরির আজ দশ দিন উদরে অন্ন নাই—মুখ পাণ্ডুবর্ণ, কাছারী যান নাম মাত্র; বেচারা মারা পড়িবার উপ-ক্রম হইল—ঘরের অবস্থা যেরূপ শোচনীয়, কাছারীর অবস্থাও তদ্রূপ। যাহা হউক, সেইদিন কি উপায়ে মাতৃ-পিতৃদায় অপেক্ষা গুরুতর—এ পত্নীদায় হইতে উদ্ধার পাইবেন, ভাবিয়া অস্থির হইতে লাগিলেন। ঠিক করিলেন, বাস্তভিটা বন্ধক দিলে একার্য্য যদি উদ্ধার হয়, তাহাতে ক্ষতি কি? কিন্তু কেমন কপালের দোষ, তথাচ কোথাও টাকার যোগাড় হইল না। ক্রমে রাত্রি হইয়া আসিল, কিন্তু তিনি ঘরে আসিতে পারেন না, বাড়ীর দিকে আর পা উঠে না—গহনা বিনা কি বলিয়া ঘরে ঢুকিবেন, ভাবিলেন,—আর ঘরে যাইব না, বিবাগী হইব—এই বলিয়া আদালতের নিকটবর্ত্তী বাঁধা ঘাটের চাঁদনীতে বসিলেন।

এখন স্ত্রীর মন বড় চঞ্চল হইয়াছে, স্বামী কখন্ আসেন কখন্ আসেন, এই চিন্তায় পথপানে চাহিয়া আছেন, কিন্তু রাত্রি ৮টা বাজিল, তখনও স্বামীর দেখা নাই। ক্রমশঃ বুঝিতে পারিলেন, স্বামীর সকলই জুয়াচুরি, তখন সুমুখী উন্নতফণা সর্পিণীর ন্যায় বিষম গর্জ্জাইতে লাগিলেন।

এখানে ভজহরি বাবুর মহা ভজকট—এ রাত্রে কোথায়ই বা যাই, একে অসুস্থ শরীর, মাথার ব্যারাম উপস্থিত—তাহার

উপর আজ কয়েক দিন অনাহার। আজ ঘরে যাই, দু এক দিনের মধ্যে সুবিধা করিয়া স্থানান্তরে নিশ্চয় যাইব। তখন সেই সংসার-তরীর গুণটানা-মাঝি ভজহরি বাবু গুটি গুটি গৃহাভিমুখে চলিতে লাগিলেন এবং শুষ্কমুখে সুমুখীর কাছে উপস্থিত হইলেন। সুমুখী মুখ দেখিয়াই বুঝিলেন, গহনা আইসে নাই। তখন বলিলেন, আমার মরণই ভাল, মনুষ্য-জন্ম জন্মে লোক-লৌকিতা কিছুই হলো না, পোড়া-পেটে কেবল খেলে কি হবে—সেখানে দশ বাড়ীর মেয়ে একত্র হয়েছে, আমি কেবল যেতে পারিলাম না—নেহাতই কাঙ্গালের ঘরের মেয়ে নই ত, আমার মরণই ভাল। চুপ করে রহিলে কেন—গহনা এনে থাক ত বল।

ভজহরি তখনও নিস্তব্ধ, নিস্পন্দ ও অসাড় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। স্ত্রী তখন একটু তর্জ্জন করিয়া বলিলেন "ওকি? চুপ করে থেকে কি হচ্চে? গহনা না এনে থাক, তাই বল, বুঝি।" ভজহরি অতি ধীরে ধীরে বলিলেন—"আমাকে আর তুমি কিছু বলো না—কেবল ঐ চাকু ছুরী খানিকে আমার গলায় দাও, আমি সকল জ্বালা এড়াই।" স্ত্রী তখন গলা পঞ্চমে চড়াইয়াছিলেন; এককালে যেন পঞ্চাশ খানি কাঁসোর বাজিয়া উঠিল, বলিলেন—"আমি এখনি গলায় দড়ি দিয়া মরিব, ঐ ছুরী আগে আমার গলায় দিব—আমি মর্‌বো মর্‌বো মর্‌বো, এত অপমান লাঞ্ছনা—ধন্যি আমি, তাই এখন বেঁচে আছি—আমার অদৃষ্টে এই ছিল।"

শব্দ শুনিয়া প্রতিবেশিগণ ভাবিতে লাগিল, ভজহরির বাড়ীতে ডাকাত পড়িয়াছে নাকি? তখন ভজহরি অতি কাতর হইয়া জোড়-হাতে বলিলেন—"তুমি আমায় এ যাত্রা ক্ষমা কর, একটু আস্তে কথা কও, লোকে শুনিলে বলিবে কি?"—জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত উথলিয়া পড়িল। কাল-ভৈরবরূপিণী সুমুখী যেন জগৎ গ্রাস করিতে উদ্যত হইলেন। তখন ভজহরি দ্রুত-বেগে ঊর্দ্ধশ্বাসে বাটী হইতে পলায়ন করিলেন।

রমণীর মর্ম্মকথা।

সভ্য-পুরুষমণ্ডলীর মাঝে, একটা হাহাকার উঠিয়াছে, স্ত্রীলোক বড় অলঙ্কার-প্রিয়। গহনার দেহি দেহি ডাকে পুরুষের কাণ গেল, মান গেল, প্রাণ গেল। যেন পাপিনী রমণী ভৈরবী সাজিয়া গহনার জন্য, ভাল মানুষের ছেলের চক্ষে সদাই ত্রিশূল বিদ্ধ করিতেছে! অনেক পুরুষের বিশ্বাস, বুঝি রমণীকুলের এই পাপেই আকাশে জল নাই, গরুর বাঁটে দুধ নাই, গাছে আম নাই; বুঝি এই পাপেই ইলবার্ট-বিল পাশ হইল না, লালমোহনের বিলাত যাওয়ার ফল ফলিল না, কলপে পাকা চুল কালো হইল না, পাউডারে শ্যাম অঙ্গ সুন্দর হইল না। এ অমঙ্গলের আকর নারীজাতিটা দেশ থেকে উঠিয়া না গেলে দেশের আর শ্রেয়ঃ নাই।

রমণী চিরকালই পুরুষের দাসী; যেন স্বামিসেরা করিতে

করিতেই সহধর্ম্মিণীর শরীর ক্ষয় হয়, যেন পতির চরণপ্রান্তে মাথা রাখিয়া স্ত্রী ইহসংসার ত্যাগ করে; ভগবান্ আমাদের অদৃষ্টে ইহাই করুন। ইহাই আমাদের ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ। তোমরা বলবান্ পুরুষ—রমণীর আশ্রয়—পঙ্কজের ভাস্কর—কুমুদিনীর চন্দ্র—তোমাদের কি ধর্ম্ম তা জানিনা। তবে এই মাত্র বুঝিয়াছি, স্ত্রীলোককে গালি দেওয়া তোমাদের একটা ধর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছে। এ নবধর্ম্ম তোমাদেরই বজায় থাক্, আমরা তাহার অংশভাগিনী হইতে চাহি না, তবে পতিব্রতা সতীসাধ্বী গৃহিণীগণকে বৃথা গালি দিলে, গৃহের পাছে অমঙ্গল হয়, ইহাতেই অন্তর কাঁদিয়া উঠে।

আমরা গহনা চাই বটে, গহনার জন্য কখন কখন বিরক্তও করি বটে, কিন্তু সে গহনা লইয়া কি আমাদের স্বর্গদ্বারের সিঁড়ি প্রস্তুত হয়? পিতার ভরণ-পোষণের জন্য তাহা কি বাপের বাড়ী পাঠাই? না; নিজের সোণার চন্দ্রহার ভাঙ্গিয়া ভেয়ের গলার হার গড়াইয়া দিই? যাহা দাও, সবই ত তোমার থাকে?

আমরা কেবল ভাণ্ডারী; যত্ন করিয়া রাখি, ধূলা ঝাড়ি, বাক্স সাজাই; আর অসময়ে আবশ্যক হইলে তোমার ধন তোমাকেই দিই। তবে অপরাধের মধ্যে আমরা বিনা মাহিনার ভাণ্ডারী-কেবল চরণধূলার ভিখারী। আমরা বুঝি, গহনা পরিলে স্ত্রীলোক চতুর্ভুজ হয় না, রং ফরসা হয় না, শশধর-লাঞ্ছন হয় না, গমন গজেন্দ্রকে লজ্জা দেয় না; আমরা বুঝি—

গহনা হলোয়ের বটিকা নহে যে, ইহাতে শরীরের সর্ব্বরোগ সভয়ে পলায়ন করিবে, গাজীপুরী গোলাপ-জল নহে যে, মস্তিষ্ক শীতল থাকিবে; বড়বাজারের রাতাবি সন্দেস নহে যে, সরস-রসনা তৃপ্তি লাভ করিবে,—এত বুঝি, তবুও গহনা গহনা করি, কেন?—গহনা অসময়ের সম্পত্তি, দুর্ভিক্ষের অন্ন, দেন-ডিক্রীর নগদ টাকা; যখন তুমি কন্যাদায়গ্রস্ত, পণের টাকা জুটাইতে পার না, তখন কে গহনা বন্ধক দিয়া টাকার সঙ্কুলান করে? যখন ছেলেটীর ডিপজীটের টাকা অভাবে এন্‌ট্রেন্স-পরীক্ষা দেওয়া হয় না, তখন কে পায়ের মল বাঁধা দিয়া দশ টাকা ধার আনিয়া দেয়? তখন তোমার পিতৃ-শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তুমি বলিয়াছিলে, "প্রিয়ে! পাঁচশত ব্রাহ্মণ ভোজন না করাইলে আমার মান-সম্ভ্রম বজায় থাকে না, আমার হাতে একটি পয়সা নাই,—কি উপায় করি বল দেখি?" তখন কে দ্বিরুক্তি না করিয়া অমনি হাতের কঙ্কণ, গলার সাতনর, কাঁকালের চন্দ্রহার খুলিয়া দিল? স্ত্রীলোক রাক্ষসী নহে যে, গহনা লইয়া গিলিয়া ফেলে, পরী নহে যে, গহনা লইয়া উড়িয়া পলায়;—তোমাদের প্রদত্ত ধন, তোমাদেরই থাকে,—তাহার জন্য এত গঞ্জনা, লাঞ্ছনা অবমাননা কেন?

আর একটা কথা বলি। একথা বলিবার নহে—মুখে আনিলে, হৃদয়ে ভাবিলেও পাপ আছে—তবে তোমরা নাকি দারুণ স্বার্থ-অন্ধ, চোখে আঙ্গুল দিয়া না বুঝাইলে বুঝ না, তাই এ পাপিনীকে পাপ-কথা পাপ-মুখে বলিতে হইল। বল দেখি,

আমরা যে তোমার আজীবন দাসীগিরি করি, তাহার কি কোন পুরস্কার নাই? তুমি প্রিয়তম, নয়টার সময়ে আফিসে যাইবে, আমি প্রাতে উঠিয়া পাঁচ ব্যঞ্জন ভাত প্রস্তুত করিয়া দিলাম; তুমি বৈকালে আসিয়া জল খাইবে, আমি লুচি মোহনভোগ করিয়া রাখিলাম; তোমার একটু সর্দ্দি করিয়াছে, আমি সারানিশি জাগিয়া তোমার পদতলে ফোমেণ্ট করিলাম; তুমি শীতে নিশীথে গরম জল না হইলে আঁচাইতে পার না, আমি গরম জলের ঘটী হাতে করিয়া তোমার সম্মুখে ধরিলাম। বল দেখি, কে এমন শরীর রক্ষা করিয়া হৃদয় প্রাণ সঁপিয়া তোমার মন বুঝিয়া, আজীবন এরূপ দাসীগিরি করিতে পারে? এ দাসীর যদি দুই টাকা করিয়াও মাসিক মাহিনা ধর, তবে পঞ্চাশ বৎসরে মায় সুদ অন্তত দেড় হাজার টাকা হইবে। তাই বলিতে হয়, খান কতক গহনা দিয়া এত খোঁটা দাও কেন? দিতে পারিবে না, অক্ষম—তাহাই স্বীকার কর;—স্বীকার করিতে লজ্জা হয়, চুপ করিয়া থাক; দিব না—অথচ চক্ষু রাঙ্গাইব, পুরুষ জাতির ইহা কেমন নীতি—এ অধমা নারী, তাহা ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

কিন্তু পুরুষ-সিংহের ঐ সুগভীর গর্জ্জন শুন—“কি বলিলি নুনখায়িনী, অকৃতজ্ঞা,—আমার ঘরে থেকে আমার খেয়ে,—আমারই নিন্দা? রমণীর জন্য পুরুষ কত কষ্ট না সহিতেছে? প্রতি রবিবারে সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া স্ত্রীকে লেখা-পড়া শেখায় কে? রমণীকুলের জ্ঞানোদয়ের জন্য চেষ্টা করে কে?

বোধোদয় পড়াও বটে, কিন্তু কেন, স্বার্থ কার? তুমি প্রাণপতি বিদেশে থাকিবে আর আমি প্রত্যহ ডেলি নিউস চালাইব'—"হে প্রাণেশ্বর, হে প্রাণবল্লভ, হে জীবন-আকাশের এক মাত্র চাঁদ, হে হৃদয়সমুদ্রের একমাত্র উচ্চৈঃশ্রবা, হে পক্ষীর মধ্যে গরুড়, হে অট্টালিকার মধ্যে মনুমেণ্ট, হে রামসেনা মধ্যে অঞ্জনানন্দবর্দ্ধন! একবার অধিনীর উপর করুণ কটাক্ষপাত কর হে!"—তুমি বিদেশে বসিয়া এই সব পড়িয়া খুসী হইবে, আর মনে মনে বলিবে, "বাহবা কি বাহবা,—এমন শিক্ষিতা পতিব্রতা কুরঙ্গনয়নী আমি কথন চক্ষে দেখি নাই।" এই জন্যই ত বোধোদয় পড়াও—না আর কি আছে?

কোন কোন ভাবুক পুরুষ, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলেন, "হায় হায়! কি ছিল, কি হইল! রমণীকুলের দশা কেন এমন হইল? যাঁহারা গৃহদেবতা ছিলেন, তাঁহারা এখন অপ্সরা হইয়াছেন, কল্যাণী রঙ্গিনী হইয়াছেন, গৃহের স্তম্ভ, দেয়ালের পেণ্টিং হইয়াছেন, সহধর্ম্মিণী খ্যাম্‌টাওয়ালী হইয়াছেন। আমরাত মন্দই—চির অপরাধ-ময়ী! কিন্তু তোমরা কি ছিলে, কি হইয়াছ ভাব দেখি? সে সোণার সংসার আর নাই, এখন ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই—অধিক কি, পিতা পুত্র একত্র থাকিতে চাহে না—মাতা বাপের পরিবার হইয়াছে। তখন এক ভাই বিদেশে চাকুরি করিত অপর ভাই গৃহে চাষবাসে মন দিত, পিতা গৃহের ব্যবস্থাকর্ত্তা ছিলেন। এরূপ একত্র এক অন্নে থাকিয়া ক্রিয়াকলাপ, দোল, দুর্গোৎসব, শিবমন্দির-

প্রতিষ্ঠা, পুষ্করিণী-খনন, একটু অধিক সঞ্চয় হইলে অতিথি-শালা-স্থাপন বঙ্গীয় গৃহস্থ-গৃহে এ সকল সদনুষ্ঠানের সূত্রপাত হইত। এখন যেন পক্ষীর জাত হইতেছে, ডানা বাহির হইলেই উড়িয়া পলাও, আর বুলি ধর "আমি কার কে আমার কারে ভাবি রে আপন।" তখন সুব্রাহ্মণ আনাইয়া কথকতা দিয়া গৃহ পবিত্র করিতে, আবাল বৃদ্ধ বনিতা, উচ্চ, নীচ, পণ্ডিত, মূর্খ সকলে মুগ্ধ হইয়া প্রাণ ভরিয়া সে হরিগুণ গান, সে সুধাময় সঙ্গীত শ্রবণ করিত; এখন সেই পবিত্র বঙ্গ-গৃহে বারবিলাসিনীর বিভৎস নাচ না দেখিলে, থ্যাম্‌টেশ্বরীর "বসন্তে ফুট্‌লে কুসুম ফুল" গান না শুনিলে, তোমার তাপিত প্রাণ শীতল হয় না। তখন হৃদয়ভরা প্রেমে, বুকভরা ভাবে, মুখভরা মধুময়ী কথায় সদালাপ করিতে,—বোধ হইত, বুঝি ইহাতেই স্বর্গ, বুঝি ইহাই মুক্তি, ইহাই বুঝি বক্ষের কৌস্তুভমণি, কণ্ঠের কহিনুর, নয়নের তারা, দেহের প্রাণবায়ু, আর এখন তোমাদের প্রেমের পরিবর্ত্তে স্বার্থ, ভালবাসার পরিবর্ত্তে মনরাখা মিষ্টি ছুরী, সদালাপের পরিবর্ত্তে খল খল হাসি;—তাই বুঝি এখন আর পত্নী-বিয়োগে অশৌচ কাল শেষ হইবার অপেক্ষা করিতে পার না,—দ্বিতীয় দিনে নূতন বেশে নূতন হাসি হাসিয়া নূতন "কনে" দেখিতে যাও।

পুরুষ জাতির অধিক নিন্দা করিব না, এইমাত্র বলিব,—যিনি রামায়ণের রাম ছিলেন, তিনি এখন লণ্ডন রহস্যের

যুবরাজ হইয়াছেন,—ধর্ম্মাবতার যুধিষ্ঠির, ননীচোরা কেঁড়ে-ভাঙ্গা, কমদতলায় কৃষ্ণ হইয়াছেন; ভগবৎগীতা বিদ্যাসুন্দর হইয়াছে; চন্দন-বৃক্ষ বাবলা গাছ হইয়াছে। তুমি আগে ছিলে, গঙ্গাজলে চিনি, এখন হইয়াছ ব্রাণ্ডিজলে লেমনেড্; আগে ছিলে তান্‌সানের সঙ্গীত, এখন হইয়াছ নিধুর টপ্পা; খাঁটি সোণা পিতল হইয়াছে—দেবতা দৈত্য হইয়াছে।

গদাধর-চরিত।

(আরম্ভ)

গদাধরের গ্রামে বড় পসার, পাড়ায় ভারি মান্য, ঘরে অতিশয় আদর। ছেলে ভাল হইলেই এই রকম ঘটে; জিনি-য়স-আগুণ কবে লুকান থাকে? গদাধর যখন নবম বর্ষীয় বালক, তখন হইতেই রাজনীতির গূঢ় রস বুঝিতে আরম্ভ করেন,—যেন বালক ধ্রুব ঐশ্বরিক ভাবে তন্ময় হইলেন। বঙ্গীয় রাজনীতির তেজ বড় প্রবল, যেন মরা গঙ্গায় ভরা বান,—গদাই আর মাকে, মানেন না, বাপের কথা শুনেন না, মাষ্টারকে চক্ষু রাঙ্গাইয়া উঠেন। লোকে ভাবিল, ছেলের ভারি ইস্পিরিট।

গদাধরের পল্লীগ্রামে বাস। বাপ নিরীহ মানুষ—চাষবাস করে, খায় দায় থাকে। গ্রামে একটি মাইনর স্কুল ছিল। গদাই দুইবার মাইনর পরীক্ষায় ফেল হইয়া বলিলেন, এ

স্কুল কিছু নয়, মাষ্টার কিছু জানে না ; গ্রামে, গঙ্গার এপারে আর পড়িব না—সহরের স্কুলে না পড়িলে বিদ্যা হয় না, উন্নতি হয় না। বুড়ো বাপ কি করিবে? সেকেলে মানুষ ; পুত্রের কথাতে বুঝিল, “হতেও পারে, সহরে না থাকিলে বড়লোক হয় না”। বৃদ্ধের পূর্ব্বসঞ্চিত যা ধন ছিল—শরীরের রক্ত জল করিয়া যে কিছু রোজগার করিয়াছিল, তাহাই খরচ করিয়া পুত্রকে কলিকাতায় পাঠাইল। পুত্র শুভ দিনে বাঁকা সীঁথি কাটিয়া; কালা পেড়ে কোচান ধূতি পরিয়া, আতরের গন্ধে ভুর হইয়া, বিদ্যা শিক্ষার্থ কলিকাতা যাত্রা করিলেন, মনে হইল যেন একটী মল্লিকা ফুলের তোড়া চলিয়া যাইতেছে ; যেন বর বিবাহ-বাসরে অগ্রসর হইতেছে, অথবা যেন ফরেশডাঙ্গার বাবু কার্ত্তিক-বাহন ছাড়িয়া পদচারণ করিতেছেন। গদাধর অতি পরিপক্ক বয়সেই স্বগ্রাম হইতে প্রায় সকল নব প্রকাশিত সংবাদপত্রের বিশেষ সংবাদদাতা মনোনীত হইয়াছিলেন ; আর “একটা ছাগলের তিনটা লেজ,” “বিড়ালে মহিষ প্রবল করিয়াছে”—এইরূপ অদ্ভুত সংবাদ লিখিয়া সংবাদপত্রকে এবং জগৎকে উপকৃত করিতেন। এখন সহরে আসিয়া সংবাদপত্র ছাড়িয়া মেগাজিন ধরিলেন। কারণ গদাই সতত বলিতেন, সামান্য বিষয় আর তাঁহার কলমে আইসে না—তাঁহার মস্তিষ্ক কেমন খারাপ হইয়াছে যে, ছোট বিষয়ে আর তাঁহার নজর পড়ে না, কাযেই তাঁহাকে ম্যাগাজিনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। সে যা হোক,

এদিকে আবার পোড়া শিক্ষকের দোষে, পাপ স্কুলের দোষে গদাই সহরেও পুনঃপুনঃ এন্‌ট্রেন্সে ফেল হইতে লাগিলেন। কিন্তু প্রকৃত তেজ কিছুতেই কমে না, বাপকে লিখিলেন, প্রিয় পিতঃ! পাস ফেল কেবল হাওয়ার গতি—ইহাতে বিদ্যার কিছুমাত্র পরিমাণ বুঝা যায় না—পিতঃ! আমি যে বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছি, তাহাতে পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ইহকাল পরকালে পরম সুখে বাবুগিরি করিয়া কাল কাটাইতে পারিব।

ক্রমে বড় কঠিন কাল আসিল। পিতার ধূলি গুঁড়ি চক্রাকার হইল,—ছেলেকে আর বাসাখরচ পাঠাইতে পারিলেন না। গদাই তখন সংসার আঁধার দেখিলেন; অন্নচিন্তা চমৎকার হইল। আশা বৃহৎ—ডেপুটীগিরির কম চাকুরি লইবেন না, এইরূপ আড়ম্বর করিতেন। কিন্তু ক্রমে বুঝিলেন, আমি কোন্ কীটাণুকীট—যেখানে বড় বড় ইন্দ্র পাত হইতেছে, সে স্থলে গদাইয়ের গলাধাক্কা ব্যতীত অপর পুরস্কার কি হইবে? সকল আশা ভরসা "উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে" হইল; গদাই ক্রমে শুকাইয়া যাইতে লাগিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, কি করি? কিন্তু জিনিয়স গদাইয়ের অধিক্ষণ ভাবিতে হইল না—"সংবাদপত্রের এডিটর হই, কিম্বা দেশহিতৈষী হই" এই দুইটীর মধ্যে কোন্ পদটী গ্রহণ করিবেন, তাহারই মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইলেন। দেশহিতৈষিতার প্রধান অঙ্গ বক্তৃতা, তাহাতে গদাই কম নহেন, তবে বক্তৃতায় ত পয়সা হয় না—এই ভাবনায় অস্থির হইলেন; কিন্তু তখনই প্রতিভা-

বলে বুঝিলেন, বুদ্ধি থাকিলে কি না হয়? বুদ্ধি থাকিলে সাগরে তরী চলে, আকাশে বেলুন উঠে, জলে পদ্ম ফুটে, দুধে গোয়ালা জল ঢালে, চোরে চুরী করে। আমি এত লেখা পড়া শিখিয়া কি কেবল শুধু-হাতে ফিরিব? গদাধর সেই দিন হইতে দেশভক্ত হইলেন, মুখে আর কোন কথা নাই, কেবল বলিতেছেন।

মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি ;
রাত্রি দিবা ঝরিছে লোচন-বারি !
সত্বরে কামস্কট্‌কা রেলপথ করি,
ভাসিব আনন্দে ভারতে উদ্ধারি।

---

(২)

গদাধরের মনে মনে ধারণা, তিনি বড় সুপুরুষ। ভাবিতেন এমন সুন্দর রঙ আর কোথাও নাই; হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, মিত্রদের বড় বাবু অপেক্ষা তিনি চারিগুণ ফরশা, ঘোষেদের মেজবউ অপেক্ষা সাড়ে তিন গুণ এবং ঠাকুর বাড়ীর রঙ অপেক্ষা দ্বিগুণ—রঙে ইহ জগতে দ্বিগুণের নীচে তিনি কখনও হইলেন না। গদাইয়ের ইহসংসারে একটা বিশেষ কার্য্য দর্পণে মুখ দেখা। সময় নাই, অসময় নাই, সুবিধা পাইলেই আয়না লইয়া অমনি মুখ দেখিতেছেন—সম্মুখে আয়না খানি রাখিয়া কখন চোক বুজিতেছেন, কখন দাঁত বাহির করিতেছেন, কখন বা রুমাল দিয়া চোখের কোণ

মুছিতেছেন, আর ভাবিতেছেন, আমিই বুঝি স্বয়ং রতিপতি কন্দর্প—ভুলক্রমে মানবগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছি।

গদাই কেন যে এমন করিতেন, তাহা তিনিই জানেন, তাঁর মন জানে, আর অন্তর্যামি-ভগবানই জানেন; লোকে কিন্তু চর্ম্মচক্ষে দেখিত; গদাই একটী মেটে রঙের পুরুষ, চোক দুটি কোটরে, লম্বা—গায়ে মাংস নাই। তবে লোকের ভ্রান্ত চক্ষু দূষিত হইতে পারে।

গদাই একটী নিখুঁত পুরুষ; গম্ভীর, ন্যায়ের মস্তকে কখন পদাঘাত করেন না, সুরাপায়ী দেখিলে শিহরিয়া উঠেন, লোকের দুঃখ দেখিলে কাঁদেন। তবে যদি কেহ বলিত "গদাই! তোমার বয়স ৩২ বৎসর—তুমি কি আজকের লোক?" গদাই অমনি ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইতেন,—বলিতেন, আমার অপেক্ষা রামহরি দশ বৎসরের বড়, তার আজও বিবাহ হইল না। তোমরা বড় খারাপ লোক। বয়স লইয়া লোকের সহিত গদাইয়ের সচরাচর বচসা হইত। গদাইকে অশ্রাব্য কটূক্তি কর, দুই ঘা মার—শিষ্ট শান্ত গদাই সকলই নীরবে সহিতে পারেন, কিন্তু কুড়ির বেশী বয়স বলিলে গদাই ক্ষুধিত সিংহের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিতেন। ঈশ্বরের কেমন সৃষ্টি জানি না, কিন্তু গদাই-চরিত্র এই রূপই ছিল।

এক দিন প্রাতঃকালে সম্মুখে দর্পণ রাখিয়া গদাই নিবিষ্ট-চিত্তে কি গভীর ভাব ভাবিতেছেন, তাহা কেহ জানে না; মলয় মারুত-আন্দোলিত নলিনীর ন্যায় মধ্যে মধ্যে দুলিতেছেন,

আর অস্ফুট কণ্ঠস্বরে, বলিতেছেন, "সব ঠিক্, কেবল চীনে একজন দূত পাঠাইলেই হয়—উপযুক্ত পাত্র কে? পাত্রের মধ্যে ত আমি আর মিষ্টার গোবর্দ্ধন। কিন্তু আমরা গেলে চলে কৈ? তবে কি কামস্কট্‌কা রেল পথ হওয়া ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে?" গদাই ভাবিতে ভাবিতে ক্রমে ভাব-সাগরে ডুবিয়া গেলেন; ক্রমে একটু উঁচু স্বরে বলিতে লাগিলেন;—

একা আমি এ'সংসারে কোন্ দিক্ রাখি,
দুই হাত দুই পদ, দুই নাস পুট—
দুটীর অধিক মোর নাহি কর্ণ-ছিদ্র;
হায় রে নাহিক জিহ্বা একের অধিক,—
সামান্য সম্বলে বল কেমনে পথিব
কামস্কট্‌কা-ভূমি; হায় মোর কি যন্ত্রণা;
কেন না হইল মোর দুইটী রসনা,
চারি চক্ষু চারি হস্ত, চারিটি চরণ।
তা হ'লে কি আজ আমি ভাবিতাম এত?
দুই চোক পাঠাইতাম চীন-উপকূলে,
একটি রসনা যেত লয়ে দুটী হাত
(বক্তৃতাকারে নাড়িবার হেতু চীন দেশে)
এতক্ষণ চীনরাজ কাঁপিত সভয়ে—
পায়ে ধরি ভাব করিত দিত ভূমি ছাড়ি;
চলিত বাষ্পীয় যান গভীর গর্জ্জনে
ঘোর রবে ঘর্ঘরিয়া ঘূরিয়া উঠিত

গিরিশৃঙ্গে, রঙ্গে ভঙ্গে মাতঙ্গ যেমতি
ধায় মাতঙ্গিনী-পিছে পর্ব্বত-উপরি।
কিন্তু একা আমি; যোড়া যোড়া নাই বস্তু
কি করিতে পারি? ইচ্ছা হয় এই দণ্ডে
অসি করি করে উপাড়িয়া ডান চক্ষু,
চিরিয়া রসনা, ছিঁড়িয়া দক্ষিণ বাহু
ফেলি চৈনিক প্রাচীরে,

এমন সময়ে একটি লোক আসিয়া পশ্চাৎ হইতে গদাইয়ের চক্ষু টিপিয়া ধরিল; গদাই বলিলেন,

"কে তুমি হে? মিষ্টার মিত্রজ নাকি?
চক্ষু চাপি কিবা ফল, ছাড় দুনয়ন;—
জ্ঞান-চক্ষে ধূলি দেয় কাহার শকতি?
পার্থিব-নয়ন ঢাকি মোরে কি ভুলাবে?
চক্ষু বুজি সব দেখি, আমি গদাধর!

তখনও তিনি চক্ষু ছাড়িলেন না—গদাই আবার বলিলেন,—

চক্ষু ছাড় গোবর্দ্ধন মিত্রজ নন্দন!
নয়ন-রতন আজ বড় মূল্যবান্;
ডান চক্ষু যাবে আজ চীনের মুলুকে,
বাম আঁখি রবে গৃহে, গৃহ, করি আলো।

সেই লোকটি তখন চক্ষু ছাড়িয়া দিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইল; গদাই বিস্মিত হইয়া বলিলেন; একি?

নিবাস কোথায় তব ঘর কোন্ দেশে ?
কভু তুমি নহ বঙ্গে মিষ্টর গোবর ?
বঙ্গ ভূমি জন্ম-ভূমি নহে রে তোমার ?
"জাতীয় লক্ষণ নাই তোমার শরীরে !
হ্যাট্, কোট কৈ তব ? গলায় কলার কৈ ;
একি বস্ত্র পরিধান ?—সাজে মরি দেখে
ফিঙ্ ফিঙে কাণি—নীচে তার কাল ডোরা,
উপরে উলঙ্গ অঙ্গ—রঙ্গ ভঙ্গ দেখি
শিহরে আতঙ্গে অঙ্গ মোরে ; হায় বিধি
কি মাটিতে গড়েছিলে এ নর-মূরতি ?

লোকটার নাম হরিদাস ঘোষ, গদাধরের গ্রামবাসী। বাল্য-কালে উভয়ে গ্রাম্য স্কুলে পড়েন। তবে পরস্পরে এক্ষণে পদের তারতম্য হইয়াছে, হরিদাস ৭০৲ টাকা মাহিনার কেরাণী, গদাধর এখন উচ্চে,—গিরি-শৃঙ্গ অপেক্ষা অধিক উন্নতস্থলে—প্রায় স্বর্গের কোলে অবস্থিত। একবার ছাপা-খানা করিব বলিয়া গদাই হরিদাস বাবুর নিকট হইতে তিন শত টাকা কর্জ্জ করেন ; লোকে বলে "সে টাকা মতিলাল সাহা ডিক্রী জারি করিয়া লয়," গদাই বলেন, "কামস্কট্কা রেল-পথে ব্যয় হইয়াছে।" সে প্রায় এক বৎসরের কথা। হরিদাস মাসে এক খানি পত্র লিখিয়াও সে টাকা পান নাই—ভাল মানুষ হরিদাস কি করেন, শেষে স্বয়ং আসিয়া দেখা করিলেন। তিনি বড় আমোদপ্রিয় লোক। বহু দিনের পর

বালক-বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি গদাইয়ের চক্ষু টিপিয়া ধরেন; শেষে গদাইয়ের বিকৃত ভাব দেখিয়া ঈষৎ লজ্জিত হইয়া চক্ষু ছাড়িয়া দিলেন। ক্রমে ধীরে ধীরে হরিদাস বলিলেন, "ভাই গদাই একি? তোমার কি হইয়াছে? আমাকে কি সত্য সত্যই চিনিতে পারিতেছ না? তুমি বিকৃত ভাষায় ও সব কি বলিতেছ?"

উত্তরিল, গদাধর, ক্রোধে কম্প দেহ—
"কে তুমি হে কৃষ্ণকায়? ভোমরা ভরম
হয় দেখি তব দেহ; কুকণ্ঠে উগার
কেন কাল পেঁচা সম কিচিকিচে ধ্বনি;
(এবে) অনেক সাঙ্গাত আসে সখা সখা বলি
আলাপিতে মোর সনে এ ঐশ্বর্য্য-কালে।
ভাই বল, খুড়া বল, বাবাই বা বল—
কিছুতেই গদাধর ভুলিবার নয়!
অধিক কি আর কথা আছে তোমা-সনে।
শীঘ্র ছাড় মোর পাশ—বমি বাহিরিবে
দেখি তব কালো অঙ্গ, চামচিকা-সম
দুর্গন্ধ গায়েতে তব—পালাও অসভ্য
নহিলে পুলিশে দিয়া প্রহারিব তোরে।"

হরিদাস বাবুর একে অনেক দিনের পাওনা আছে—তাহার উপর এইরূপ ব্যবহার, তিনি এইটু জ্বলিয়া উঠিলেন—"দেখ গদাই! তোমার আদি অন্ত নাড়ী নক্ষত্র জানিতে আমার

আর কিছু বাকি নাই, টাকা ধার লইয়াছ, দাও; যারা তোমাকে জানে না, তাহাদের নিকট বক্তৃতা করিও, চক্ষু বুজিও—কামস্কট্‌কায় রেল-পথ পাতিও। আমাকে তুমি চিনিতে পারিতেছ না? আমাকে তোমার স্মরণ না থাকিতে পারে,—কিন্তু যে দিন রামমণি ময়রাণীর মোকদ্দমায় তোমাকে পুলিশে লইয়া যায়, সে দিন তোমাকে কে রক্ষা করিয়াছিল যখন খাইতে পাইতে না; প্রত্যহ এক বেলা অন্ন জুটিত না; তখন কে টাকা দিয়াছিল? যখন দুর্ভিক্ষ-ফণ্ডের টাকা উদর-সাৎ করিলে, সে সময়ে তোমাকে কে বাঁচাইয়াছিল? এ সকল কথাও কি এখন মনে নাই? এখন তুমি বড় লোক হইয়াছ, সাহেব সাজিয়া থাক, কবিতা রচনা কর,—বড় লাটের লেভিতে যাও, বক্তৃতা দাও,—শেষে কামস্কট্‌কায় রেল পাতিতেছ,—আমাকে চিনিবে কেন? আমি কালো, অসভ্য, সন্দেহ নাই,—তবে যে তিন শত টাকা ছাপাখানা করিব বলিয়া লইয়া আসিয়াছিলে, তাহা দিলেই ঘর যাই।

গদাই। শুন বন্ধু নিবেদন—ক্রোধ কর কেন?

মন মোর মজিয়াছে ভারতের ভাবে
ভাই, বন্ধু, মাতা, পিতা মনে নাহি পড়ে,
মুখ দেখি আর কারো চিনিতে না পারি,
তুমি হে পরমাত্মীয় বৈস মোর কাছে,
ভাল কর্ম্ম দিব ভাই! কামস্কট্‌কার পথে।

হরিদাস বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "ভণ্ডামি রাখ; সোজা

কথা কও নহিলে আমি চলিলাম।” গদাই তখন হরিদাসকে এক নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে উঠাইয়া লইয়া গিয়া গোপনে কি বলিলেন।

তখন হরিদাস গদাইয়ের দলে ভর্ত্তি হইতে অনুরুদ্ধ হইলেন। হরিদাস বলিলেন, আমি খেতে না পাই তাও স্বীকার, তোমাদের সঙ্গে মিশিব না। এই কথা বলিয়া তিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইলেন।

ছোক্‌রা বাবু।

ছোক্‌রাটী দশকর্ম্মান্বিত। সব জানেন, সব বুঝেন, সবেতেই আছেন। সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প, রাজনীতি, পবিত্র প্রণয়, পরোপকার—এ সমস্তই তাঁর একচেটে। যেমন ইংরেজীতে উৎকৃষ্ট অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারেন, গান-বাজনাতেও তিনি সেইরূপ গৃহস্থের খোলা উঠান দেখিলেই তিনি ঠিক আঁচিয়া লয়েন—এখানে বক্তৃতা জমিবে কি না, এখানে পাঁচ শত লোকের সমাবেশ হয় কি না, এখানে রমণীকুল চিকের আড়ালে থাকিয়া তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে পাইবেন কি না? গোলদীঘি, লালদীঘি, হেদো, বিডন উদ্যান, জলের কলের মাঠ—তাঁহার কণ্ঠধ্বনিতে বহুবার প্রতিধ্বনিত। এদিকে ত এই; ওদিকে ঝিঁঝিঁট, খাম্বাজ, বসন্তবাহার, ললিতবিভাস, ইমন, পুরবি—প্রায় সমস্ত সুরেই

তিনিই ভাঁজিতে পারেন। লোকে ভাবে কালেজের এত পড়া পড়ে, ছোক্‌রাবাবু এত গান শিখিলেন কেমন করে? হারমোনিয়মেও তাঁর দখল কম নহে। পাড়ার চতুর্দ্দশ-বর্ষীয়া একটী অতি শিশু বালিকাকে তিনি মধ্যে দিনকতক হারমোনিয়ম শিখাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার বাজনাবিদ্যার উৎকৃষ্ট পরিচয়। ছবি আঁকা, উলবোনা, ফুল-তোলা,—এ সবেও তিনি পেছপাও নন। ধরাধামে এমন কোন কায দেখি না যাহাতে তিনি অগ্রগামী নহেন। সভায় স্থির হইল, অদ্য হইতে বালকগণের ধূমপান ও পান খাওয়া নিষেধ। শপথ-পত্রে তিনি সর্ব্বাগ্রে সই করিলেন। শিমলা পাহাড় হইতে রীপণ হাবড়া ষ্টেশনে নামিলেন, তিনি রীপণের সম্মুখে সর্ব্ব প্রথমে দণ্ডায়মান। ধ্বজা ধরিয়া ভারত উদ্ধারের জন্য চাঁদা তুলিবার দরকার, তিনি কোমরে চাদর জড়াইয়া, চাঁদার খাতা বগলে করিয়া অলি-গলি ঘুরিতেছেন। আর, এই বয়সে ছোক্‌রার প্রেম-বিষয়িণী অভিজ্ঞতারই বা দৌড় কত! হৃদয়টা গলেই আছে। প্রাণ-পাখী ত উড়েই আছে! মানস-সরোবরে পদ্মফুলত ফুটেই আছে! আড়নয়নে চাহনিত অনবরত বাঁকাই আছে! গোধূলি-লগ্নে ছাদে উঠিয়া একদৃষ্টে তীর্থদর্শন ত আছেই আছে! একজন বন্ধু একবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসেন, "ওহে ভাই! তুমি এ ভর্‌সন্ধ্যা বেলা, চোখ কপালে তুলে, রোজ রোজ একদৃষ্টে ঠায় কি চেয়ে দেখ বল দেখি?

চোখ ক্ষরে যাবে যে!" ছোক্‌রাবাবু তখন এক মহা-বিকট ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিলেন "কি কহিলে, অবোধ! আমি আকাশ-পটে অঙ্কিত জ্যোতিষিক পদার্থ দেখিতেছি; গ্রহ, উপগ্রহ, সূর্য্যের অস্তগমন, চন্দ্রের প্রস্ফুটন, নক্ষত্ররাজির সুশোভন অনিমিষ লোচনে হেরিতেছি,—

হে নভোমণ্ডল বল স্বরূপ;
কে দিল তোমায় এরূপ রূপ?

জ্যোতিষজ্ঞানের জন্য চক্ষু ক্ষরে, ক্ষরুক। রামচন্দ্র সীতার উদ্ধারের জন্য ভগবতীকে চোখ উপড়াইয়া দিতে গিয়াছিলেন, আর আমি এ সর্ব্বজীবের মঙ্গলের জন্য, জ্যোতিষের উদ্ধারের জন্য, আমার দুইটী চক্ষুই কি দিতে পারিব না?"

বন্ধু! আকাশের শোভা দেখ্‌তে হলে, চোখ ত উপর পানেই থাকে। তোমার টেড়ুচা চোখ বাঁকা-রেখায় নীচে পানে ঠায় চেয়ে আছে কেন? জ্যোতিষ কি ছাদের উপর? চন্দ্র সূর্য্য কি জানালায় উঠে?

ছোক্‌রা। ছি! তুমি বিজ্ঞান বুঝনা!—তোমার শিখিতে এখনও ঢের বাকি। তোমার সঙ্গে আমি কথা কহিতে চাহি না।

তার পর হইতে ছোক্‌রাবাবুর সহিত তাঁহার বন্ধুর মুখ দেখাদেখি বন্ধ হইল।

ছোক্‌রাবাবু সর্ব্ব গুণের গুণমণি,—কেবল "এল-এ" ফেল। বিগত বৎসর এলে ফেল হইয়া তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের

ধ্বংস-বাসনায় গুরুতর রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রবৃত্ত হন। কেহ বলিল, ডিরেক্টারের চাকুরি যাইবে; কেহ ভাবিল, পরীক্ষক প্রাণে মরিবে; কেহ বুঝিল, সিণ্ডিকেটের সভ্যগণ দ্বীপান্তরিত হইবে।—ক্যোশ্চেন পেপার "কল্" করিয়া তিনি মহা মহা মেমোরিয়াল ড্রপ্ করিতে লাগিলেন। প্রথমে ছোট লাট, তার পর বড় লাটের কাছে দরখাস্ত গেল। তাহাতেও কিছু হইল না দেখিয়া তিনি বিলাতে জন্ ব্রাইটের নিকট সে আবেদন পাঠাইয়া দিলেন। এমন কি, এ বিষয়ে লড়িবার জন্য, বিলাতে শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষকেও মোক্তারনামা দিবার কথা হয়। সেই আন্দোলনে পৃথিবী ভুকম্পের ন্যায় টল্ টল্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ছোক্‌রা-বাবু বলিতে লাগিলেন; ইংরাজী সাহিত্যে আমার ৯৯ নম্বর নিশ্চয়ই পাইবার কথা,—সেই সাহিত্যেই আমাকে ফেল করিয়াছে; সাহিত্য আমার কেল্লা—সে কেল্লা দখল করে কে? নিশ্চয়ই আমার কাগজে নম্বর দিতে ভুলিয়াছে, প্রথমে নির্জ্জনে এরূপ চিন্তা, চিন্তার পর সখাগণ সমক্ষে ঐরূপ কথাবার্ত্তা, অবশেষে ঐ বিষয়ে টাউনহলে সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ্য বক্তৃতা! দেখিয়া শুনিয়া ছোক্‌রাবাবুর গুরুজী বলিলেন,—"এই ছোক্‌রা, কালে অদ্বিতীয় পুরুষ হইবে—ভবিষ্যতে আমার সিংহাসন অধিকার করিতে পারিবে।"

এল-এ, ফেল হইয়া আন্দোলনের পরই ছোক্‌রাটী নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে বিবাহ করিলেন। বিবাহ করিয়াই অবধি

প্রণয়-সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন! কনেটী ত নয় বৎসরের বালিকা, এখনও ধূলা-খেলা করে, দিনে তিনবার ভাত খায়; তাহাকেই বিবাহের এক সপ্তাহ পরে, তিনি এইরূপ পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলেন;—

"প্রাণপ্রতিমে!

তোমার অদর্শনে প্রাণ জ্বলি জ্বলি করিতেছে। বিচ্ছেদের আগুন দাউ দাউ জ্বলিতেছে। তোমার সেই মুখখানি,—সেই পূর্ণিমার শশধর-বিনিন্দিত সেই প্রেমপূর্ণ মুখখানি,—আমি কেমন করিয়া ভুলিব? ইচ্ছা হয়, ব্যোমযানে করিয়া উড়িয়া গিয়া তোমায় একবার দেখিয়া আসি, তোমার সেই আধ হাসি, আধ-লজ্জাপূর্ণ বদনমণ্ডলে একটী পবিত্র চুম্বন রাখিয়া আসি, কিন্তু বুঝি বিধাতার সেরূপ অভিপ্রায় নহে, নহিলে তুমি এত দূরদেশে থাকিবে কেন? তবে প্রাণেশ্বরি! ইহাও জানিও, যে যার প্রিয়, সে তাহার কখনই দূর নহে। আকাশের চাঁদ কোটি যোজন দূরে থাকিয়াও, হ্রদমধ্যস্থ কুমুদিনীর বন্ধু। সাত সমুদ্র তেরনদী দূরে থাকিয়াও ব্রাইট্‌ ভারতমাতার বন্ধু! হা প্রাণনায়িকে! শরদিন্দুনিভাননে! তুমি আমার দূর নও!—সম্মুখে বসিয়া সেইরূপ ভাবেই আমার হৃদয় মন পুলকিত করিতেছ! আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছি, আমি চুম্বন করিলাম! কিন্তু প্রিয়ধন! তুমি কৈ? তুমি লুকাইলে কেন? আমি চারিদিক্‌ আঁধার দেখিতেছি!

প্রাণপ্রেয়সি ! গোলাপ নাম তোমাতেই যথার্থ খাটিয়াছে। কেমন গাল-ভরা নরম নাম ! একবার নাম উচ্চারণ করিলেই মুখে রস আসে। ইচ্ছা হয়, নিভৃতে বসিয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, একান্তমনে কেবল গোলাপ, গোলাপ, গোলাপ নাম জপ করি ;—শেষে ঐ নামের সঙ্গে আমার পরমাত্মাকে মাখাচোখা করিয়া মিশাইয়া দিই !

ফুলশয্যার রাত্রে তুমি আমার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কও নাই বটে, কিন্তু তখন একটি আধটী যে কণ্ঠধ্বনি শুনিয়াছিলাম, তাহাতেই তাপিত প্রাণ শীতল হইয়াছিল, উষ্ণ মস্তিষ্কে বরফজল পড়িয়াছিল ! আহা ! সে কোমল কণ্ঠের কমনীয় ধ্বনি কিবা মনোহর,—ঠিক যেন বসন্তবাহার রাগিণীর রসময় সঙ্গীত, কি বলিব, প্রাণপ্রিয়ে ! প্রাণ যে পুড়ে গেল ! আমি চাতকপক্ষীর ন্যায় আশা-বারির আশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম। তুমি কি একখানি পত্র লিখিয়া আমার এ আগুণ নিবাইবে না ? আমাকে প্রতিদিন পত্র লিখিবে বলিয়া বিরানব্বই খানি টিকিটযুক্ত খাম এবং এক প্যাকেট ডাকের কাগজ পাঠাইলাম। খামে আমার ঠিকানা লিখিয়া দিলাম, তোমার কোমল হাতের কষ্ট করিয়া আর ঠিকানা লিখিতে হইবে না। অদ্য বিদায় ! চলিলাম।

মনে-রেখো ভুল না—

তোমারই শ্রীঅনঙ্গমোহন।

এই পত্র পাইয়া, সেই নয় বৎসরের কনেটী ভাল মন্দ কিছুই বুঝিল না;—কেবল ফ্যাল্ ফ্যাল্ চাহিয়া রহিল। ছোক্‌রাবাবু ওদিকে নববিবাহিতা সহধর্ম্মিণীকে প্রত্যহ পত্র লিখিতেন—ডেলিনিউস্ চালাইবে বলিয়া নিশ্চিন্ত আছেন, এদিকে কনেটী ডেলিনিউসের কথা তিলার্দ্ধও মনোযোগ না করিয়া প্রত্যহ কেবল আপন মনে পুতুল খেলা করিতে লাগিলেন। ইহাতে ছোক্‌রাবাবুর প্রাণ বড়ই আনচান করিতে লাগিল,—ডেলিনিউসের বদলে, প্রাণাধিকার একখানি সাপ্তাহিক পত্রও পাইলেন না। ছোক্‌রাবাবু আবার স্ত্রীকে পত্র লিখিবার জন্য লেখনী ধরিলেন ; মরা অদ্য আপাততঃ কলম ছাড়িয়া বিদায় লইলাম।

হঠাৎ বাবু।

১ম।

দেখিতে দেখিতে আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হইল। হাতে কলমে, জিহ্বার সাহায্যে—সৎ অসৎকর্ম্ম করিয়া, ভালমানুষি জুয়াচুরি করিয়া অনেক টাকা রোজগার হইল। বাল্য-কালের কেবলা নাম ঘুচিল, ক্যাবলচন্দ্র বাবু নাম হইল। ধনের মাহাত্ম্য, ব্যবহারের মাহাত্ম্য, দুষ্কর্ম্মের মাহাত্ম্য—যখন এই তিন মহা মাহাত্ম্য—ত্র্যহস্পর্শে একত্র হইয়াছে,

তখন তাঁহাকে পাড়ার মধ্যে, নগরের মধ্যে কেনই বা না প্রকৃত "বাবু" অভিধানে অলঙ্কৃত করা হইবে?

একজন প্রতিবেশী বৃদ্ধ "ভট্টাচার্য্য" লোক জনের সাক্ষাতে প্রায়ই বলিয়া বেড়ান—"নির্ধনের ধন হইলে, সে প্রায়ই ধরাকে সরাখানা দেখে,—কিন্তু আমাদের হরিদাস ভায়ার পৌত্র (অর্থাৎ আমাদের নায়ক) আজি কালি ধরাকে কটরা খানি অপেক্ষাও ছোট দেখিতেছেন। ওর বাপ দূর হইতে দেখিলে দৌড়িয়া আসিয়া প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লয়; ও ছোঁড়া এখন চোখোচোখি হইলেও কথা কয় না, গাড়ি করে বুক ফুলিয়ে যাবার সময় আমাকে দেখিতে পাইলে আবার কটমট করে চেয়ে থাকা হয়।"

আর একজন বলেন, "শুধু কথা না কহিলে কোন ক্ষতি ছিল না, আজ কাল, উনি আবার মহা কুলীন হইয়াছেন। কুল-গৌরব করা হয়, বলা হয়, এমন নিখুঁত প্রসিদ্ধ কুল কোথায় মিলিবে না।"

তৃতীয় ব্যক্তি বলেন,—"ওর সমস্ত দোষকে পারা যায়—কেবল ব্যবহার দোষেই লোকটা মাটি হইয়াছে। ওর প্রপিতামহ ছিল মুটের সর্দ্দার, পিতামহ ছিল গোমস্তা, বাপ ছিল ৩০৲ টাকা মাহিনার কলম-টানা কেরাণি, তার ছেলে আজ মানুষকে মানুষ বলে না কেন? এত নবাব, এত ধিঙ্গি হইল কেন? টাকা হইলেই কি সকলকে রূঢ় কথা, কটু কথা কহিতে হয়?—এক দিন সে মূঢ়, একজন ভদ্রসন্তানকে

এরূপ অপমানের কথা বলিল যে, তাহার চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িল। আমি হ'লে তৎক্ষণাৎ ক্যাবলচন্দ্রের দুই গালে চারি চড় মারিতাম।” এই কথা শুনিয়া অপর একজন উত্তর করিল, “বোধ হয়, মদের ঝোঁকে এরূপ কার্য্য করিয়া থাকিবে—ক্যাবল ত লোক বড় মন্দ নয়।” তিনি ও রসে বঞ্চিত; বড় বাজে খরচ করেন না; তবে পরের পয়সা পাইলে কালে ভদ্রে একটু আধটু মদ খাওয়া আছে।

এসব কথা শুনিয়া একজন ধীরপ্রকৃতি পুরুষ সর্ব্বদাই বলেন, “যাহার পূর্ব্ব পুরুষগণ কখন সৎশিক্ষা পায় নাই, তাহাদের বংশধর কি এক পুরুষেই টাকা হইয়াছে বলিয়া সৎ ব্যবহার শিখিবে? ব্যস্ত হইলে চলিবে কেন? ভাল শিক্ষা পাইলে, ক্যাবলচন্দ্রের পুত্রগণ না হউক,—পৌত্র প্রপৌত্রগণ সম্ভবতঃ কখনই এরূপ ক্ষুদ্রচেতা হইবে না; এবং তাহাদের নজরও এত ছোট হইবে না।” কিন্তু এরূপ দূর আশায় কেহই বড় আশ্বাসান্বিত হইতেন না।

লোকে পরশ্রীকাতর বলিয়াই হউক, অথবা ক্যাবলবাবুর প্রকৃত প্রস্তাবে দোষ আছে বলিয়াই হউক, যে কারণেই হউক—অনেকেই ক্যাবলের নিন্দাবাদ করেন; এবং অনেকেই তাঁহার অশিষ্ট আচরণে মনের দুঃখে কালযাপন করেন।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুঃখিত, যন্ত্রণায় অধিক অস্থির—ক্যাবলচন্দ্রের পিতা। বাপ বেটা বুড়ো কালো, মাসে ১৫ টাকা পেন্‌সন পায়, সকলের উপযুক্ত মান খাতির রাখে,

সাদাসিধে লোক—মান, অভিমান খল কপট বড় একটা নাই। নানা কারণে শ্রীযুক্ত ক্যাবলরাম বাবু নিজ পিতার উপর অতিশয় বেজার হইয়াছেন; নানা কারণে জনক, পুত্রের চক্ষুঃশূল হইয়াছে।

বাপ্ কালো কেন? দগ্ধানন জনক যদি ভ্রমরের ন্যায়, পরিপক্ক জম্বুফলের ন্যায়, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ না হইতেন, তাহা হইলে ক্যাবলচন্দ্র বাবুর রঙ কখনই এত কালো হইত না। একমাত্র পিতার দোষেই, পুত্রের সমস্ত সাবান্ মাথা ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। লক্ষপতি হইলেন, গাড়ি ঘোড়া চাপিলেন, ইংরেজের বুট-পদ-রজ লইয়া উত্তমাঙ্গে মাখিলেন, তথাচ পৈতৃক অপরাধে, দুধে আলতার মত রঙ ফলাইতে পারিলেন না; সুতরাং পিতা যখন পুত্রের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেন, পুত্র তখন রোষকষায়িত-লোচনে দন্তে দন্তে সংঘর্ষণ করিয়া পিতার মুখ পানে এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকিতেন এবং আপনা-আপনি মনে মনে বলিতেন;—রে মূর্খ পিতঃ! তোমার বর্ণ দগ্ধ অঙ্গারের ন্যায় এরূপ কৃষ্ণ বর্ণ কেন? তোমার নিমিত্তই, প্রতিদিন শতবার বিধৌত হইলেও আমার এ দেহের মলিনত্ব ঘুচিতেছে না; আমি বলিতেছি, এই পাপে তোমার সদ্গতি লাভ হইবে না।

পিতার দ্বিতীয় দোষ, পুত্রের কথার বশ নহে; পুত্রের সহিত সমান উত্তর করেন। বাপ বেটা বড় বেয়াড়া লোক;—প্রত্যহ শয্যাত্যাগে গঙ্গাস্নানটী করা আছে, ইহা

দেখিয়া ক্যাবল বাবুর সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া যাইত; ক্যাবলরাম মনে মনে ভাবিতেন—তেল মাখিয়া গমছা কাঁধে করিয়া হাঁটিয়া স্নান করিতে যাওয়া ছোট লোকের কায; উপযুক্ত পুত্রের ধারণা ছিল—ইহাতে জনসমাজে কেবল তাঁহার অপমান হয়; বিশেষ সেরূপ অবস্থায় রাস্তার মধ্যে পিতাকে বাপ বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ হয়, সুতরাং গাড়ি করিয়া স্নান করিতে যাইতে বৃদ্ধের প্রতি হুকুম হইল; বৃদ্ধ সে কথা গ্রাহ্য করিল না; কাযেই পিতা পুত্রের চক্ষুঃশূল হইলেন।

গঙ্গাতীরে একটী হাট আছে, বৃদ্ধ আবার হাটবারে নিজের ইচ্ছামত বাজার করিয়া জিনিষপত্র গামছায় বান্ধিয়া লইয়া আইসে। পুত্রের ভয়ে অতি গোপনে এ কায সম্পন্ন করিতে হয়; কিছুদিন পরে গোয়েন্দাগণ পুত্রের নিকট সংবাদ দিল, বৃদ্ধ এই দুষ্কর্ম্ম করে। তখন ক্রোধের আর পরিসীমা রহিল না—হুতাশন হুহু জ্বলিয়া উঠিল; হর-কোপানলে মদন ভস্মের ন্যায়, পুত্র-কোপানলে পিতা ভস্ম হইবার ত উপক্রম হইল। অনুনয়-বিনয়ে স্তব-স্তুতিতে ক্রোধের বেগ সম্পূর্ণ-রূপে থামিল না। যে দিন অনল পিতৃ-অঙ্গ স্পর্শ করিল, সেই দিন অবধি পিতার গঙ্গাস্নান বন্ধ হইল—সদর বাটীর সরহদ্দ লঙ্ঘন করিতেও নিষেধ হইল, পিতা নজরবন্দীতে রহিলেন—হতভাগ্যের ইহজন্মের সমস্ত সুখ ফুরাইল; প্রাণ ধারণার্থ দু-বেলা চারিটি চারিটি অন্ন পাইয়া নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে

বাস করেন—হুকুম ব্যতীত চৌকাঠ ডিঙ্গাইবার সাধ্য কি ?—কেননা,—

"দ্বারে ফেরে দৌবারিক ভীষণ মুরতি।" সুপুত্র ক্যাবল-চন্দ্র বাবুকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, "মহাশয় আপনার পিতাকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না কেন ?" ক্যাবলরাম উত্তর দেন, "তাঁহার মেজাজ খারাপ হইয়াছে,—উন্মাদের লক্ষণ দেখা দিয়াছে, কবিরাজের চিকিৎসা হইতেছে, এখন আবার বাহির হওয়া নিষিদ্ধ।" সুতরাং বলিতে হয়, ক্যাবল বাবু ধনবান্ হওয়াতে পরমগুরু পিতার যেমন দুঃখ, তত দুঃখ পাড়া প্রতিবাসিগণের মধ্যে আর কাহারও হয় নাই।

---

(২)

নবদূর্ব্বাদলশ্যাম ক্যাবলচন্দ্র রোজগারের প্রথম অবস্থায় বসন ভূষণে অতিশয় প্রিয় ছিলেন। নীল, পীত, লোহিত, অসিতসিত বর্ণের—রঙ বেরঙের পোঁষাক শ্রী-অঙ্গে সুশোভ-মান হইত, বক্ষে ভৃগুপদ-চিহ্নের ন্যায়, ঘড়ি-বৃন্ত-সংলগ্ন বৃহত্তর সুবর্ণজিঞ্জির বিরাজ করিত; তদীয় নাসিকাগ্রভাগস্থিতা মনোমোহিনী চসমা কত যুবক-কুলের মন হরণ করিত। ক্যাবল বাবু উঠন্তি বয়সে এইরূপই জবড়জঙ্গী বেশ-ভূষা করিয়া রাজ-দরবারে গমন করিতেন। ক্রমে বহুদর্শিতা-সাহায্যে বুঝিলেন, স্বয়ং কেবল মূল্যবান্ কাপড় জড়াইয়া সঙ সাজিয়া থাকা প্রকৃত ধনবান্ এবং বাবুর চিহ্ন নহে। সেইটী বুঝিবা

দিন অবধি তিনি তাঁহার সহিত কোচম্যানকে আলপাকা প্রভৃতি কাপড়ের ভাল ভাল চাপকান চোগা বিতরণ করিলেন। কিন্তু এরূপ কার্য্যে তাঁহার মনস্তৃপ্তি হইল না, সহস্র বৃশ্চিক-দংশনের ন্যায় তাঁহার হৃদয়ে জ্বালা উপস্থিত হইল—ভাবিতে লাগিলেনস, মাজের কি অত্যাচার!—"আমি অর্থবান্ হইয়াও আশা মিটাইয়া বস্ত্রালঙ্কার পরিতে পাইলাম না,—আমার চাকর নফরে পরিতেছে, ইহা কি আমার সহ্য হয়? আমি যদি পরি, লোক আমাকে বুনিয়াদি বড় মানুষ না বলিয়া, নূতন বড় লোক বলিবে, সুতরাং (হয় ত) সমাজ আমাকে প্রকৃত বাবু বলিয়াও ডাকিবে না,—আমি কি হতভাগ্য!"

হতভাগ্য বাবুর দুঃখের ওর নাই! যখন পালকি গাড়ী করিয়া গমনাগমন করেন, তখন ভাবেন,—"আমি কি অধম, কোচম্যান আমার চাকর হইয়াও, আমার মাথার উপর বসিয়া গাড়ি চালাইতেছে। আমার গাড়ি, আমার ঘোড়া, কোচম্যান বেটা আমার বাঁধা-মাহিনার চাকর, তবু আমি এই কোচম্যানের পদানত! সমাজের কি অত্যাচার।" যৌবনের প্রারম্ভে ক্যাবলচন্দ্র ধর্ম্মসম্বন্ধে গোলযোগে পড়িয়াছিলেন! কি ধর্ম্ম মানিলে বেশী বাবু হওয়া যায়, তখন তাঁহার এই চিন্তাই প্রবলা হইল, ভাবিয়া ভাবিয়া ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; কিন্তু দিন কয়েক পরে, বয়স একটু পরিপক্ক হইলে বুঝিলেন, এধর্ম্মে মজা নাই,—আশানুরূপ

সুবিধা এবং সুখ পাইলেন না। আজ কালি লোক জনের সাক্ষাতে ৮২ সিক্কা ওজনের টন্‌টনে গোঁড়া-হিন্দু বলিয়া পরিচিত; বাস্তুভিটায় বৎসর বৎসর মা দুর্গার প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করা হয়; কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, নবশাখ, ইংরেজ, মুসলমান, সাধু, অসাধু, সজ্জন, অসজ্জন, সকল রকমেরই লোক নিমন্ত্রিত হইয়া থাকেন। কিন্তু কুৎসাপ্রিয় প্রতিবেশিগণ বলেন, লৌকতার টাকার জন্য যত আটুপাটু, দুর্গোৎসবে ততটুকু—ততটুকু কেন, তাহার একতিলও, ভক্তি নাই।

স্নান আহ্নিক না করিয়া জলগ্রহণ করেন না; মা কালীর সম্মুখে বলিদান না হইলে ছাগমাংস ভক্ষণ করেন না, যবনের সহিত একাসনে বসিয়া তামাক খান না;—তবে বিশ্বনিন্দুক লোকে কাণাকাণি করে, বাবু লুকাইয়া লুকাইয়া মুসলমানের দোকানের পাঁউরুটী খান, এবং ফাউল-কারিরও সহিত তাঁহার বিলক্ষণ গুপ্ত প্রেম আছে। এইরূপ শ্রীমান্ ক্যাবল প্রকৃত বাবু নামে অভিহিত হইবার অভিলাষে, হিন্দুধর্ম্মের টীকা ললাটে ধারণ করত লুকোচুরি খেলাইয়া কাল কাটাইতেছেন।

শ্রীমানের যে কত দুঃখ, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? লোকজনের সাক্ষাতে উদরপূর্ণ করিয়া আহার করিতে পারেন না—তাঁহার বড় লজ্জা করে। পাকি তিন পোয়া চাউলের কম ত সে উদর-বিবর পরিপূর্ণ হইবার নহে?—কিন্তু বেশী আহার করা ছোট লোকের কায, নীচ-বংশোদ্ভব লোকের কায, এই ভাবিয়া আমাদের নায়ক, লোকজন—

বন্ধু-বান্ধবের সাক্ষাতে ভয়ে পূর্ণ মাত্রায় আহার করিতে পারেন না। তেল মাখিয়া মুড়ি, চাল কড়াই ভাজা খাইতেও বিলক্ষণ সাধ আছে, কিন্তু লোক-লাজভয়ে সে রসেতেও বঞ্চিত। বলা বাহুল্য, যখন নির্জ্জনে গুপ্তভাবে অবস্থিতি করেন,—তখন ইচ্ছামত অন্ন এবং মুড়ি, চাউল ভাজা উদরস্থ করেন; আর ভাবেন,—"আমার কি দুরাদৃষ্ট —গোপনে রসনা পরিতৃপ্ত করিতেই কি আমার জন্ম হইয়াছিল?"

সংবাদপত্রের গ্রাহক হইবার সাধ আছে; গৃহাভ্যন্তরে দৈনিক সাপ্তাহিক পত্রের ছড়াছড়ি না থাকিলে লোকে বাবু বলিবে কেন? তবে মূল্য দিবার সময় মারামারি করেন— বাপ্‌রে বালাই রে ডাক ছাড়েন—এ কাগজ কিছু নয়, ইহাতে কেবল বাজে কথা,—মিথ্যা কথা লেখা থাকে—শীঘ্রই ছাড়িয়া দিব,—বলেন।

দান-ধ্যান করিবার মধ্যে মধ্যে ইচ্ছা জন্মে। গবর্ণমেণ্টের নিকটে খেতাব, সম্মান,—বিনা পয়সায়, শুধু শুধু ত, পাওয়া যায় না। আর দাতা না হইলেই লোকজনের নিকটই সম্ভ্রম থাকে কই?—লোকে যে কৃপণ বলিয়া ফেলিবে! সেই সময়ে শ্রীমান্ আমাদের বড় বিপদে পড়েন, ভেবে ভেবে তাঁহার সর্দ্দিগর্ম্মি হইবার উপক্রম হয়। এ দিকে এক পয়সা মা বাপ —গোরক্ত ব্রহ্মরক্ত; ওদিকে টাকা খরচ না করিলে গবর্ণ-মেণ্টের নিকট পরিচিত হয়েন না—লোক জনের নিকট মান

থাকে না। শেষে কি জনসাধারণের চক্ষে তাঁহার বাবুত্ব কম হইয়া দাঁড়াইবে?—সময়ে সময়ে এই ভাবনাতেই তিনি পাগল-প্রায় হইয়া উঠেন।

চাকর চাকরাণীকুলের উপর ক্যাবলচন্দ্র হাড়ে হাড়ে চটা;—কেননা তাহারা মাস পোহাইলেই মাহিনা চাহে। মাহিনা দিবার সময় তাঁহার অন্তর দগ্ধ হয়—জীবনের মূল-গ্রন্থী পর্য্যন্ত বিশুষ্ক হইয়া যায়;—কি জ্বালা, কি যন্ত্রণা!—ও গুলোকে না রাখিলেও নয় (তা না হইলে আবার মান সম্ভ্রম থাকে না) রাখিলেও আবার মাহিনা দিতে হয়। সুতরাং মাসে মাসে দাস দাসীর বদল হয়; যে একবার আইসে, পুনরায় সে আর আসিতে চাহে না;—দূর হইতেই ক্যাবল-রামের খুরে দণ্ডবৎ করে! নাপিত, ধোবা, পুরোহিত, পাচক সকলেরই এইরূপ ব্যাপার। ক্যাবলচন্দ্রের বিশ্বাস—বড় লোক হইলেই একটা না একটা বড় ব্যারাম থাকিবে, যথা—কাস, অম্বল, বহুমূত্র, হাঁপানি, মেহ ইত্যাদি। ক্যাবলরামের মহা-ভাবনা, তাঁহার কেন ওসব ব্যারাম নাই?—তবে কি তিনি বড় লোক, বাবুলোক নহেন? দেহ যে কেন ব্যাধিগ্রস্ত নহে, এই মহাভাবনা,—মহাদুঃখে তাঁহার রাত্রে ঘুম হয় না। কিন্তু উপায় ত নাই—কি করেন—অবশেষে মিথ্যা কথার আশ্রয় লইলেন; লোকের কাছে বুকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলেন, "আমার আমাশয়ের লক্ষণ দেখা দিয়াছে।" কখনও বলেন, "অম্বলের জ্বালায় গেলাম।" কখন যে কি কথা বলিয়া ফেলেন,

তাহার ঠিকানা পাওয়া যায় না। সময়ে সময়ে গার্হস্থ কবিরাজের এক আধটা বটিকাও লোক জনের সাক্ষাতে উদরস্থ করা আছে। তথাচ পর-ঐশ্বর্য্যদ্বেষী বিটল লোকে রটনা করে, "বাবুর ব্যারাম নাই।" এ সব কথা শুনিয়া ক্যাবলরামের কেবল গায়ের রক্ত জল হইয়া যায়।

ক্যাবলরাম, প্রতিবেশী, জ্ঞাতি কুটুম্ব, বাল্যকালের সমপদস্থ বন্ধু-বান্ধবের উপর বিশেষ বিরক্ত; তাহাদিগকে দূর হইতে দেখিলেই বিষম জ্বলিয়া উঠেন। কেন, কে বলিতে পারে—তাঁহার মনের কথা, ভগবান্ ব্যতিত আর কে জানে? তবে সেই চিরকালের বিশ্বনিন্দুক বিশ্ব-অধিবাসিগণ বলেন—জাতি কুটুম্বের মধ্যে অনেকেই দরিদ্রদশাপন্ন, অনেকেরই চালা ঘর;—জাতি কুটুম্বের সহিত সদালাপ করিলে, পাছে লোকে মনে করে, ক্যাবলরামেরও এক দিন দরিদ্র দশা ছিল, ইহাই তাঁহার দারুণ ভয়, সুতরাং জ্ঞাতি কুটুম্বকে চৌকাঠ ডিঙ্গাইতে দেন না। ধনবান্ লোকের সহিতই আমোদ আহ্লাদ করিয়া কাল কাটাইতে তাঁহার ঐকান্তিক বাসনা। ক্যাবলচন্দ্র, নিজ বৈঠকে বসিয়া, পারিষদবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া,—"এ জগতে, কে প্রকৃত বাবু, কেইবা প্রকৃত মানুষ"—কেবল এই সকল কথারই আলোচনা করেন। যেমন পরিপক্ক কাঁটাল ভাঙ্গিলে মাছিকুল সমাকুল হয়,—মহা মহোৎসব হয়, ক্যাবলরাম এখন সেইরূপ দশাগ্রস্ত। সেই সভায় তর্ক-বিতর্কের পর প্রায়ই স্থিরীকৃত হয়, এই নশ্বর জগতে,

জ্বালা-যন্ত্রণাময় সংসারে, ক্যাবলচন্দ্রই বাবু—ক্যাবলচন্দ্রই মানুষ। শ্রীমান্ তখন আনন্দবিহ্বল হয়েন,—আনন্দাশ্রু গণ্ডস্থল বহিয়া ভূতলে পতিত হয়।

অপর কাহাকেও "বাবু" বলিলে ক্যাবল মনে মনে বড় বেজার হয়েন,—অসহ্য হইলে কখন কখন ক্রোধ প্রকাশ করিয়া ফেলেন, বলেন,—"বাবু কে?" তর্ক-বিতর্কের মজলিসে, এক দিন একজন নিরীহ ভাল মানুষ স্থূল-বুদ্ধি লোক কথা-প্রসঙ্গে হঠাৎ বলিলেন, "মহাশয়! রসিকবাবু বড় মন্দ লোক নহেন।" তখন ক্যাবলরামের রক্ত-চক্ষু কপালে উঠিয়া বিষম ঘুরিতে লাগিল—ক্রোধে গাত্র-রোম সোজা হইয়া দাঁড়াইল; দাঁতকপাটি যাইবার মত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন, "স্থূলবুদ্ধি! তোমার সংসারের জ্ঞান নাই। রস্‌কে আবার মানুষ—সে আবার বাবু?—যাকে তাকে বাবু বল—ইহা তোমার কোন্ দেশী আচরণ? তুমি জান, সে আমাদের চাকরেরও যোগ্য নহে; রামা, হরে, কেষ্টা, মোদো,—তুমি যে সকলকেই,—ছত্রিশ জাতিকেই বাবু বলিতে আরম্ভ করিলে? পুনরায় এমন কথা আমার সাক্ষাতে উচ্চারণ করিও না! সাবধান!"

বাবু-বিষয়ক তর্ক শুনিয়া কেবল বাড়ীর পুষ্টিধর খানসামা বুঝিয়াছে,—যে ব্যক্তি মিথ্যা কহে, জুয়াচুরি, প্রবঞ্চনা, জাল করে, লোককে কটুকথা বলে,—যে ব্যক্তি লম্পট, মদে যার অশ্রদ্ধা নাই,—আর এই সকল কাজের সঙ্গে যে প্রভূত টাকা

রোজগার করে—সেই এ বঙ্গে বাবু নামে অভিহিত হইবার যোগ্য। সৃষ্টিধর, ক্যাবলরাম বাবুর খুব পিয়ারের চাকর।

মেমসাহেব।

১ নং

বঙ্গের মুখ-উজ্জ্বল-কারিণী, কুলের কমলিনী মিত্রদের বউ—শ্রীমতী কাদম্বিনী মিত্র নূতন শ্বশুর-গৃহে আসিয়া পাড়াকে সরগরম করিয়া তুলিয়াছেন। মিসেস্ মিত্র বাঙ্গালা ভাষায় আউট্, ইংরেজী ভাষায় আউট্ হব-হব হইয়াছেন, কারুকার্য্য-গুলি পারিস্ এক্‌জিবিশনে কেবল পাঠাইবার অপেক্ষা আছে। আজ কাল তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার পুস্তক পড়েন, এক বাক্স হোমিওপ্যাথিক ঔষধ আলমারিতে আছে; গৃহের ঝিকে রোজ প্রাতঃকালে উঠিয়া ১ ফোঁটা করিয়া ঔষধ খাওয়ান; অসভ্য দুষ্টা ঝি ঔষধের মর্ম্ম বুঝে না, মহৌষধ সেবনের সময় কেবল লুকাইয়া বেড়ায়। বৃদ্ধা ঝি একদিন অতি কাতর হইয়া বলিল—"বউ মা! রোজ ঔষধ খাইয়া আমার শরীরে আর কিছুই নাই, এক মুঠা অন্ন রোচে না, আমি এক সিকে মাহিনা কম্ নিতে পারি, কিন্তু আর ঔষধ খাব না।" মিসেস্ মিত্র অতি গম্ভীর ভাবে, নয়নদ্বয় বিস্তার করত ঈষৎ গ্রীবা দুলাইয়া বলিলেন—"হে গৃহদাসি! তোমার রোগের লক্ষণ কঠিন দেখিতেছি, তুমি আর অধিক দিন বাঁচিবে

না—১০।১৫ বৎসর মধ্যে অবশ্যই তোমার দেহ পঞ্চভূতে মিশাইবে।

"তবে চিকিৎসকের নিয়ম, রোগ যেমন কেন শক্ত হউক না, অবশ্যই ঔষধ সেবন করাইবে; সুতরাং অদ্য হইতে আমি তোমার চিকিৎসা ও শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইব। চাহিয়া দেখ, সেই এক ফোঁটা ঔষধে তোমার ক্ষুধা বৃদ্ধি হইবে, অঙ্গে বল-সঞ্চার হইবে, বৈকালে মনও অতি স্ফূর্ত্তিতে থাকিবে"—বৃদ্ধা দাসী চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"দোহাই বৌমা! আমাকে রক্ষা করুন—আমার তিন কুড়ি বছর বয়েস হলো, এ জন্মে আমি ওষুদ কাকে বলে, তা জানিতাম না—আজ একমাস ধরে আমাকে কেন ওষুদ খাওয়াচ্চেন, তা বল্‌তে পারি না—দোহাই মা! আমাকে ছেড়ে দিন—বেলা হোলো, থালা পাথর কিছুই মাজা হয় নাই; দেরি হইলে গিন্নী আমাকেই বোক্‌বেন—আমি বুড় শিবের দিব্ব করে বল্‌চি,—আমার কোন ব্যারাম হয় নি"—কাদম্বিনী বলিয়া উঠিলেন,—"চুপ্ কর, চুপ্ কর, এ রোগ কথা কহিলে বৃদ্ধি পায়, তুমি ক্ষণেক আমার নিকট বসিয়া স্থির হও। তখন বৃদ্ধা গতি মুক্তি নাই দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল। মিসেস্ মিত্র (স্বগত) আহা কি শোকের বিষয়, এ যে উন্মাদের লক্ষণ দেখিতেছি; এই-মাত্র কতই প্রলাপ বকিল, আবার তখনি চক্ষে জল আসিল, এ যাত্রা রক্ষা পাওয়া ভার; আমার যতদূর সাধ্য চিকিৎসা করিব প্রকাশ্যে বলিলেন—"বৃদ্ধে, গৃহদাসি, সঙ্কটাপন্ন-জীবনে!

তুমি জান, রোগীকে ঔষধ-দান, এবং তাহার শুশ্রূষা করা রমণীর একটী প্রধান পবিত্র ধর্ম্ম,—তুমি সংবাদপত্রে অবশ্যই পড়িয়াছ, বিগত রুষ-তুরস্ক যুদ্ধে কত শত মহিলা, আহত সৈনিকদিগের সেবা করিয়া কত প্রশংসার পাত্রী হইয়াছেন, কিরূপ পদ-গৌরব লাভ করিয়াছেন। তোমাকে অদ্য হইতে দিবসে তিন বার করিয়া প্রতিবারে দুই ফোঁটার হিসাবে ঔষধ খাইতে হইবে। তোমার ব্যায়াম আবশ্যক, এবং আজি হইতে তোমাকে প্রত্যহ সকালে বৈকালে ভাগীরথী-তটে রোজ এক ঘণ্টা করিয়া ভ্রমণ করিতে হইবে; ইহা ব্যতীত ১০৮ ডিগ্রী উত্তপ্ত জলে ২৲ টাকা গজ ফ্লেনেলের দ্বারা রাত্রি নয়টার সময় তোমার পৃষ্ঠ দেশে ফোমেণ্ট করিতে হইবে; পথ্য আজ হইতে চিকেন-ব্রথ এবং পাঁওরুটী।”—বৃদ্ধা দাসী কিছুই বুঝিতে পারে নাই, অতিশয় ব্যগ্র হইয়া বলিতে লাগিল,—“বউমা! উঠানে রোদ আসিয়াছে, এখনও ঝাঁট পড়ে নাই, আজ গিন্নী আমাকে বড় গালি দিবেন, শীঘ্রি ছেড়ে দেন, আমি বড় গরীব, কখন কারু কিছু মন্দ করিনি—আমাকে কেন এমন কচ্চেন।” এই বলিয়া বৃদ্ধা যাইতে উদ্যত হইল; বউমা তখন, দাসী প্রকৃত উন্মাদ হইয়াছে দেখিয়া, বস্ত্রের দ্বারা দাসীকে খাটের পায়ার বাঁধিবার উদ্যোগ করিলেন। দাসী মহা আর্ত্তনাদে চীৎকার করিয়া উঠিল। গম্ভীর আর্ত্তনাদের শব্দ পাইয়া কাদম্বিনীর স্বামীর বুড়ী-মা দৌড়িয়া আসিল। বুড়ী মা তখন গো-সেবায় নিযুক্ত ছিল, শ্যামলী নাম্নী দুগ্ধবতী

গাভীর সেবা স্বয়ং না করিলে তাঁহার মনঃপূত হইত না। হাতে-পায়ে গোবর, এলোথেলো-কেশা, স্খলিত-মলিন-বসনা কাদম্বিনীর শাশুড়ী ঠাকুরাণী এই বিপরীত ব্যাপার দেখিয়া ভীত স্তম্ভিত হইয়া উঠিলেন—"বউমা! একি—একি," বউ মা উত্তর দিলেন—"চুপ্ চুপ্—গোল করিও না, রোগীর কষ্ট হইবে; আর তোমাকে একটা উপদেশ দিই, তোমার এ বেশ কেন?—হস্ত পদে কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকাবৎ অপরিষ্কার ও-পদার্থ গুলি কি? সুগন্ধময় হনিসোপ দিয়া ও-গুলি শীঘ্র পরিষ্কার করিয়া ফেল, নচেৎ রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা; আর এদেশে বিশেষ একটা কুব্যবহার দেখিতেছি,—তোমার অঙ্গে সেমিজের উপর কোর্ত্তা নাই কেন?—আমার সম্মুখে অন্ততঃ সেমিজ গায়ে দিয়া আসা উচিত ছিল—বৃদ্ধে! তোমার আবরণহীন বেশ দেখিয়া আমার অতিশয় লজ্জা করিতেছে,—কিন্তু তুমি স্বামি-নগেন্দ্রের জননী; সুতরাং তুমি কিছু দয়ার পাত্রী,—তোমাকে আমার এই কোর্ত্তাটী দিলাম, শীঘ্র অন্তরালে গিয়া অঙ্গ বিধৌত করত উহা পরিধান কর! এই বলিয়া কাদম্বিনী—স্বামি-নগেন্দ্রের জননীর গায়ে একটা জ্যাকেট ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। কার্য্য-গতিক দেখিয়া বৃদ্ধা হুতাশে চেঁচাইয়া উঠিল—"ওমা—একি হলোগো—ওমা—একি হলোগো বৌমা আজ এমন কচ্চেন কেন গো? আমার বউমাকে বুঝি আজ ডাইনে খেয়েছে, বাবা নগেন! কোথা গেলিরে? একবার শিগ্‌গিরি আয়! বৃদ্ধার গলার শব্দ পাইয়া পাড়ার অনেক প্রবীণা স্ত্রীলোক

জমিয়া গেল। কাদম্বিনী তাহাদিগকে দেখিয়া অতি কাতর স্বরে বলিতে লাগিলেন—"হায়, হায়, বঙ্গের কি দুর্দ্দশা—এই সকল ভগিনীগণ অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন, পরম পিতা পরমেশ্বরের জ্যোতির্ম্ময় রূপ দেখে নাই—ইহাদের অঙ্গে পরিচ্ছদ নাই, পায়ে মোজা নাই, হস্তে পুস্তক নাই!" প্রবীণাগণ বলিতে লাগিল—"তাই ত মা এ যে সত্য সত্যই একে আজ পাকা ডাইনে খেয়েছে। ও-পাড়ার নাপিত বৌয়ের জলপড়া ভিন্ন কিছুতেই এ ডাইন ছাড়িবে না।" নগেন্দ্র বেচারা স্কুল মাষ্টার ৩০৲ টাকা মাহিনা পায়—তাহাতে কুলায় না; আবার দুবেলা দুটী প্রাইভেটটুইশন আছে। সকালে তাই ডেপুটী বাবুর ছেলেকে পড়াইতে গিয়াছেন, ক্রমে লোক-মুখে শুনিলেন—বাড়ীতে ভারি বিপদ্। অমনি শশব্যস্তে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিলেন—দেখিলেন বাড়ীতে লোকে লোকারণ্য—ভয়ে আর পা চলে না। তখন স্বামির আগমন-বার্ত্তা পাইয়া, স্ত্রী সসম্ভ্রমে উঠিয়া স্বামীকে নিজ কক্ষমধ্যে লইয়া আসিবার জন্য অগ্রগামিনী হইলেন এবং সেই লোকা-রণ্য মধ্যে সেক্‌হ্যাণ্ড করিবার উদ্‌যোগ করিলেন। স্বামী লজ্জিত, অধোবদন, স্তব্ধ, মুখ শুকাইয়া গেল, চক্ষু কপালে উঠিয়া দাঁতকপাটী লাগিবার উপক্রম হইল; প্রবীণারা বলিয়া উঠিলেন,—"উঃ! বড় শক্ত ডাইন, কচি বউটীকে একেবারে হাড়ে হাড়ে খেয়েছে, জলপড়ার কর্ম্ম নয়; বন্দীপুরের রাম-সুন্দর হাড়ী ওঝাকে আনিতে হইবে।" স্ত্রী ক্রমে গিয়া

স্বামীর হস্ত ধরিয়া বলিলেন—"ছি। নাথ! আমার গাউন কৈ আনিলে না? তোমার প্রণয়িনীকে এ বেশে রাখিতে তোমার কি লজ্জা বোধ হয় না?"

নগেন্দ্রবাবুর মাতা বধুর ব্যাধি-নিবারণের জন্য রাম-সুন্দুরে ওঝাকে আনিতে লোক পাঠাইলেন। গোলমালে দাসীটা যে কোথায় পলাইল, তাহা কেহ ঠিক করিতে পারিল না।

ভাল কে, সভ্য না অসভ্য।

গভীরতত্ত্ব গবেষণা, জানি না, বাল্মীকি-বেদব্যাস বেদ-বাই-বেল বুঝি না; হিউম-হালাম হামিণ্টনকে চিনি না; মিল-মেকলে মোক্ষমুলরের সঙ্গে মিশি না; অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় সন্দেহ নাই। ভবে আসিলাম, ইংরেজ সঙ্গে মজিলাম, সংসার-সাগরে ডুবিলাম, কত খাবি খাইলাম, তথাচ সভ্যতা কি—বুঝিলাম না। হায় যদি বুঝিলাম না, যদি এ স্বর্গ-সুধা পান করিতে পাইলাম না, তবে মরিলাম না কেন? খ্রীষ্টানের ইউরোপ সভ্য, কি, হিন্দুর ভারতবর্ষ সভ্য? ইংরেজ সভ্য, কি বাঙ্গালী সভ্য? আজ এই ইংরেজরাজত্বে বসিয়া ইংরে-জের মোহিনী বিদ্যায় মোহিত হইয়া, ইংরেজের জন্য জীবন ধারণ করিয়া, এ কথার উত্তর কেমন করিয়া দিব? যে ব্যক্তি পরের খায়, পরের ঘরে বেড়ায়, কিসে পরের জিনিষটী উদর-

সাং করিতে পারে, তাহার চেষ্টায় থাকে, তাহাকে সভ্য বলিব কেমন করিয়া? বল দেখি, ভাই! কে লোক ভাল? তোমার অসুখ হইল, আমি গিয়া তোমার সেবা শুশ্রূষা করিলাম, ডাক্তার ডাকিলাম, পথ্যের জিনিষ আনিলাম, গাত্র-দাহের সময় গায়ে হাত বুলাইলাম; অসভ্য হিন্দুমতে ত এইরূপই বন্ধুর কার্য্য। কিন্তু সভ্য-সাহেবের ব্যবস্থা কি জান? পীড়িতের গৃহে গিয়া বাহিরে দ্বারবান্ বা অপর কাহারও নিকট সাহেব নাম লিখিয়া রাখিয়া আসিলেন,—জানান-হইল, আমি তোমায় দেখিতে আসিয়াছিলাম। সাধারণত খৃষ্টান, চোখের দেখা দেখেন, হিন্দু অন্তরের সহিত দেখেন।

দেখ দেখি, হিন্দুর দান কেমন পবিত্র! ভিক্ষুক ভিক্ষা করিতে আসিল, ক্ষুধায় অন্তর আকুল, পিপাসায় প্রাণ ব্যাকুল, হিন্দু তাহাকে অন্ন জল দিল, শান্ত করিল। কিন্তু সাহেবের বাটী গেলে, সেই ভিখারিকে প্রথমে ত সাহেবের কুকুর কামড়াইতে আসিবে, কুকুরের হাতে প্রাণ বাঁচিলে চাপরাসীর গলাধাক্কা খাইতে হইবে। ভিখারীকে দেখিয়া সাহেবের বিরক্তি বৈ দয়া হইবে না; অথচ সাহেব দাতা—সভায় যান, বক্তৃতা করেন, দুর্ভিক্ষ-ফণ্ডে চাঁদা দেন—আর সেই দানের কথা লইয়া সংবাদপত্রে জয় ঢাক বাজে—সাহেবের দান সার্থক হয়। যদি কোন দরিদ্র প্রতিবাসী উপবাসী থাকে, হিন্দুর মন কাঁদিয়া উঠে; অমনি তাহাকে আপন গৃহে ডাকিয়া আনিয়া

আহার দেন,—কিন্তু সাহেবের নিকটের বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নাই, সতত দূরদৃষ্টি। টিম্বক্‌টু কোথায় হয়ত জানেন না, সে দেশের লোক কেমন তাহা শুনেন নাই; যদি তারে সংবাদ আসিল, অগ্নিদাহে সে দেশের গৃহাদি পুড়িয়া গিয়াছে, লোক সব নিঃস্ব হইয়াছে এবং বিলাতে পাদরিগণ এজন্য চাঁদার খাতা বাহির করিয়াছেন, তাহা হইলে সাহেব অমনি শত যোজন দূরবর্ত্তী টিম্বক্‌টু-অধিবাসীদের দারিদ্র্য-দুঃখ ঘুচাইবার জন্য চাঁদা দিবেন, অথচ পাড়ার লোক যে অনাহারে মরে, সেটা একবার দেখিবেন না। আবার এদিকে দেখুন, সাহেবের চারিটা খানসামা আছে, দুইটা বাবুর্চি আছে, একটা পোষা বানর আছে; একটা হরিণ আছে, দুটা পাখী আছে, কত টাকা, মিছা ব্যয়ে যাইতেছে;—তাহাতে দৃষ্টিপাত নাই—কিন্তু ভাই আসিয়া যদি দুই দিন রহিল, অমনি ভ্রাতার নামে খরচের বিল হইল। তাই জিজ্ঞাসা করি, ভাল কে? অসভ্য হিন্দু—না, সভ্য সাহেব?

সভ্যতা-স্রোতে সত্য কথাও ভাসিয়া যাইতেছে। সভ্য-সাহেব বাড়ীতে আছেন,—কার্য্যে ব্যস্ত। চাপরাসী বলিল "সাহেব বাড়ী নাই;"—সাহেব, ভৃত্যের এমনই সংশিক্ষক। আগে আমাদের দেশে চন্দ্র সূর্য্যকে সাক্ষী রাখিয়া দেনা পাওনা চলিত; কিন্তু সাহেব-সমাগমে, সভ্যতার বৃদ্ধিতে চন্দ্র-সূর্য্য বড় আর [illegible] পান না, ক্রমেই উন্নতি হইল; সূর্য্যের পরিবর্ত্তে [illegible] [illegible] লেখা পড়া চলিল, তার পর ইষ্টাম্প

কাগজে পাকা দলিল হইল। কিন্তু তাহাতেও খুঁৎ বাহির হইল,—অবশেষে রেজষ্টরি—বিশেষ রেজষ্টরি প্রথা চলিল,—কিন্তু তবুও সন্দেহ ঘুচিল না। সভ্যতার আঁটা-আঁটিতে সকলে যেন অবিশ্বাসী ও অসত্য-বাদী হইয়াছে। তাই জিজ্ঞাসা করিতে হয় ভাল কে?

সাহেবী প্রেম কেমন? সভ্য জাতির স্ত্রী, স্বামীকে ত্যাগ করিয়া আর একটা স্বামী লয়;—স্বামী, স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া, আর একটা স্ত্রী লইতে পারে। ভালবাস, ভালবাসিব—আহার দিতে পার, তোমার হইব,—সুখে রাখ, মিষ্ট কথা শুনাইব,—পেলা দাও, গান গাইব; সভ্য জাতির এইরূপ নীতিতে স্ত্রীপুরুষ-সম্বন্ধ বিধিবদ্ধ হইয়াছে! যেন প্রেমের বেচা কেনা চলিয়াছে। কিন্তু হিন্দু-রমণীর অতুলনীয়, অপরিমেয় প্রেমের লক্ষণ সভ্য সাহেব-রমণীতে নাই। তোমার হৃদয়—আমার হৃদয় এক—এ ভাব সাহেবের আছে কি? সভ্য দেশে সতীত্ব বাজারদরে যেন বিক্রীত হয়। আদালতে ক্ষতিপূরণের টাকা দিলেই দুষ্ট লোক নিষ্কৃতি পায়। হিন্দু রমণীর সতীত্ব প্রাণের অপেক্ষা গরীয়ান্—শুধু অর্থদণ্ডে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে স্বতঃই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, ভাল কে? সভ্য ইউরোপ ভাল, না অসভ্য হিন্দু ভাল? খৃষ্টান্, না, হিন্দু! আমি মিল্ পড়ি নাই, বুদ্ধির ভ্রম হইতে পারে; যাহা সোজা বুঝিয়াছি, তাহাই বলিলাম, চিন্তাশীল পাঠক এ বিষয়ের বিচার করিবেন।

বাস্তু ঘুঘু।

মানবদেহে যেমন চুলকণা, পশুর অঙ্গের যেমন মাছি, গাছের গায় যেমন কাট পীপড়া, সেইরূপ লোকসমাজে কতকগুলি বাস্তু ঘুঘু আছেন। ঘুঘুর চাল চুলা নাই, উদরান্নের সংস্থান নাই—কেবল গৃহস্থের প্রাচীরে বসিয়া "ঘু" "ঘু" আর সুবিধা পাইলে রন্ধনগৃহে ঢুকিয়া দুধের কড়ায়ে মুখ দেন। নদীতে কুমীর আছে, বনে বাঘ আছে, স্বর্গে বেশ্যা আছে, সমাজে ঘুঘু আছে। মেঘ ছাড়া আকাশ নাই, কলঙ্ক ছাড়া চাঁদ নাই, সং ছাড়া যাত্রা নাই, গহনা-বাতিক-ছাড়া রমণী নাই,—ঘুঘু ছাড়া সমাজ নাই,—তবে কম আর বেশী। বঙ্গসমাজে আজ কাল যেন ঘুঘুর ধড়ফড়ানিটা কিছু অধিক মাত্রায় দেখা দিয়াছে। ঘুঘুগণ মোড়ের মাথায় দোকান খুলিয়া জটলা আরম্ভ করিয়াছে, লাড্ডুতে বিষ মাখাইয়া পথিককে বেচিতেছে; সুবুদ্ধি পথিকের তাহা তিক্ত লাগায় থুথু করিয়া ফেলিয়া দিতেছে। ইহাতে বঙ্গীয় সমাজের কোন ক্ষতি নাই—তবে দুই চারি জন তরলমতি বালকের হৃদয়ে যে হলাহল ঢালিয়া দেয়, পরকাল নষ্ট করে, এই যা দুঃখ। এ মশকের ভোঁ-ভোঁয়ানি নিবৃত্তির জন্য, এই চামচিকার চিকচিকিনি থামাইবার জন্য কামান পাতিবার দরকার নাই,—তবে কিনা ইহারা দুই একটা ছেলে খারাপ করিতেছে, তাহাতেই দুই এক কথা বলিতে হইল।

বালকগণ নানা কারণে বহিয়া যাইতেছে। প্রথম, বিদ্যালয়ে অশিক্ষা। পণ্ডিত, গ্রাম্য পাঠশালে, বালককে শিক্ষা দিতেছেন, দেখ, দরজা বন্ধ করিয়া ঘরের ভিতর স্নান করা উচিত,—বাহিরে স্নান করিলে গায়ে বাতাস লাগিয়া সর্দ্দি হইবে। গরীব বালকের একখানি বই ঘর নাই – তাহাও মাটির ; ঘরের ভিতর স্নান করিলে, মেজেতে কাদা হইলে, বালক শুইবে কোথায়,—সে বন্দোবস্ত গুরুজী করিলেন না ; সাহেবের স্বাস্থ্য-গ্রন্থে যাহা লেখা আছে, সেই বীজমন্ত্র, গুরু, শিষ্য-কর্ণে ফুকিয়া দিলেন। ধন্য গুরু ! আর ধন্য গুরুর কর্ত্তাগুরু ! তার পর বড় হইয়া স্কুলে ইতিহাস-পাঠে বালক শিখিল, বক্তিয়ার খিলিজি সতের জন মুসলমান আনিয়া বঙ্গদেশ জয় করে, আর ক্লাইব, পলাশী-ক্ষেত্রে দুই হাজার ফৌজ লইয়া নবাবের ষাইট হাজার সৈন্যকে সম্মুখসমরে পরাস্ত করিয়া বঙ্গভূমি অধিকারে আনে ;—এই ভুল-শিক্ষা বালকের ক্ষীণ মস্তিষ্কে জন্মের মত নিহিত রহিল, অথচ বালক বয়োবৃদ্ধি-সহকারে "ইতিহাসে পণ্ডিত" হইয়া উঠিলেন। অঙ্কশাস্ত্রে এম, এ, দিলাম, আর্কিমিডিস্ যে সব "প্রব্লেম্" ঠিক করিতে পারেন নাই, তাহাও অকাট্যরূপে প্রমাণ করিলাম ; ক্রমে পাইথাগোরসের জ্যেষ্ঠতাত হইয়া উঠিলাম, কিন্তু বাড়ীতে বৃদ্ধ ঠাকুরমা গরুর জন্য খড় কিনিয়াছেন, ৮৲ টাকা করিয়া কাহন, এক পণ ১৭ আঁটীর দাম কত ? আমি অমনি মাথা চুলকাইতে লাগিলাম, বিষম বিভ্রাট বুঝিয়া নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে

ধীরে ধীরে তথা হইতে পলাইলাম; পণ্ডিত হইলাম বটে, কিন্তু আমার মত মূর্খ দুনিয়ায় আর কেহ রহিল না! আমার উচ্চ শিক্ষা অশিক্ষা বা কুশিক্ষা হইল,—

"পিতল কাটারি, কামে নাহি আয়ল,
উপরহি ঝক্‌মক্ সার!

এই ত শিক্ষা; তাহার আবার কতরূপ বজ্র বাঁধন, নাগ-পাশছাদন দেখুন,—সকল বালকের সমান চৌকস নজর হওয়া আবশ্যক, নহিলে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ নিষেধ। অঙ্ক-বিদ্যা পড়িতে প্রবৃত্তি নাই,—পড়া,—পণ্ডশ্রম বোধ করি, ভাল জানি না, প্রতিবারে আঁকে নম্বর কম হয় বলিয়া ফেল্ হই, প্রতি বৎসর সংসারের সকল আশা, সকল সুখ ফুরায়, অথচ জোর করিয়া, বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে আঁকে পণ্ডিত করিবেন, আঁকে আধ নম্বর কম হয় বলিয়া অবশেষে বিশ্ব-বিদ্যালয় আমাকে তাড়াইয়া দিল। আমি পথের ভিখারি হইলাম, বওয়াটে ছেলের খাতায় নাম উঠিল, পিতা কু-পুত্র মনে করিলেন,—অসার সংসার জগৎ জীর্ণারণ্য বোধ হইল। কেন বাপু, আমি এমন কি অপরাধ করিয়াছি যে, আমাকে একঘরে করিয়া তোমরা আমার ইহকাল পরকাল মাটি করিলে? তুমি বিজ্ঞ পণ্ডিত; তুমি বলিবে, "যে বালক নাহিত্যে প্রতিভাশালী জীব, সে কি চেষ্টা করিলে আঁকে খেলা-রাখা-গোছ, "ছুকুড়ি সাত রাখিতে পারে না?" আমি বলি প্রকৃতই পারে না, যাহাতে যার প্রবৃত্তি নাই, সে

বিষয়ে পরিশ্রম করিয়া বৃথা সময় নষ্ট ও শরীরক্ষয় করিবে কেন? আরও তুমি বলিবে, "একটু একটু আঁক না শিখিলে, সংসারে চলিবে কেন?" সংসারে আঁক, বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কিরূপ শেখান হয়, তাহা ত কাহারও অগোচর নাই।

মানিলাম আঁক না জানিলে সংসার চলে না,--কিন্তু বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে তাড়াইয়া, হাবুডুবু খাওয়াইয়া, বালককে স্বর্গ-স্বর্গ হইতে অনন্ত নরকে ফেলিয়া দিলেই কি সংসার চলে? লঘু পাপে গুরুদণ্ড কেন? শাক-চোরের ফাঁসী কেন? ঘরে মশা হইয়াছে বলিয়া ঘর পোড়ান কেন? সাহিত্য ইতিহাসে আমাকে এন্‌ট্রেন্স, এলে, বি, এ, পাস করাইয়া আমাকে না হয় একটু ছোট রকমের সার্টিফিকেট দাও না? অপরকে হীরা-খচিত, মুক্তার মালা বসান সোণার পদক দাও; আমাকে বিলাতী মুক্তা বসান, আট আনা খাদের একখানি রূপার পদক দাও;—তাহা না করিয়া আমাকে তাড়াও কেন? সংসারের ডোরকৌপীন-ধারী ফকীর কর কেন? তাই বলিতে হয়, বিশ্ববিদ্যালয় একটী বাস্তু ঘুঘু!

সমাজ-ঘুঘুদের উপদ্রবেও ঝটিকা-আন্দোলিত ফুল্ল-নলিনীবৎ বালকের হিয়া থর-থর কাঁপিতেছে। বালক বক্তৃতায় শুনিল, ইংরেজী-মতে বিবাহ না করিলে, সংসারে সুখ হয় না; বাইশ বৎসরের বালিকাকে কুল-লক্ষ্মী না করিতে পারিলে কুলের উদ্ধার হয় না, বিবাহের অন্তত ছয় মাস পূর্ব্ব হইতে প্রণয়পাত্রীর নিকট আসা-যাওয়া না করিলে, প্রেম পবিত্র হয়

না। আর প্রণয়িনী ইংরেজীতে কথাবার্ত্তা কহিতে না জানিলে প্রণয়ে জমাট বাঁধে না। কু-লোকের নিকট বালকের এই কুশিক্ষা জন্মিল, ক্রমে সংস্কার বদ্ধমূল হইল;—বালক অধঃপাতে গেল। এমনও শুনিয়াছি, এক জন পমেটম মাখা, টেরি-কাটা পরিপক্ক বালক একবার পিতামহকে বলেন, "যে রমণী ভাল ইংরাজী না জানে, এবং সংস্কৃতেও যাঁহার জ্ঞান কম, তাঁহাকে আমি বিবাহ করিতে প্রস্তুত নহি।" পিতামহ বলিলেন, "ভাই, হে, বিদ্যাসাগর এবং টনি সাহেবকে একত্র না করিলে ত বিবাহ দেওয়া হয় না।" একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার অষ্টম বর্ষীয়া কন্যাকে বিদ্যালয়ে পড়িতে দেন। বাটীতে দুর্গোৎসব উপস্থিত, পিতা, জগন্মাতা দশভুজাকে প্রণাম করিলেন—অষ্টম-বর্ষীয়া পণ্ডিতা কন্যা বলিয়া উঠিলেন, "ছি বাবা! তুমি মাটির পুঁতুলকে প্রণাম কর! গুরু মা বলিয়াছেন, ঈশ্বরকে কেহ দেখিতে পান না, তিনি নিরাকার।" পিতা বলিলেন, আমার দোষেই তিনি নিরাকার হইয়াছেন; ভুদিন স্কুলে গিয়া তুমি যে শুকদেব গোস্বামীর মত "যোগ" শিখিবে, তাহা আমি জানিতাম না। এ সকলই ঘুঘুগণের "ঘুঘু" ডাকের ফল। অধিক কথা বলিব না, বালকগণ যেন বাস্তুঘুঘু দেখিলে একটু সাবধান হয়েন।

কুরুচি।

আজকাল এক আধ জনকে রুচি-রোগে ধরিয়াছে। রুচি-রাজ থাকিয়া থাকিয়া যেন চমকিয়া উঠিতেছেন, বাপরে! ঐ কুরুচি ঐ বাঘ—খেলেরে খেলে! ইহা মস্তিষ্কের বিকৃতি, হৃদয়ের পক্ষাঘাত ভিন্ন আর কিছুই নহে।

কোন বিষয়েই অতি বাড়াবাড়ি, কিছু নয়,—অতি-শব্দটা অনেক সময়েই খারাপ। অতি-মানে কুরুরাজ দুর্য্যোধন রাজ্য হারাইলেন, অতি-দানে বলিরাজ পাতালে গেলেন, অতি-ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বে য়িহুদিগণ বাস্তু-ভিটা-ছাড়া হইলেন, অতি তেজ-গর্ব্বে ফরাসীর বিষদন্ত জর্ম্মাণীর নিকট ভগ্ন হইল। আর অতি রুচি-রুচি করিয়া কতকগুলা লোক আজ আত্মঘাতী হইতে বসিয়াছে। ইহাদের মনের মতলব কি, তাহা জানি না; তবে এই বুঝি, রোগ বড় বিকট।

রৌচিক পুরুষের লক্ষণ,—মুখ খুব গম্ভীর, হাসি একবারে নাই, দূর হইতে দেখিলে বোধ হইবে, যেন ইহাঁর পুত্রটী অদ্য যমালয়ে গিয়াছে; অথবা নারিকেল গাছে যেন বাজ পড়িয়াছে, পুরুষ-প্রবর অতি ধীরে ধীরে, সতর্কতার সহিত ভাবিয়া চিন্তিয়া চিবাইয়া চিবাইয়া কথা কন,—পাছে কুরুচি আসিয়া পড়ে। যদি কেহ একটু হাসি-হাসি মুখে, তাঁহার নিকট গল্প করিল, "নদীর ধারে বাগানে বেড়াইয়া মন বড় প্রফুল্ল হইয়াছে!" রুচি-অবতার এই কথা শুনিয়া অমনি শিহরিয়া

উঠিলেন,—"হায়, হায়! কি করিলে বন্ধু!—একে নদীর জল ধীকি ধীকি বহিতেছে—তার উপর আবার বাগান, অবশ্যই সেখানে মল্লিকা, মালতী, যুঁই ফুল ফুটিয়া ছিল,—বন্ধু! বল দেখি, কি সর্ব্বনাশ করিয়াছ। সে যাহা হউক, সেখানে যখন তোমার মনে কুরুচি ভাব উদয় হইয়াছিল, তখন তিন বার তুমি জ্যোতির্ম্ময় পরব্রহ্মের নাম উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিয়াছিলে কি?"

এত ভয় কেন? আমরা জানি, এমনও কেহ কেহ আছেন, যিনি প্রকৃত কুরুচির কার্য্যে যত বেশী লিপ্ত, তিনিই কথিত কুরুচি কথায় তত বেশী আতঙ্কগ্রস্ত! কোন নগরে একজন বাবাজী বাস করিতেন; প্রকাশ ছিল; লক্ষ হরিনাম না করিয়া তিনি জল গ্রহণ করিতেন না, আর লোক দেখিলেই উচ্চরবে "রাধে, রাধে, রাধে" বলিয়া উঠিতেন। ক্রমশ তাঁহার হরিনামের ঝুলি কিছু অধিক লম্বা হইতে লাগিল, তিলক ফোঁটা, কণ্ঠিমালা কিছু অধিক বৃদ্ধি পাইল। শেষে জানা গেল, প্রথম তিনি পাড়ার একজন মাত্র বৈষ্ণবীকে অনুগৃহীত করিতেন,—এখন শত্রুর মুখে ছাই দিয়া, তিন চারি জন তাঁহার অনুগ্রহের পাত্রী। কোন কোন নব্য বাবু ঠিক ঐ বাবাজী-প্রকৃতিক হইয়াছেন, স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার-হেতু, পরের কুলবধূকে ক্রমে যত অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত গোপনে লেখা পড়া শিখাইতে আরম্ভ করিলেন, ততই দিবসে লোকালয়ে তাঁহার রুচি-মাহাত্ম্যের বক্তৃতা বাড়িতে লাগিল। কেহ

যদি তাঁহাকে বলিল, "কদম্ববৃক্ষ" তাহার উত্তর হইল, "ছি ছি! ও কথা মুখে আনিও না,—কদম্ব নাম করিলেই আমার মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণ মোহন বাঁশী হাতে করিয়া আড় নয়নে গোপিনীদের পানে চাহিয়া আছেন—ক্রমে বস্ত্র-হরণেরও সব কথা স্মরণ হয়।" কদম্ব বলিলে, বরং রক্ষা আছে, দাড়িম্ব বলিলে, একবারেই মূর্চ্ছা, বুঝি বা ডাক্তার ডাকিতে হয়। কোকিলের কূজন, ভ্রমরের গুঞ্জন, ফুলের ফোটন সবই কুরুচি। জলাতঙ্ক রোগীর ন্যায় রমণীর নামে, মুচকি হাসির নামে, তিনি কেবল চম্‌কে চম্‌কে উঠিতেছেন। অপরাধী ব্যক্তি, চিরকালই লাল পাগড়ী কনষ্টবল দেখিলে, মনে করে, বুঝি আমাকেই ধরিতে আসিতেছে!

আবার কতকগুলি সুশীল সুবোধ ছেলে হ্যাপায় পড়িয়া, স্রোতে ভাসিয়া—কুরুচি, কুরুচি আরম্ভ করিয়াছে। তাদের কিছু দোষ নাই, তরলচিত্তে, যা শুনে তাই শিখে। ফল কথা, এইরূপ ভণ্ডামির বড় বিষম ফল ফলিবে। যে ব্যক্তি, সংস্কৃতের কিছুই জানে না, কবিত্ব-রস কিছুই বুঝে না, সেও আজকাল বলিতে আরম্ভ করিয়াছে,—কালিদাসের কাব্য অপাঠ্য, কারণ কালিদাস কুরুচি! যে মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বে ভগবদ্‌গীতা আছে, শান্তি-পর্ব্বে যোগ-কথন আছে, সে মহাভারত অপাঠ্য;—কেননা মহাভারতে, কুমারীকালে কুন্তীর সূর্য্যসঙ্গম ঘটিয়াছিল, পাণ্ডুর মাদ্রী-সহবাসে মৃত্যু হইয়াছিল;—রামায়ণও অপাঠ্য, কেননা রামায়ণে রম্ভাবতী হরণের কথা আছে।

তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছে, থিয়েটার কুরুচি, বাইনাচ কুরুচি। রঙ্গভূমের সীতা দেখিলে, যাঁহার মনের ভাব বিকৃত হয়, বাইজির হস্তদোলন দেখিলে যাঁহার হৃদয় ভয়ে থর-থর কাঁপে, তাঁহাতে মনুষ্যত্ব কম,—পশুত্বের প্রাধান্যই বেশী। পশুভাব প্রবল না হইলে মন সহজে ও-রকম খারাপ হইবে কেন? যে সমাজে এইরূপ পশুভাব যত অধিক, সে সমাজে উন্নতি ততই কম। যে সমাজে পশুত্ব অধিক, সে সমাজে সাহিত্যের তেজ থাকে না, ভাল কাব্য রচিত হয় না, সেক্ষপীয়র জন্মগ্রহণ করেন না; সে সমাজে সূক্ষ্মশিল্প লোপ পায়, চিত্রকার্য্য অধোগতি প্রাপ্ত হয়। ভাস্কর-বিদ্যা অবনতির চরমসীমায় আনীত হয় Ecce Home প্রণেতা তাঁহার Natural Religion নামক পুস্তকে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল;

First there is the great ideal of the artist. He has long cherished a secret grudge against Morality. The prudery of virtue is his great hinderances. He believes, that it is our Morality which prevents the Modern world from rivalling the arts of Greece. He finds that even the individual artist seems corrupted and spoiled for his business. If he allows Morality to get too much control over him. The great Master, he notices, show a certain indifference, a certain superiority to it, often they audaciously defy it." Natural Religion. P. 120—121

ভণ্ড রুচিওয়ালাদিগকে বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এইরূপ মিষ্ট কথাগুলি উপহার দিয়াছেন ;—

"প্রফুল্লের মুখে একটু ঘোমটা ছিল—সেকালের মেয়েরা একালের মেয়েদের মত নহে—ধিক্ এ কাল! তা সে ঘোমটা টুকু, প্রফুল্লকে ধরিয়া বসাইবার সময়ে সরিয়া গেল— ব্রজেশ্বর, দেখিল যে, প্রফুল্ল কাঁদিতেছে! ব্রজেশ্বর না বুঝিয়া সুঝিয়া আ! ছি! ছি! ছি! বাইশ বছর বয়সেই ধিক্! সেই ব্রজেশ্বর না বুঝিয়া সুঝিয়া, ভাবিয়া চিন্তিয়া, যেখানে বড় বড় ডব্ ডবে চোখের নীচে দিয়া এক ফোঁটা জল গড়াইয়া আসিতেছিল—সেই স্থানে আ! ছি! ছি! ব্রজেশ্বর হঠাৎ চুম্বিত করিলেন। গ্রন্থকার প্রাচীন—লিখিতে লজ্জা নাই— কিন্তু ভরসা করি, মার্জ্জিতরুচি নবীন পাঠক এইখানে এ বই পড়া বন্ধ করিবেন।"

সকল বিষয়েই মাত্রা, ওজন, পরিমাণ আছে। সংসারে যদি রস-রহস্য বাদ দিয়া ; শকুন্তলা, ওথেলোর অগ্নিসংস্কার করিয়া ; দিন রাত কেবল,

"মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর"

আরম্ভ করি, তাহা হইলে বাস্তবিকই জগৎ মরুভূমিময় হয়, এক মহা শ্মশান বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

বালক।

কতকগুলা ছেলে বড় দুরন্ত হইয়া উঠিয়াছে। স্বভাব চরিত্র অতিশয় ঘৃণার্হ হইতেছে; যা মনে যায় তাই করে; গুরুজনের কথা গ্রাহ্য করে না—তাঁহাদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা নাই! সহর এবং পল্লীগ্রামের অধিকাংশ বালকই যেন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। পরিণামে যে কি হইবে, সে বিষয় তাহারা একদিনও ভাবে না, অথবা ভাবিতে জানে না।

১৫ বৎসর পূর্ব্বে যে বয়সের, যে শ্রেণীর বালকেরা গুরুজনের সাক্ষাতে অবনতবদনে থাকিত, এমন কি টেরি কাটিয়া বাহির হইতে লজ্জা বোধ করিত, এক্ষণে সেই শ্রেণীর বালকগণ অম্লানবদনে তাঁহাদের সহিত একত্র বসিয়া হুঁকা কাড়াকাড়ি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সতের আঠারো বৎসরের বালক কোথায় যত্ন করিয়া সারা দিন পড়াশুনায় মন দিবে;—তাহা না করিয়া ইয়ারকি এবং নেশার দিকে তাহাদের চঞ্চল-চিত্ত সতত ধাবিত হইতেছে। নেশা কি এক রকম;—মদ, গুলি, গাঁজা, সিদ্ধি—অনেককে এই চতুরঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টা বঁুদ হইয়া থাকিতে দেখা গিয়াছে; বলা বাহুল্য, তাম্রকূটধূমপান তাহাদের নিকট কোনরূপ নেশার মধ্যেই গণ্য নহে। এরূপও দেখা গিয়াছে, প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইতে হইতেই কতকগুলি বালক, মদ্য ও বেশ্যা—নেশাদ্বয়ে এরূপ মসগুল হইয়া উঠে যে, তাহারা যেন দিন রাত্রি অচেতন

কার্য্যে যদি বীরত্ব না হইবে, তবে ভব-সংসারে আর কিসে বীরত্ব প্রদর্শিত হইবে বল?

বীর বটেন, তৎপক্ষে কোন সংশয় নাই। কিন্তু মানুষ সর্ব্বগুণালঙ্কৃত হয় কি না,—তাই রাত্রিকালে কখন কখন কুল-বধূর সাহায্য ব্যতীত বাহিরে আসিতে মহাপুরুষদের গাটা কেমন ছম্ ছম্ করে; আর একলা বহির্গত না হওয়া বুদ্ধিরও কায বটে, কারণ ভূত ত মানুষ নহে, উপদেবতা; কাজেই দলবদ্ধ হইয়া তিমিরাবৃত রজনীতে প্রাঙ্গণে আসা মহাবুদ্ধির কার্য্য। অনেকে বলিতে পারেন, যদি তাঁরা প্রকৃত প্রস্তাবে বীর, তবে সাদা রঙের মানুষ, আর লালপাগড়ি দেখিলে তাহারা এত ডরায় কেন? তখন তাহাদের বাক্য নিঃসরণ হয় না কেন? অচল, জড় পদার্থের মত প্রতীয়মান হয় কেন? তাহার কারণ আছে; সাধারণ নিয়মকে বিশিষ্ট-রূপে বলবৎ করিতে হইলে, এক আধটা ব্যতিক্রম থাকা আবশ্যক। সুতরাং তাঁহাদের ভয়ই তাঁহাদের বীরত্বের পরিচায়ক; তাঁহারা নিঃসন্দেহ বীরপুরুষ। যে দেশের বালক এরূপ দুরাচার, অক্ষম, কাপুরুষ, কাণ্ডজ্ঞানশূন্য, সে দেশের কি আর মঙ্গল আছে? ছেলেপিলের যাহাতে স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন করা একান্ত কর্ত্তব্য।

শিক্ষা সহবৎ অভাবে বালকগণের এরূপ দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে। পিতা, মাতা—অভিভাবকগণ কিরূপে ছেলে মানুষ করিতে হয়, তাহা ভাল জানেন না। শিক্ষকও শিক্ষা

দিবার প্রণালী উত্তমরূপ জ্ঞাত নহেন; উচ্ছৃঙ্খল বালককে শাসনে রাখিতে অক্ষম।

না পড়ালি পো,
তো সহরতে খো।

জনক জননী, বঙ্গদেশের এ বহুপুরাতন কথাটী ভুলিয়া যাইতেছেন। কাযেই ছেলেগুলা একেবারে বহিয়া যাইতেছে। হুগলী, চুঁচড়া, কৃষ্ণনগর, বর্দ্ধমান প্রভৃতি সহরে বিদ্যালয় যে নিতান্ত কম আছে, তাহা নহে। যে গুলি আছে, সে গুলিতে ভাল রকম লেখা-পড়া শিখান হইলে বালকগণ এত খারাপ হইত না। অধিকাংশ শিক্ষকই যেন কলে হইয়া গিয়াছেন; বালককে শিক্ষা দিতে, সদুপদেশ দিতে তাদৃশ যত্ন করেন না। সুতরাং বালকের জ্ঞানার্জ্জনের দিকে মতিরতি হয় না, কেবল দুশ্চিন্তায় মন পূর্ণ হইয়া থাকে।

আর বাপ মা ছেলেকে এত আদর দেন যে, বয়োবৃদ্ধিসহকারে তাহারা গুরুজনের মাথায় চড়িয়া নাচিতে থাকে। আপনার ছেলেকে কে না ভাল বাসে? কিন্তু সেই ভালবাসার ছড়াছড়ি করিয়া পুত্রের ইহকাল পরকাল নষ্ট করা কি উচিত? এরূপ স্থলে জনক জননী "মা বাপ" নামের অযোগ্য। যদি বালককে সৎ-শিক্ষা দানের অভাব ঘটে, তবে পিতা শত্রু, মাতা বৈরী।

পল্লীগ্রামের বালক যে আর দুষ্ট হইবে, তদ্বিষয়ে বেশী কথা বলা বাহুল্য। দশখানা গ্রাম খুঁজিলে একটা পাঠশালা

মিলিবে না ; ৫০ খানা গ্রামের মধ্যে একটা ছাত্রবৃত্তির স্কুল দেখিতে পাওয়া যায় না ; এক সহস্র গ্রামের মধ্যে একটা এণ্ট্রেন্স স্কুল স্থাপিত হইলেই যথেষ্ট ; দরিদ্রের সন্তান, যাহারা সহরে যাইয়া লেখা-পড়া শিখিতে পারে না, তাহারা দিবা রাত্র হৈ হৈ করিয়া বেড়াইতেছে, পৃথিবীতে যত কুকর্ম্ম আছে, তাহারই অনুষ্ঠান করিতেছে।

পিতামাতাও অশিক্ষিত,—সন্তানের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা জানেন না। কাজেই বড় শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে। যে সকল শিক্ষিতলোক সমাজ-সংস্করণে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহারা কেবল বাল্য-বিবাহ বা বহু বিবাহের ভাবনা না ভাবিয়া, যাহাতে বঙ্গীয় বালকের রীতি চরিত্র শুধরাইয়া উঠে, সে বিষয়ে আর একটু যত্ন করিলে ভাল হয় না কি ?

রুচি-কাব্য।

প্রথম সর্গ।

আয়লো সুরুচি সতি ! অনূঢ়া অবলা,
থান-ফাড়া প'রে—মোটা, ঘন, লম্বাচৌড়া ;
কালকূট-ভরা কু-কণ্ঠের হও কর্ণধার,
দম, সতি ! দুরন্ত সরস রসনায়—
গাব আজ রুচি-রসে মহা ঋষি-গীত।

তুমিও আইস ভবে সরলতা সখি,
আবরিয়া চারু-অঙ্গ,—সিমিজে কামিজে—
মুখে দিয়া জাল,—যথা থাকে গুটিপোকা
গুটির ভিতর। উভয়ে উড়িয়া আজি
উদ্ধার এ দীন দাসে, এ গীত-সঙ্কটে।
দূর হও কলঙ্কিনী কু-রূপা কুরুচি,
কালাপেড়ে—পড়া; পায়ে মল শিরে সী থি
হাতে বালা, গলে মালা, নাকেতে নোলক,
পাণ-রাগে রঞ্জিত অধর টুক্ টুক্,
মিশি-দাগে কলঙ্কিত দন্তপাঁতি তোর,—
ছি ছি ছোঁব না তোরে,—চাব চক্ষু মেলি,
সাধু-হৃদি কাঁটা তুই, দূর হ'রে এবে।
প্রেম তুই দূরে যা; 'ভালবাসা' আসিস্
না কাছে; ভয় হয় ভাবিলে ও ভাব।
তুই ও-মা বীণাপাণি, ক্ষমা দে গো আজ,
বীণার ঝঙ্কার তোর কুরুচি আধার;
কটীতে কিঙ্কিনী-ধ্বনি, চরণে নূপুর—
(সাধু সঙ্গে থেকে) শুনে মা শিহরে সব
অঙ্গ,—কাঁপে হৃদি গুরু গুরু; যথা যবে
আশ্বিনের ঝড়ে রড়ে পড়ে কেঁপেছিল,
বাগানের কান্দি-পূর্ণ কলা-গাছ মরি!
বাজার মা বড় চড়া; আজিকার কালে

বিধি, বিষ্ণু, বামদেব কক্ষে নাহি পায় ;
ঊনবিংশ শতাব্দীর এই শেষভাগে,
হতেছে সত্যের জয় একটানা শুধু ;
জননি গো! ফিরে যা, এ ঘোর দুর্দ্দিনে,
শিক্ষা-গুণে রাঙ্গা-পদে বড় ভয় বাসি ;
সুরুচির শুভ্রকালে, আকাশের কোলে
চাঁদ! তুই ডুবে যারে ; নিবুক নক্ষত্র ;
চন্দ্রমা গো! হেসো নাহি আর রাঙ্গা রঙ্গে ;
বসন্তে বাসনা নাই, শীত হোক সদা ;
শুখাক্ কমলদল, শুখাক্ কুমুদ,
শুখাক্ নদীর জল, উড়ে যাক্ বালি,
পুড়ে যাক্ ফুল-কুল, কুঁড়ি কি ফুটন্ত,
কোকিল ভ্রমর দোঁহে বোবা হ'য়ে যাক্
আকার, ঈকার কিম্বা নীকার তীকার—
লোপ হোক্ আজ হ'তে সুরুচি-রাজত্বে।
বাজাও বিজয় ব্যাণ্ড, সুরুচির জয়ে।
আয়লো সুরুচি সতি! রেলি থান প'রে
কাতর কিঙ্করে রক্ষ, উদ্ধার সঙ্কটে।

ইতি প্রস্তাবনা নাম প্রথমসর্গ!

দ্বিতীয় সর্গ।

বসে আছে ভোলানাথ বিভোল হইয়ে,
—মিটি মিটি চায় কভু, কভু চোক বুজে,
বোতাম-বিহীন কপ, ঝল্ ঝল্ ঝোলে
জীবন-বিহীন ঘড়ি পকেটেতে দোলে,
কলপ-বিহীন গোঁপ সুবদনে সাজে ;
খাঁটী-হীরা-হীন আঙ্‌টা, অঙ্গুলীতে রাজে,
ধীরে ধীরে কথা কয়, বহে না নিশ্বাস,
পড়ে না পালক যেন, নাহি কাঁপে ঠোঁট—
মুখে নাহি হাসি কিম্বা দন্তের বিকাশ,
নত-শির বজ্রদগ্ধ আম্‌ড়া গাছ যেন।
আহা কি অপূর্ব্ব শোভা, সুরুচি-রাজত্বে,
ডাকে কাক, ডাকে বক, ডাকে কাদাখোঁচা,
চড়ুই, চামচিকা নাচে ঘুরিয়া চৌদিক ;
ফুটেছে ধুতূরা ফুল, শোভে ঘলঘসি ;
মাচায় উঠেছে পুঁই,—সুগম্ভীরে ধীরে।
হে দানবপতি ময় ! দ্বাপরের শেষে
তুষিতে পৌরবে, রচিলে অপূর্ব্ব সভা ;
তার শোভা কোন্ ছার এ শোভার কাছে ?
স্বভাবের শোভা এই, কৃত্রিমতা নাই।

মহা-ঋষি ভোলানাথ আরম্ভিল তপ,
যুক্ত করে, ঊর্দ্ধমুখে ব্যোম পানে চাহি,
চক্ষে বহে জল—জীবের উদ্ধার-হেতু।
দয়াময় দীনবন্ধু প্রভু! পার কর
এ ভব সাগরে, দুর্বিনীত দুষ্ট জীবে;
কু-কথায় কণ্ঠভরা, কু-চক্রী তাহারা
কথা নাহি শুনে মোর, না মানে আমায়,
(মৃত্যুকালে রোগী যেন ঔষধ না খায়)
—সংসারে একাকী আমি, বন্ধু-বল নাই,
কেমনে শাসিব কোটি কোটি জীবে
তাই আজি ডাকি তোমায় জগবন্ধু
"নর-বিপরীত—জাতির সে, নাম ধ'রে
ডাকে? শুনে লাজে মরি, অঞ্চলে লুকাই
মুখ; হৃদাকাশে কু-ভাবের কাল-মেঘ
হইলে উদয়, পোড়ে বক্ষ দাবানলে;
যথা যবে পরন্তপ পার্থ মহারথী,
যশোদাজীবন-ধন শ্রীকৃষ্ণের সাথে
দহিল খাণ্ডব বন, নির্ম্মূল করিয়া।
প্রভু! পারি না সহিতে আর ও কু—কথা,—
হিয়া জর জর;—ইচ্ছা হয় এই দণ্ডে
অসি করে ধরি, ধরিয়া চামুণ্ডা মূর্ত্তি,
বধি তারে রণে;———"

"হায় ? হায় ? কি কহিতে কহিনু ; ভুলে
গেছি যা ! "নর বিপরীতমূর্ত্তি !" ধরিব রে আমি !
রসনা ! খসিয়া পড়, কণ্ঠ ! রুদ্ধ হও,
ঠোঁট ! নড়িওনা—এপাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই !
কি কথা কহিনু। নিজ পদে মারিনু কুঠার
নিজ দোষে মুখ-পোড়া হনু মহাবীর—"
বলিতে বলিতে হায়, নয়নের বারি,
বিগলিত হলো, নিশ্বাস বহিল ঘন,
শোক-ঝড় উঠিল আকাশে ; ভোলানাথ
ভূমিতলে গেলা গড়া গড়ি ; কলেবর
ধূলায় ধূসর ; ফেনিল বদন ; জিহ্বা
পড়িল বাহিরি ; চেতনা নাহিক আর ;
পড়েছে জটায়ু যেন রাবণের বাণে,
যবে শ্রীরামের "নরবিপরীত মূর্ত্তি"
রাবণের রথে দেখি, যুদ্ধিলে জটায়ু।
কতক্ষণ পরে তবে পাইয়া চেতন,
ভোলানাথ দিব্য জ্ঞান লভি, ধীরে
বাম হাতে মলি দুই কাণ পুন সেই
হাত বুলাইল মুখে ; কার্য্য সিদ্ধি করি
ডান করে চাকু ছুরি দৃঢ়বদ্ধ ধরি
বলিল সক্রোধে "রে রসনে ! ফের্ যদি
শয়নে স্বপনে কিম্বা নিদ্রা অচেতনে

তাঁহাতে শারীরিক বল, আধিভৌতিক বল, না থাকুক; কিন্তু তাঁহার দেহাভ্যন্তরটা আধ্যাত্মিক তেজে ভরা। চব্বিশ ঘণ্টাই অগ্নিশর্ম্মা; মুখের কাছে, কথা কয়, সাধ্য কার; যেন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ—প্রতি লোমকূপ দিয়া সদাই যেন একটা ঝাঁজ বাহির হইতেছে। তিনি যখন তখন মুখে এইরূপ বুলি বলিতেন, "আমি কি কারো তোয়াক্কা রাখি; হক্ কথা বল্‌বো তা বাবাই হোক্ না কেন, আর গুরুই হোক্ না কেন?"

নীলমণি বাবু চিরকাল "ঘর-জামায়ে।" চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সে তাঁহার শুভবিবাহ কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। বিবাহের ক'দিন পরে, বা ক'সপ্তাহ পরে, তিনি শ্বশুরগৃহে এই চির-অবস্থিতির সূত্র পাত করেন, তাহা আমার জানা নাই। তবে এমনটা শুনিয়াছি, তিনি ফুলশয্যার পর দিনই, বাপের বাড়ী হইতে নবপরিণীতা স্ত্রীর সহিত এক পাল্কীতে শ্বশুরবাড়ী আগমন করেন; সেই দিন হইতেই তাঁহার "ঘরজামায়ে" কাজের সূত্রপাত।

নীলমণি বাবুর শ্বশুর সেকেলে সেরেস্তাদার। তালুক মুলুক আছে। এখন সুদি কারবারে খুব বড় মানুষ। কৌলীন্যের অনুরোধে তিনি নীলমণিকে জামাই করেন। জামাইকে ঘরে আনিয়া তিনি প্রথমে গ্রাম্যস্কুলে তাঁহাকে পড়িতে দিলেন। নীলমণি বাবুর পাড়াগেঁয়ে স্কুল মনে ধরিল না. কাজেই শ্বশুর তাঁহাকে হুগলীতে পাঠাইয়া মাসিক ২০৲ টাকা

ব্যয় করিতে লাগিলেন। লেখাপড়া শেষ হইলে, ঘরের জামাই শ্বশুরঘরেই ফিরিয়া আসিলেন। ক্রমে বয়স প্রায় ২৮ হইল। নীলমণি বাবুর ঘুম্ ভাঙ্গে বেলা আটটার সময়। তার পর তিনি মুখ হাত ধুয়ে চা খান। চা খাইয়া ভ্রমণে বহির্গত হন। বেলা বারটার সময় প্রত্যাগত হইয়া স্নানাহার পূর্ব্বক, দিবা নিদ্রায় অভিভূত হন। বৈকালে উঠিয়া পাশা খেলিতে বসেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই জলযোগ করিয়া, আবার পাশা এবং তামাকে মনোযোগ দেন। এক মটর আফিং খান। এইরূপে শ্বশুরের কার্য্য-উদ্ধার করিয়া নীলমণি বাবু দিন অতিবাহিত করেন।

নীলমণি বাবু নানাগুণে বিভূষিত। শ্বশুর তাঁহার উপর এত অত্যাচার করে, তথাচ তিনি শ্বশুরবাড়ীর উপর বিরক্ত হন না। তিনি আফিং সেবন করেন, রাত্রে দুই সের দুধের দরকার;—কৃপণ-শ্বশুর পাঁচ পোয়া বই দুধের বরাদ্দ করেন নাই! দিনের বেলা ভাতের সঙ্গে যে অন্তত এক ছটাক ঘি দিলে নীলমণি বাবুর সুবিধা হয়, পোড়া শ্বশুর তাহাও বুঝে না। নীলমণি বাবু এত ভালমানুষ যে, এসব মর্ম্মকথা শ্বশুরের সাক্ষাতে এক দিনও বলেন না; কেবল দুই একজন প্রিয়বন্ধুকে গোপনে বলেন,—"এমন ক'রে আর থাকা যায় না, আপনারা ভাল খাবেন, আর আমাকে কেবল পচা জিনিষ দিবেন।"

নীলমণি বাবুর পিত্রালয়ে যে কি আছে, তাহা কেহ জানে

না। তিনি সর্ব্বসমক্ষে বলেন যে, আমার বাপের বাড়ীতে বড় বড় ঘর আছে, বড় বড় বাগান আছে,—বড় বড় পুকুর আছে। সবই আছে, কেবল বাপের বাড়ীর বাপ্‌টী নাই। কিন্তু দুষ্ট লোকে কাণাকাণি করে, পিত্রালয়ে তাঁহার চাল চুলা নাই, ভিটা নাই, একটা ভেরেন্দা গাছও নাই।

বারমেসে কালী ঠাকুরুণ দেখিয়াছি, বারমেসে আম-গাছেরও নাম শুনিয়াছি। কিন্তু নীলমণি বাবুর মত বারমেসে জামাই পূর্ব্বে কখন দেখি নাই। পাড়ার লোকে তাঁহার "বারমেসে" নাম দিয়াছিল; তবে তাঁহার সাক্ষাতে কেহই সে নাম উচ্চারণ করিতে পারিত না। নীলমণি নাম একটু বাঁকা করিয়া বলিলেই তিনি ক্রোধে প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিতেন, বারমেসে জামাই বলিলে কি তিনি আর রক্ষা রাখিতেন? সকলকে একেবারে উবু-উবু গিলিয়া ফেলি-তেন। তবে অনেকে তাঁহাকে প্রকারান্তরে ঠাট্টা করিত। গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে কয়েকটী ভদ্রলোক বসিয়া আছেন; নীলমণি বাবু গিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। সকলে অমনি মহাসমাদরের সহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন,—"আসুন, নীলমণি বাবু, আসুন, আসুন, বোস্‌তে আজ্ঞা হউক"—আদরে নীলমণি অমনি গলিয়া গেলেন, তখন নীলমণিকে মধ্যস্থলে বসাইয়া সকলে তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিলেন। কোন ব্যক্তি অতি সজোরে চেঁচাইয়া ভৃত্যকে বলিলেন,—"—ওরে, শীগ্‌গির বাবুকে তামাক দে," ভৃত্য হুঁকায় জল পুরিয়া আমপাতায়

একটী নল করিয়া তামাক সাজিয়া আনিয়া নীলমণির হস্তে হুঁকাটী দিল। ১ম ব্যক্তি বলিলেন,—নীলমণি বাবু, ইহা কোথাকার আমপাতা জানেন না কি ?

নীলমণি। না, তাত জানি না বেশ ভাল পাতা বোধ হচ্ছে।

১ম। অতি উৎকৃষ্ট পাতা; আমার বারমেসে আম-গাছের পাতা কখন খারাপ হয় না।

নীলমণি। বারমাসই কি আপনার গাছে আম হয় ?

২য়। বারমাসই হয়, একটী দিনও কামাই নাই।

৩য়। অতি সুন্দর আম, বারমেসে গাছ—রোজ আম পেড়ে খাও।

নীলমণি। আমার বাপেরও একটা বারমেসে আমগাছ ছিল।

১ম। শুনেছি. শুনেছি—আপনার ৺পিতাঠাকুরের খুব এক বড় আম বাগান ছিল, বাগানের মধ্যস্থলে সেই বারমেসে গাছটী থাকিয়া বাগান আলো করিত। নীলমণি বাবু, সে বাগান এখন হলো কি ?

নীলমণি। আর কি বোলবো মোশাই, থাক্ সে কথা।— আমি কি এখন আর একটী আম চোখে দেখ্‌তে পাই—সে সব আম ভূতে লুটে খায়।

১ম। কেন নিজের বিষয় আশয় সম্পত্তি আপনি দেখেন না ? আপনার ত অনেক ক্ষতি হচ্চে, আমরা দেখিতেছি ! দেখে শুনে আমাদের কষ্ট হয়।

নীলমণি। ও ত শুধু আমগাছ; আমার বড় পুকুরের বড় বড় মাছগুলো কেবল না দেখার দরুণ মরে গেল।

২য়। আমাদের সকলের অনুরোধ,—আপনি একবার বাড়ী যান। আপনার বিষয় দেখুন, শুনুন, রক্ষা করুন, এরূপ সম্পত্তি না দেখিলে চলে কি?

নীলমণি। হুঁঃ আপনারা ত আমাকে যেতে বল্লেন,—আমাকে শ্বশুর ছেড়ে দেন কৈ?

৩য়। আপনি শ্বশুরের হাত ছিনিয়ে চলে যান, এতে যা সাহায্য করিতে হয়, তা আমরা করবো। পুলিশ-কেশ হয়, আমরা চালাবো। আপনি নির্ভয়ে চলে যান। শ্বশুর যদি এসে পথ আট্‌কান, আমরা যেয়ে তাঁহার হাত ধোরে পথ থেকে টেনে আন্‌বো।

২য়। শ্বশুরটার কি আক্কেল দেখেচো—জামাই বাবুকে আট্‌কে রেখেছে।

১ম। কাজেই আগুলে রাখতে হয়। বাবুকে না হ'লে যে শ্বশুরের একদণ্ড চলে না, সংসার অচল হয়—কাজেই নীলমণি বাবুকে আগুলে রাখ্‌তে হয়।

নীলমণি। ঠিক বলেছেন,—আমি না থাক্‌লে, এতদিন শ্বশুরের বিষয় আশয় সব মাটি হতো। এমন আর বিনা মাহিনার চাকর কোথা পাবেন?

১ম। আপনি এই ১৪ বৎসর কাল এখানে আছেন; মাসে যদি আপনি ১০৲ টাকা করিয়া পাইতেন, তাহা হইলে

আজ আপনার দুই হাজার টাকা হাতে হইত। আপনি নেহাইত ফাঁকিতে পড়িয়াছেন। শ্বশুরই আপনার পর-কালটা খাইল। আপনি আজই এখনই বাপের বাড়ী চলে যান। আমরা চাঁদা করিয়া আপনার রাহাখরচ দিচ্চি।

নীলমণি। (একটু বিচলিত হইয়া) আমিত পিত্রালয় যেতে অরাজী নই, তবে আমি গেলে শ্বশুরের কষ্ট হয় এই আমার দুঃখ। তা কালই যাবো,—শ্বশুর মহাশয়কে বুঝিয়ে বলে, কাল যাবো। আজ আমি তবে আসি। এই বলিয়া বেগে সেস্থান হইতে নীলমণি বাবু প্রস্থান করিলেন। এরূপ শুনা গিয়াছে, তিনি তিন মাস কাল সে পথ মাড়ান নাই!

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।

কাঁটা-আইন।

দয়াল বাবু খুব বিষয়ী লোক। সংসারের সারতত্ত্ব সমস্তই তিনি অবগত আছেন। তিনি বলেন, এ সংসারে সবই দোকানদারী। দুনিয়ার হাটে, আদান প্রদান এবং বেচা কেনা ব্যতীত আর কোন কথা নাই। মনুষ্য এ জগতে ব্যবসা করিতে আইসে, ব্যবসা শেষ হইলে চলিয়া যায়। মজা দেখুন, পৃথিবীর সকলেই ব্যবসাদার। হাকিম ব্যবসা-দার—পয়সা লইয়া বিচার-বিতরণ 'কাজে নিযুক্ত; উকীল ব্যবসাদার—পয়সা লইয়া মোকদ্দমা চালাইতে নিযুক্ত, প্রজা

ব্যবসাদার,—জমী চসে পয়সা রোজগারের জন্য; জমীদার ব্যবসাদার,—জমীদারী কেনে টাকার জন্য; রাজা ব্যবসাদার—রাজ্য জয় করে, টাকার জন্য; ফল কথা, পৃথিবীর সকলেই ব্যবসাদার। তবে আমাদের এ ব্যবসায় লোকের এত চোক টাটায় কেন? লোকে একটী আমের আঁটী পুঁতে—ভবিষ্যতে আম খাইবার জন্য, গাছটী জমা বিলি করিবার জন্য। গাছের গোড়ায় জল দেওয়া, ছাগল তাড়ানো,—সমস্তই সেই ভাবিফল আম্‌টীর জন্য। মানুষ, বিড়াল পুষে, ইন্দুর ধরিবার জন্য; কুকুরকে একমুটা অন্ন দিই, রাত্রিতে আমার বাড়ীতে সে পাহারা দেয় বলিয়া। আর এই যে আমার এত-কষ্টের-ছেলেকে মানুষ করিলাম,—ইহা কি বৃথায় যাইবে? দুধভাত খাওয়াইয়া যাদুমণির নবীন নধর গড়ন করিলাম, স্কুলে টাকা খরচ করিয়া একটা পাস করাইলাম,—এত পরিশ্রম এবং মূলধন খরচ হইল, সমস্তই কি আমার জলে পড়িবে? না, তা কখন হইতে পারে না; সংসারের তা নিয়ম নয়। ব্যবসায়ে চক্ষু লজ্জা করিলে, ধনী মাটি হয়। আর চক্ষু লজ্জাই বা কিসের? উচিত মূল্যে মাল বেচিবে,—তোমার পছন্দ হয়, প্রাণ চায়, তুমি লইবে; মনে না ধরে, ফিরিয়া দেখিবে। এ ব্যবসাদারী কাণ্ডে আমি কেন লজ্জাশীলা ক'নে-বৌয়ের মত ঘোম্‌টা দিয়া বোসে থাক্‌বো? খাইয়ে মাখিয়ে লিখিয়ে পড়িয়ে, সহবৎ দিয়ে, ছেলেটাকে তৈয়ার করিলাম, এখন তুমি বল কি না,—"আমার মেয়ের

সঙ্গে বিয়ে দাও, অধিক টাকা দিতে পারবো না।" কেন আমি কম টাকা লইব? ছেলে বিকায় না কি? আশ্বিন মাসের পূজার মর্‌শুমে কুটে পাঁটায় কড়ি হয়, আর এই অগ্রহায়ণ মাসে বিবাহব্যবসার ঘোর মর্‌শুমের সময়, আমার যাদুর নিশ্চয়ই দ্বিগুণ দর হবে,—বিশেষ, ইহা খাঁটী মাল, কোন ভেজাল নাই। হরলাল বাবুর মেয়েটী সুন্দরী বলে যে, আমার ছেলের দাম কম হইবে, তাহা কখনই নহে। সে সুন্দরী আছে, সেইই আছে—তাতে আমার কি? ভবিষ্যতে ছেলে চাকুরীদ্বারা রোজগার করিয়া আমাকে টাকা দিবে বটে,—কিন্তু ছেলের মধ্য-থাকের রোজগার আমি ছাড়ি কেন? আমি কিছু আর গয়াক্ষেত্রে পুণ্য করিতে আসি নাই যে, এখানে টাকা বিলাইব। দোকান খুলিয়াছি, জিনিষ সুমুখে সাজাইয়াছি, চুটিয়ে ব্যবসা চালাইব। বেচাকেনার সময় খাতির, লজ্জা থাকিলে, ব্যবসা চলে না।

বলি, তোমাদের এত হিংসা কেন? আমি মর্‌শুমে দু-টাকা রোজগার করিব, তোমরা তাতে বাধা দিবার কে? তোমরা নাকি বলে বেড়াও, পণ-প্রথা ভাল নয়, টাকা লওয়া ভাল নয়—কেন? তোমার নিজের ছেলে একটী তৈয়ারি হলে তখন বুঝ্‌তে পার্‌বে—টাকা লওয়া ভাল কি মন্দ? তোমরা নেহাইত অব্যবসায়ী, তাই ওসব কথা মুখে আনো। উপযুক্ত সন্তান থাকিলে, ওসব কথায় তোমাদের মনে কষ্ট হইত কি না, বুঝিতে পারিতে? আমিও উঠ্‌তি বয়সে

বলিতাম, পণ-প্রথা অতি জঘন্য। কিন্তু যখন ছেলেটী হলো, ঘি দুধ খাইয়ে ছেলেকে বড় করিলাম, তখন বুঝিলাম,—পণ-লওয়াকে খারাপ বলা কতদূর অন্যায়। বাপ্! প্রাণ থাক্‌তে কি, ও-জিনিষকে খারাপ বল্‌তে পারি? আর এখন দু-দশ স্থান হইতে ছেলের দর পাইয়াছি, এখন কি আর আমি ছেড়ে কথা কই? যখন ব্যবসা-বাণিজ্য শিখি নাই, তখন মূর্খের মত, "পণ-লওয়া ভাল নয়" বলা সহজ ছিল, কিন্তু এখন ব্যবসায়ী হইয়া অব্যবসায়ীর মত কথা কেমন করিয়া কহিব?

তবে তুমি একদিন বলিতে পার—"পণ লওয়া ভাল নয়।" সে কোন্ দিন? কোন উপযুক্ত সময়ে?—যখন আমার মেয়েটির বিবাহ দিই, তখন আমিই লোকের কাছে বলিয়া বেড়াইতাম, "হিন্দুসমাজে কি বিষম কুপ্রথা প্রচলিত দেখ-দেখি? মেয়ের বিবাহ দিব, গৌরী দান করিব, ইহাতে বরের বাপ বলে, আমাকে নগদ হাজার টাকা দাও। ছি! ছি! ছি!—এ পাপ প্রথা উঠাইবার জন্য পিনালকোর্টের ধারা বাড়ান উচিত।" কয়েক দিন মাত্র এই কথাটী লোকে আমার মুখে শুনিয়াছিল; যেন-তেন-প্রকারেণ যাই আমার মেয়ের বিবাহ হইয়া গেল, অমনি আমি নীরব—ও কথা আর ভুলেও মুখে আনিলাম না। এখন ও-আপদ্ বালাই—মেয়ে আর নাই—কেবল সারি সারি চারিটী ছেলে। এখন আমার পাথরে পাঁচ কিল। এখন আমার হাতে, রঙের গোলাম-নহলা-টেক্কা-সাহেব, আর একটী টেক্কা বড় পঞ্চাশ।

ব্যোমের তাস, আমি এখন ছাড়ি কি? আর, কোন্ পাষণ্ডের কথায় আমি এ সুখের খেল ত্যাগ করিব? এই আমার প্রথম ছেলের বিয়ে, কাঁটায় ওজন করে, সোণারূপার দানসামগ্রী গহনা নগদ টাকা লইব। কাঁটা এক চুল এদিক্ ওদিক্ হলে, সমস্তই ফেরত দিব। বঙ্গে এইরূপ নিয়ম বিধিবদ্ধ না হইলে আমার সুবিধা নাই। কারণ ক্রমান্বয়ে আমাকে এখন এ ব্যবসা চালাতেই হইবে। দেশহিতৈষিগণ আমার একটা বন্দোবস্ত করিয়া দিন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এখন কোথায়? শুধ্ বিধবার বিবাহের আইন জারি করাইলে ত চলিবে না, আমার জন্যও একটা আইন তৈয়ার করিয়া দিন। বঙ্গের অনেক বাপ মা আপনার উপর চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে! ব্যবস্থাসচিব হুইটলী ষ্টোকস্ আজ কোথায়? আপনি বিবাহের কাঁটা-আইন প্রচলিত করুন। তোমরা বুঝি মনে করিতেছ, এ আইনটী পাস্ হইলে কেবল আমারই উপকার! হুঁঃ কতলোক মনে মনে যে খুসী হইতেছেন, তাহা আর কি বলিব? আমি ত অদ্য কাঁটায় ওজন করিয়া পুত্রের বিবাহ দিলাম; কিন্তু ভাবনা ভবিষ্যতের জন্য। সেই জন্য বলি, যাঁহারা এ বিষয়ে ভুক্তভোগী, তাঁহারা সকলে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করুন। শীঘ্রই আমরা দলবদ্ধ হইয়া, সমস্বরে মুক্তকণ্ঠে, গবর্ণমেণ্ট সমীপে কাঁটা-আইন জারির জন্য প্রার্থনা করিব।

আইনত হইবেই! কতকগুলি মোটামুটী গার্হস্থ্য নিয়ম,

ছেলের বাপ্‌কে জানাইয়া রাখিব। বিবাহের এক বৎসর পূর্ব্বে হইতে, ছেলেটাকে মোটা করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। ছেলে দমে খুব ভারি হওয়া দরকার। এজন্য পুত্রকে ঘি, মাখন, ছানা, ননী, দুধ প্রচুর পরিমাণে খাওয়াইতে হইবে। অচিরে ছেলেটী, মোটা নাদুস্ নুদুস্ হইয়া উঠিবে; যত মোটা, তত লাভ। গ্রাম্‌ফেড্ মটন অধিক দরে বিক্রীত হয়। আর আমার এ মাখনফেড্ ছেলে অবশ্যই খুব চড়া মূল্যে বাজারে বিক্রয় হইবে।

যে উপায়ে হউক, ছেলেটাকে একটী পাশ করাইতে হইবে। ছেলেটীর এরূপ শিক্ষা দিতে হইবে যে, বর-দেখিতে আসিলে সে বলিবে, সোণার মই, সোণার ঘড়া এবং সোণার পাল্কী নহিলে, সে বিবাহ করিবে না।

একাদশী বাঁড়ুয্যে।

ধনকুবের বলিয়া বাঁড়ুযো মহাশয়ের খ্যাতি। লোকে কাণাকাণি করে, তাঁহার শয়ন ঘরে, মাটীর নীচে পোঁতা-টাকায় শেওলা পড়িয়া যাইতেছে। কেহ কেহ এমনও বলিয়া থাকেন, তাঁহার ঘরে একটী সুগভীর গুপ্ত কূপ আছে। তাহার প্রথম তবকে মোহর, দ্বিতীয় তবকে নবাবী আমলের গেঁড়ি টাকা, তৃতীয় তবকে সাহেবমুখো টাকা, চতুর্থ তবকে বিবিমুখো টাকা, সাজান আছে। তাঁহার কাছে একশত

লাখ, কি একশত কোটী টাকা আছে, এপর্য্যন্ত তাহার কিছুই স্থিরমীমাংসা হইল না।

ইহা ত গেল ভূ-গর্ভস্থ গুপ্ত টাকা। ইহা ব্যতীত বহিঃ-প্রদেশে বিস্তর টাকা ছড়ান আছে। কর্জ্জ দান করা তাঁহার জীবনের এক মহাব্রত। প্রায় চল্লিশ লাখ টাকা তাঁহার সুদী কারবারে খাটিতেছে। যাকে তাকে তিনি সহজে ধার দেন না। যিনি বিশেষ বিপদ্‌গ্রস্ত, তিনিই তাঁহার কর্জ্জদানের বিশেষ প্রিয়পাত্র। কাল অষ্টমের নিলাম, আজ জমীদার যদুনাথ বাবু গিয়া তাঁহার হাত দুটা জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে-ছেন, "বাঁড়ুয্যে মহাশয়, এবার আমাকে রক্ষা করিতে হইবে। আর দিন নাই, আজই আমাকে পাঁচ হাজার টাকা কর্জ্জ দিতে হইবেই হইবে। আপনি না দিলে আর উপায় নাই।"

বাঁড়ুয্যে। তাইত; টাকা ত আমার হাতে নাই। যা ছিল, সবই গিয়াছে, রামহরি বাবু সে দিন ষাট হাজার টাকা কর্জ্জ লইয়া গেলেন। বোল্‌বো কি, হাতে যদি আমার একটা কাণা কড়ি থাকে, তবে সে গো-রক্ত, ব্রহ্মরক্ত!

যদু। সে কি মহাশয়! আপনার হাতে টাকা নাই কি? আপনি না দিলে এখন যাই কোথা? দেখুন খুঁজে পেতে; আপনার অক্ষয়ভাণ্ডারে টাকা খুঁজলেই পাওয়া যাবে!

বাঁড়ুয্যে। আর কি সেকাল আছে? এ বৎসর যে কি করে সংসার চালাবো, তাই ভাব্‌চি! চাল, ডাল, তেল

সবই মাগ্‌গি ;—হাতে একটী পয়সা নাই ;—মেয়েদের কাছে হাওলাত করে, এ মাসের খরচ চালিয়েছি। বানে দেশ ভেসে গেল ; আমার নিজ জোতের জমীতে এক ছটাক ধান নাই। ভেবে ভেবে আমার গায়ের রক্ত শুকিয়ে যাচ্চে। শিরঃ-পীড়ার দরুণ কবিরাজ আমাকে মাথায় একটু বেশী তেল মাখিতে ব'লেছেন ; তা যদু বাবু আপনার কাছে এ কথা গোপন করে আর ফল কি ?—এ বছর আমি ভরসা করে মাথায় একটু বেশী তেল মাখিতে পারি না। সিঁড়ি ভেঙ্গে ছাদে উঠিতে হলে মাথা ঘোরে। তা কি করবো ? পয়সা নাই, দুর্বৎসরে কুলায় না, কাজেই কষ্ট করে থাক্‌তে হয়।

বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের প্রকৃত পক্ষেই গা ও মাথা রুখু। চুলগুলা ফর্ ফর্ করিতেছে। সত্য সত্যই জলপ্লাবনের পর দিন হইতে তিনি তেল মাখা কমাইয়াছেন। কোন দিন একটু তেল মাখেন, কোন দিন বা একেবারেই ফাঁক দেন। পায়ে, গ্রাম্যমুচির তৈয়ারি, মান্ধাতার আমলের এক জোড়া ছেঁড়া চটী জুতা। পরিধানের কাপড়খানি খুব মোটা,—দুই তিন স্থানে তালি দেওয়া, কিন্তু তাহা হাঁটুর নীচে অধিক নাবে নাই। তবে হরে দরে ঠিক আছে। ঐ মোটা ঘন কাপড় একটু পাত্‌লা হইলেই তাহা অবশ্যই ভূমিতলে লুটাইত। হিসাবে গোল নাই ; তবে এ সব গূঢ়তত্ত্ব বুঝিবার জন্য একটু সূক্ষ্মবুদ্ধির আবশ্যক। এই নিদারুণ শীতকালে মোটেই তাঁহার গাত্র-বস্ত্র নাই। রাত্রে একখানি নিজহস্তে শেলাই-

করা কেঁথা গায়ে দেন। খুব ভোরে উঠিয়া, কোঁচার টেপ গায়ে দিয়া, সাজি হাতে করিয়া ফুল তুলিতে যান। এক এক দিন শীতে হি হি করিয়া কাঁপিয়া উঠিলে, তিনি স্বর করিয়া সংস্কৃত শ্লোক আওড়ানঃ—

শয়নে পদ্মনাভঞ্চ, ভোজনে চ জনার্দ্দনং।
দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দং বিপদে মধুসূদনং॥

হঠাৎ কারও সহিত তখন সাক্ষাৎ হইলে, তিনি বলেন, "কাপড় গায়ে দিয়া ত ফুল তুলিবার যো নাই; কি করি. কাযেই আদুড় গায়ে এ শীতে ফুল তুলিতেছি।" ফুল তোলার পরই গৃহে আসিয়া রোদে পিঠ দিয়া, তামাক খাইতে বসেন। দেখিতে দেখিতে ৯টা বাজিয়া যায়, সূর্য্যের তেজ প্রখর হয়। সুতরাং গায়ে বস্ত্র দিবার আর সময় হয় না। আর সন্ধ্যার পর বাহিরে তিনি কোন দিনই বসেন না। একবারে গৃহে গিয়া নিজকক্ষে সেই কেঁথা, গায়ে দিয়া, শুইয়া থাকেন। তবে লোকে বলে, তাঁহার অতি পুরাতন কাশ্মীরী একখানি শাল আছে। কিন্তু সে শালখানি আজ প্রায় বার বৎসর হইল, বাহিরে কেহ দেখে নাই; প্রবীণ ব্যক্তিরা বলেন, ৭১ সালের ঝড়ের বৎসর ঐ শাল তাঁহারা এক দিন দেখিয়াছিলেন। বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের একটী পুকুর আছে—তাহাতে বিস্তর বড় বড় মাছ! কিন্তু তিনি একটী মাছও ধরেন না,—বলেন, জীবহিংসা মহা পাপ! স্বয়ং কাঁচকলা ভাতে, খেসারির ডাল ভাতে, তেঁতুল গুলে ভাত খান,—আর বাড়ীর মেয়েরা লুকিয়ে

লুকিয়ে, বড় বড় মাছ ধরিয়া লুকিয়ে লুকিয়ে হজম করেন। কর্ত্তাটী যতই অহিংসা-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন, এ দিকে ততই পুকুরের মাছ কমিয়া যায়। গিন্নীটী, কর্ত্তাকে বুঝাইয়া বলেন,—মাছ সব ভোঁদড়ে খাচ্চে।

এখন আসল কথা। যদু বলিলেন, যদি পাঁচ হাজার টাকা না পারেন, আমাকে যেমন করিয়া হউক, আজ চারিটী হাজার টাকা দিতে হইবে।

বাঁড়ুয্যে। কি জানেন যদু বাবু, আমার হাতে ত একটী পয়সাও নাই। মেয়েদের কিছু টাকা আছে। তা মেয়েরা বেশী সুদ না হলে টাকা কর্জ্জ দেয় না। সুদই তাদের উপ-জীবিকা; আমার নিজের টাকা থাক্‌লে, টাকা-প্রতি মাসে দুই পয়সা সুদ দিলেই চলিত। মেয়েরা ত কারো কথা শুনে না, তারা চারি পয়সা সুদের কম টাকা ছাড়বে না।

যদু। বলেন কি মোশাই, আমি যে এক্‌বারে মারা গেলাম। এত সুদ দিতে হ'লে যে আমি সর্ব্বস্বান্ত হবো। একটু দয়া করুন—

বাঁড়ুয্যে। সুদই আমাদের সম্বল। আমার জমীদারী নাই, লাখরাজ নাই, বাগান নাই, অধিক কি, যে দুবিঘা জমী ছিল, তাহাতেও এবৎসর ধান নাই। একজনকে দশটাকা দান করিতে পারি, কিন্তু সুদের একটী পয়সাও ছাড়িতে পারি না। নদে জেলার রামহরি ঘোষালের সহিত আমার বরাবর কারবার চলিয়া আসিতেছে; এই পূজার পূর্ব্বে তাঁর

কাছে সাড়ে আটশত টাকা দশ আনা আড়াই পয়সা সুদের পাওনা হলো। তিনি বলেন, আড়াই পয়সা আর দিব না; আমি বলিলাম, মহাশয় মাপ করিবেন, সুদ কম লওয়া নীতি-বিরুদ্ধ। এক জনের কাছে কম লইব, অপরের কাছে বেশী লইব—ইহা বড়ই অন্যায় কথা। লোকে আমাকে জুয়াচোর, ঠক বলিতে পারে। বিশেষ, এখন যদি আপনার কাছে কমসুদ লই, তাহা হইলে রামহরি ঘোষাল মহাশয় বড়ই দুঃখিত হইবেন।

যদু। বাঁড়ুয্যে মহাশয়! আপনি এ কথা রামহরি ঘোষা-লকে নাই বা বলিলেন? আমাকে কমসুদ দিলে কেহই জানিতে পারিবে না।

বাঁড়ুয্যে। (হাহা করিয়া হাসিয়া) এখানে কেউ না জানিতে পারেন—সেই অন্তর্যামী ভগবান্ ত সব জানিতে পারিবেন। পাপ ত মনে। তা হবে না—আজ টাকা প্রতি চারি পয়সা সুদ দিলে, মেয়েদিগকে বুঝাইয়া, বহুকষ্টে আপ-নাকে পাঁচ হাজার টাকা এনে দিতে পারি।

যদু। না হয়, মোশাই তিন পয়সাই নেবেন, চারি পয়সা সুদ লইলে একেবারে মারা যাব।

বাঁড়ুয্যে। তা হবে না, আমি কথার ঠিক রাখি। আমার কাছে কস্মিন্ কালে আপনি দু কথা পাবেন না। কথার যার নড়-চড় হয় সে মনুষ্য-মধ্যে গণ্য নহে। আমার মরা বাপ যদি ফিরে এসে বলেন পৌণে চারি পয়সা সুদ লও, তাহা হইলেও রাজি হই না।

যদু। (যোড়হাতে) আপনি আমাকে এ যাত্রা রক্ষা করুন—আপনার আমি পায়ে ধরে—

বাঁড়ুয্যে। ছি ছি! আপনি অতি বড় লোক, সম্ভ্রান্ত কুলীন। আপনার খেয়েই আমরা মানুষ। আমি আপনার চাকরেরও যোগ্য নই। আমি গরিব মানুষ, আমার কাছে কি আপনার হাত যোড় করিতে আছে?

যদু বাবু গতিক দেখিয়া নীরব হইলেন। তখনই জমীদারী বন্দক দিয়া যদু বাবু, বাঁড়ুয্যে মহাশয়কে খত রেজষ্টরি করিয়া দিলেন। অমনি পাঁচটা তোড়ায় পাঁচ হাজার টাকা বাঁড়ুয্যে মহাশয় গণিয়া দিলেন। যদু বাবু বলিলেন, "আপনার ঘরে নোট নাই কি?

বাঁড়ুয্যে। নোট আমি বুঝি না। আমার নগদ টাকার কারবার।

যাত্রাকালে যদু বাবুকে বাঁড়ুয্যে বলিলেন, "এক ছিলিম তামাক খাইয়া যান—বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহর হলো।" যদু বাবু তখনও বাসিমুখে একটুও জল দেন নাই,—স্নান আহ্নিক করেন নাই, বিষম বিষয়-চিন্তায় অন্তরটা তাঁর ধুক্ ধুক্ করিতেছে, তিনি আর পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিলেন না, বেগে অষ্টমের টাকা লইয়া প্রস্থান করিলেন।

একটা বড় গোলের কথা আছে। বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের নাম কেহ জানে না। সকলে তাঁহাকে একাদশী বাঁড়ুয্যে বলে। দশ খানি গ্রামে, অথবা বঙ্গের সর্ব্বত্রই তাঁহার ঐ

নাম রাষ্ট্র। ক্রমে আসল নাম লুপ্ত হইয়া ঐ নামই প্রচার হইয়াছে। ফল কথা, তাঁহার পিতৃদত্ত আদত নাম তাঁহার গৃহিণী ব্যতীত আর কাহারও স্মৃতিপথে আছে কি না সন্দেহ। বাঁড়ুয্যে মহাশয়কে কেহ একাদশীই বলুক, আর পূর্ণিমাই বলুক, অথবা ধরিয়া কেহ দু-ঘা জুতাই মারুক, কিছুতেই তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই; কড়ায় গণ্ডায় কাগ ক্রান্তিতে তিনি হিসাব করিয়া সুদ পাইলেই মহাসন্তুষ্ট। কিন্তু দুষ্ট লোকে তাঁহাকে দেখিলেই আপন মুখটা অমনি কাপড় দিয়া ঢাকিয়া ফেলে। তাস খেলিতে খেলিতে যদি একপক্ষ চারিখানা কাগজ ধরে, অপর পক্ষে তৎক্ষণাৎ "একাদশী-বাঁড়ুয্যে-রবে" সেই তাস চারিখানায় একবার হাত বুলাইয়া দেয়। এমনি তাঁহার নাম-মাহাত্ম্য, নিশ্চয়ই সেই চারিখানা তাস উঠিয়া যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে বাঁড়ুয্যে মহাশয় একজন দেশবিখ্যাত সিদ্ধপুরুষ হইয়া উঠিয়াছেন। ইতিহাসে তাঁহার নাম উঠিবে কি না, ঐতিহাসিকগণ এখন কেবল দিবারাত্র এই ভাবনাই ভাবেন।

দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত!

বাঙ্গালী-চরিত।

তৃতীয় ভাগ।

বিষের লাড়ু।

বাঙ্গালার "শিক্ষিত বাবু", বাহ্য চাকচিক্যে ভুলেন। টুক্‌টুকে মাখালফলে তাঁহার মন মোহিত হয়। কোন্‌টা সোণা, কোন্‌টা পিতল;—তিনি চিনিতে সক্ষম হন না। ঝক্‌মকে গিল্টির গহনা, এবং ঝুঁটা মুক্তা পাইয়াই তিনি মহাসন্তুষ্ট। অধিক কি, মধু মাখাইয়া তাঁহাকে যদি বিষের লাড়ু দেওয়া যায়, তাহাও তিনি অসঙ্কুচিত চিত্তে উদরসাৎ করেন। আপাতত মুখমিষ্ট, মুখরোচক হইলেই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট। কাণ্ডজ্ঞানহীন শিশুতে এবং বাবুতে প্রভেদ বড় কম। শিশু, বিষাক্ত সর্পের গায়ে হাত দিতে ভয় করে না, কেউটে সাপের বাচ্ছা লইয়াও খেলা করিতে আমোদ পায়। বাবুও তাই।

শিখিয়া পড়িয়াও বাবু শেষে আস্ত গোরা। একটা

গল্প বলি। ৫৭ সালের সিপাহীযুদ্ধের সময়, চুঁচুড়ার বারিকে একদল খাঁটি গোরা আসিয়া অবস্থিতি করিল। রাঙ্গামুখ, যণ্ডা যণ্ডা চেহারা, গোঁয়ারগোবিন্দ, কিছুতেই দৃক্‌পাত নাই,—সেই গোরাগুলা ক্ষুধার্ত্ত নেক্‌ড়ে বাঘের মত হুগলী চুঁচুড়ায় উপদ্রব আরম্ভ করিল। দিনে ডাকাতি সুরু হইল। আজ তাহারা কাপড়ের দোকান্ লুট করে, কাল তাহারা গৃহস্থের ঘরে ঢুকিয়া বাক্স ভাঙ্গিয়া টাকা লয়। ময়রার দোকানে সন্দেস, রসগোল্লা, কচুরি প্রভৃতি ত সুসজ্জিত রহিয়াছে; আট দশ জন গোরা হাঁই-হাঁই খাঁই-খাঁই শব্দে দোকানে গিয়া পড়িল; কথা নাই, বার্ত্তা নাই, অমনি গোগ্রাসে টপ্‌টাপ্, গুপ্‌গাপ্ হুপ্‌হাপ্ রবে মিষ্টান্ন উদরস্থ করিতে লাগিল। ঠিক যেন রাক্ষসের দল। ইহাদের ভয়ে পুলিশ সশঙ্কিত, মাজিষ্টর চমকিত। কেহই আঁটিতে পারে না। একদিন একটা পুরাণ ভাঙ্গা বাড়ীর ভিত হইতে কতকগুলা গোখুরা সাপের বাচ্ছা, এবং গোটা দুই বড় গোখুরা সাপ বাহির হইয়াছে। বিস্তর লোক তথায় জমিয়াছে; মালেরা বহুকষ্টে বহুকৌশলে সাপ ধরিতেছে। গোরাগুলা মনে করিল, অবশ্যই এখানে কোন খাবার সামগ্রী, অথবা কোন বহুমূল্য জিনিষ আছে। তাহারা সমস্ত লোককে ধাক্কা দিয়া, ঘুষা মারিয়া, লাথি মারিয়া, তাড়াইয়া দিল। মালও, সাপ ফেলিয়া পলাইল। সতেজ, সাদা, সুলম্বা, কোনটা বা কুণ্ডলীকৃত, কোনটা বা চক্র ধরিয়া দোদুল্যমান—সর্পগণের

এই নানা মূর্ত্তি দেখিয়া গোরাচাঁদেরা ভাবিল, বুঝি ইহা কোন আশ্চর্য্য, অদ্ভুত জীব—বহুমূল্যবান্ এবং জনসমাজে বিরল। গোরাগণ লম্ফে ঝম্ফে, আনন্দ-উৎসাহে ছোট ছোট সাপ ধরিতে আরম্ভ করিল। কোন গোরা একটা সাপের চুম খাইল; সর্পও কুট্ করিয়া মুখে কামড়াইয়া, চুম্বনের শোধ চুম্বন দিল; গোরা-মহলে একটা হাসি উঠিল। কেহবা একটা সাপ ধরিয়া মাথায় রাখিল। কেহবা সাপের গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। ভারি আনন্দ, ভারি হাসি, ভারি তামাসার ধুম পড়িয়া গেল। কিন্তু দশ মিনিট মধ্যে মহাবিষে জর্জ্জরিত হইয়া গোরাগণ ভূতলশায়ী হইল। আমোদ ফুরাইল, উচ্ছ্বাস ফুরাইল,—প্রাণপাখী দেহ হইতে উড়িয়া গেল।

বাবুগণেরও পরিণাম অন্তিমে ঐরূপ। নূতন নূতন, গুল-বাহারে বিলাতী বিষের লাড়ুর যেমন আমদানি হইতেছে, সুধা-বোধে বাবুগণ অমনি তাহা উদরস্থ করিতেছেন। ফল-ভোগের বড় অধিক বিলম্ব নাই।

কুমুদিনী বাবু।

একখানি জাহাজ "স্বাধীনতা, সাম্য এবং ভ্রাতৃভাব",—এই ত্রিবিধ মাল বোঝাই করিয়া, লণ্ডন হইতে ছাড়িল ; ফরাসী এবং মার্কিণ দেশ হইতে আরও কিছু ঐ রকম মাল জাহাজে তুলিয়া লইয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া, জাহাজ শেষে কলিকাতায় আসিয়া পোঁছিল। বাবুরা গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়াছিলেন ; যথাসর্ব্বস্ব দিয়া, তাঁহারা ঐ বিলাতী মাল কিনিয়া ফেলিলেন ; সঙ্গে সঙ্গে মহারঙ্গে বুলি ধরিলেন, "সব সমান ; ব্রাহ্মণ শূদ্র আবার ভেদ কি ?"

আর একদল "বাবু আরম্ভ করিলেন,—"রাজা কোন হ্যায় ? রাজা, প্রজা, জমীদার, ব্যবসাদার, জমাদার, চৌকিদার, ঝড়ুবরদার—সব একই হ্যায় !"

তৃতীয় দল। চীন ব্রহ্মদেশ অসভ্য জাপান।
তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান ॥
দাসত্ব করিতে করে হেয়জ্ঞান।
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয় ॥

(অতএব) আজ হ'তে মোরা পেনু স্বাধীনতা।
না শুনিব ভবে আর কারো কথা ॥
নির্ভয়ে ভ্রমিব এবে যথা তথা।
নিশায় দিবায় লাজ পরিহরি ॥

কেড়ে লব কল্কে পিতৃহাত হ'তে।
সাক্ষাতে তামাক খাব বিধিমতে॥
পেয়েছি সভ্যতা, আমেরিকা-পথে।
স্বাধীনতা ধ্বজা করেতে ধরি॥

ঠাকুর কুকুর বামুন মেথর।
মুচি মুদ্দফরাস্, ক্ষত্র বৈশ্য নর॥
ভেদাভেদ নাই, সব একাকার।
সাম্যমন্ত্রে মোরা ধরেছি গান॥

দিবা দ্বিপ্রহরে যাব সোণাগাচি।
গাব, বিভুগান প্রেমমদে নাচি॥
ভুলাব বেশ্যায় করে ধরে যাচি।
ঘরেতে আনিব বিধু বয়ান॥

বসন্ত-বাহারে বাজাইব বাঁশী।
গৃহস্থ পাড়ায়, হাসি হাসি হাসি॥
উঠিবে উথলে অমৃতের রাশি।
কুলবধূ যত উধাও প্রাণ॥

তখন সজোরে মারিব রে টান্,
কুলের বন্ধন ছিঁড়ে খান্ খান্,
কুলবতী যত পাবে দিব্যজ্ঞান,
স্বাধীনতা রস অমনি দান॥

সধবা, বিধবা, সতী, কলঙ্কিনী।
সাধুর নন্দিনী, কিম্বা বিলাসিনী॥
সবাই সমান, সবাই প্রধান।
সবাই ত এক প্রভুর সন্তান॥
তবে কেন সবে হবে না এক?

ধিক্ হিন্দুকুলে? বীরধর্ম্ম ভুলে
আত্ম-অভিমান ডুবায়ে সলিলে,
নারীরে রেখেছে বন্ধনশৃঙ্খলে
সোণার ভারত করিতে খাক্!

বাজ্‌রে ফ্লুট্ বাজ এই রবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
দিক্ আমোদিত রমণী-সৌরভে,
বাঙ্গালিনী শুধু ঘুমায়ে রয়!

বাঙ্গালীর মেয়ে, চাবির ভিতরে!
দরজার ব্যা'র নাহি যেতে পারে!
পর-পুরুষের প্রণয়-জোয়ারে,
বাঙ্গালীর মেয়ে নাহিক সাঁতারে!—
এ দুখ কি মোর মরিলে যায়?

অতএব জাগ জাগ গো ভগিনি!
গড়ের মাঠেতে খেলগো রঙ্গিণি!

হাড়কাটা হ'তে লওগো সঙ্গিনী,
অচিরে ভারত উদ্ধার হবে।

বীর প্রসবিনী, আর্য্য কমলিনী,
ঘোমটা-আবৃত তার মুখখানি,
চির মেঘে ঢাকা, হায় দিনমণি,
জলে ডুবে গেছে প্রণয়-পদ্মিনী!
কত দিন আর এমনি যাবে?

চতুর্থ দল। ঠিক বলেছ দাদা, ঠিক বলেছ। মেয়ে পুরুষ সব একসা করে দাও—আমেরিকার দৃষ্টান্ত অনুসরণ কর। পথে ঘাটে, ঘরে বাহিরে, যেখানে সেখানে নরনারী হাত ধরাধরি করে বেড়াইতেছে। কলেজে, ছাত্র ছাত্রী এক বেঞ্চে ঘেঁসাঘেঁসি করে ব'সে, পড়া তৈয়ারী করে। আহা, সে কেমন দেশ! তাইত সে দেশের উন্নতি এত!

হোথা আমেরিকা—নব অভ্যুদয়,
পৃথিবী গ্রাসিতে করেছে আশয়,
হয়েছে অধৈর্য্য নারীবীর্য্য-বলে,
ছাড়ে হুহুঙ্কার, ভূমণ্ডল টলে,
যেন বা টানিয়া ছিঁড়িয়া ভূতলে,
নূতন করিয়া গড়িতে চায়।

এইরূপে চারি দল, বিলাতী মাল মাথায় করিয়া, বিলাতী মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, বিলাতী-ভাবে বিভোর হইয়া, জয়

ডঙ্কা বাজাইয়া, গঙ্গার ঘাট হইতে গৃহমুখে ফিরিতে লাগিলেন। এই চারি দলে এগারটী পুরুষ এবং পাঁচটী কন্যা। এমন সময় একজন তেজঃপুঞ্জ-কলেবর পুরুষ আসিয়া, তাঁহাদের পথ আগুলিয়া ধরিলেন। কুমুদিনী বাবু, এই চারি দলের অগ্রগণ্য। তিনি অতি ধীর, গম্ভীরভাবে, অর্দ্ধমুদ্রিত-নেত্রে, ঈষৎ নাকি স্বরে, কতকটা খাদে চিবাইয়া চিবাইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"মহাশয়! আপনি কে? কোন্ দেশে ঘর? একি? এ দারুণ শীতকালে, ডিসেম্বরের শেষে আপনার পায়ে এষ্টাকিন নাই কেন? জুতা যোড়াটীও দিশী কারিকরের তৈয়ারি দেখিতেছি—বাঙ্গালীরা এ জুতাকে চটী নামে অভিহিত করে। আ ছি! গায়ে কোট কৈ? ও, কি ওটা?—উঃ, পরিধানে কাপড়?—আপনি কি দেখিতেছেন না,—পঞ্চ রমণী আপনার সম্মুখে বর্ত্তমানা? রমণীর সাক্ষাতে দেশীয় বস্ত্রে অশ্লীলতা নিবারণ হয় না।"

তেজঃপুঞ্জ পুরুষ। মহাশয়, রাগ করিবেন না,—আপনারা হয় জুয়াচোর, নয় ভণ্ড। আপনারা বলেন, সব সমান, সব এক—বুদ্ধিটা আপনাদের বড়ই বিকৃত, নয় সাফ্ জুয়াচুরি!

কুমুদিনী বাবু। আপনি বৃদ্ধ, সেকেলে; ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা-আলোক আপনাতে নাই; আপনি কি ইংরেজীগ্রন্থ পড়িয়াছেন? দেখিতেছি, নাকে আপনার তিলক! কি কুসংস্কার! তাইত,—ঐ যে, মাথায় টীকিও

আছে!—আপনার সহিত গুরুতর সামাজিক বিষয়ে তর্ক করাই আমাদের অনুচিত। আচ্ছা, আপনি ত বাঙ্গালা জানেন, হিন্দুশাস্ত্রে কি এ কথা কখনও শুনেন নাই?—

আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ।

বৃদ্ধ। শুনেছি। একটা কথা বলি,—আপনি ত "যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ"; অতএব আপনি আপনার বাড়ীর মেথ্-রাণীকে বিবাহ করিতে রাজী আছেন কি না? ঐ শান্তিময় শ্লোকের গূঢ় অর্থ আপনি বুঝিতে অক্ষম, বুঝিবার আপনার অধিকার নাই। বলুন, সেই ভারবাহী বিধবা মেথ্রাণীকে আপনি বিবাহ করিবেন কি না?

পঞ্চকন্যার মধ্যে দুইটী কন্যা, একথা শুনিয়া shriek করিয়া উঠিলেন। ব্রীড়া-অবনতমুখে, চক্ষু মুদিয়া, ঈষৎ কাঁপিতে লাগিলেন। তখন দলস্থ অন্যান্য সন্তানগণ, তাঁহাদের কপোলে, শিরে, হস্তে, এবং গ্রীবা প্রভৃতি স্থানে, হাত বুলাইয়া রমণী-দ্বয়কে প্রকৃতিস্থ করিলেন।

কুমুদিনী বাবু বৃদ্ধের উপর ভয়ঙ্কর চটিলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল যে, তিনি সেই বৃদ্ধের বুকে সজোরে পদাঘাত করিয়া, রমণীদ্বয়ের মর্য্যাদা রক্ষা করেন। কিন্তু বৃদ্ধকে কিছু সবলশরীর, এবং শক্ত-প্রকৃতির লোক দেখিয়া, পদাঘাত-কার্য্যে আপাতত ক্ষান্ত দিয়া বলিলেন, "আপনার ত ভারি কুরুচি দেখিতেছি? ভারত-ললনার সাক্ষাতে বিবাহের কথা উচ্চারণ করিতে আছে কি? বিবাহ নামে মনে কি কুভাব

উদয় হয়, বলুন দেখি? এক বৎসর হইল, আমরা সকলে ডালিম খাওয়া বন্দ করেছি,—

বৃদ্ধ। বেদানাও কি বন্দ করেছেন?—

কুমুদিনী। বিদেশী বেদানা হইলে, ক্ষতি কি? শুধু ডালিম কেন, কদম গাছ দেখিলেই কাটিয়া ফেলি। কোকিল দেখিলেই গুলি করি। মৌচাক দেখিলেই ভাঙ্গিয়া দিই। মুচ্‌কি হাসি দেখিলেই, প্রবন্ধ লিখি।

বৃদ্ধ। অতি উত্তম কাজ! অচিরে ভারত-উদ্ধার হইবে! এখন ধলন্দা নামক গোলকধাম, আপনাদের বসবাসের উপযুক্ত ভুমি। আসুন আমার সঙ্গে, শীঘ্র পথ দেখাইয়া দিই।

কুমুদিনী। Old fool! that's downright insult—are we mad?—what do you mean by Dwalanda Lunatic Asylum?—be off, or else I shall kick you.

বৃদ্ধ। Cowards! তোরাও আবার লড়াই কর্‌বি নাকি?

কুমুদিনী। (একটু নরম হইয়া) অ্যাঁ, অ্যাঁ, আপনি ইংরেজী জানেন নাকি? বেশ, বেশ, আপনার সঙ্গে আমরা তর্ক করিতে প্রস্তুত আছি। আপনি অতি সুশিক্ষিত দেখিতেছি!—

বৃদ্ধ। রাজা কোন্ হ্যায়? এ কথাটা কি?

কুমুদিনী। আমরা Republican form of Government চাই। দেখুন আমেরিকায় United States এর রাজা নাই—প্রজারাই কর্ত্তা—মেয়ে পুরুষ সব সমান—লক্ষপতি ও দরিদ্র

সব সমান—দেখুন, সে দেশে কত সুখ, কত উন্নতি ; রেল-পথে, তার ব্যবসায়ে দেশের কত শ্রীবৃদ্ধি !

বৃদ্ধ। আপনাদিগকে বুঝান বড় বিষম। আপনারা জমাখরচ জানেন না, আপনাদিগকে অদ্য Astronomy বুঝাব কেমন করিয়া ? যার বর্ণপরিচয় হয় নাই, সে কি কখন দর্শন বুঝিতে পারে ? তবে আপনারা নাকি ইংরেজীভক্ত, তাই একটা কথা ইংরেজীতে আপনাকে বলি।—একটা প্রসিদ্ধ ইংরেজী-সংবাদপত্রের একজন প্রসিদ্ধ সম্পাদক যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পড়ুন দেখি ?

People who still remember the Philadelphia riots last year, when the streets of a great city ran with blood, because the feelings of the mob revolted against glaring miscarriages of justice and betrayed them into the energetic forms of remonstrance peculiar to Americans—those who thought over the strange confusions of right and wrong in that tumult and its suppression—may be interested to hear the brief veiws of an Anglo-Indian who has just visited some of the United States. A man with a wide experience of Europe and Asia, he writes—The whole thing is plainty on trial *i. e.* the whole fabric of Republican Government, and it does not give satisfaction I suspect. Clever men here (Americans) believe, that there will be another, and a bigger, civil war before the end of the century, which will be followed by a military Government. At present it is mob law ; striking, and organising to put down

strikes, lynching and violence. Life is far more insecure in the interior of Texas than in the Caucasus, Albania, Arabia, ect, ect. (countries which those people consider barbarous,) and the Texas administration is far more corrupt. No man with money or friends will be executed there, even if he shoots down people in the street in broad day ; the lawyers, after conviction will appeal, get fresh trials, change the venue, ets, etc, until they get him off. What will come of it ?—*The Pioneer November, 3rd, 1885,*

ঐ ইংরেজী কথা শুনিয়া, কুমুদিনী বাবু নীরব—ন যযৌ ন তস্থৌ। বৃদ্ধ তখন পথটী, দু-হাত দিয়া চাপিয়া রাখিয়া বলিলেন, "উত্তর দিয়া ঘরে যাও।"

গতিক বড় মন্দ বুঝিয়া, কুমুদিনী বাবু দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন। দলপতির পলায়ন দেখিয়া দলস্থ সকলেই ঊর্দ্ধ-শ্বাসে ছুটিল। কেবল পঞ্চকন্যা পথে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল, "ওমা, এখন আমরা যাই কোথা ?" বৃদ্ধের কি সামান্য কর্ম্মভোগ ! দুখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া, স্ত্রীলোকগণকে তিনি নিজ নিজ গৃহে পৌঁছাইয়া দিলেন।

বৃদ্ধ ব্যক্তি তারপর কুমুদিনী বাবুকে অনেক অনুসন্ধান করিলেন ; কিন্তু কোথাও খুঁজিয়া পাইলেন না। শুনা যায়, কুমুদিনী, বৃদ্ধকে দেখিলেই লুকাইতেন। পথে সাক্ষাৎ হইলে, দৌড়িয়া পালাইতেন। বৃদ্ধের ভয়ে কুমুদিনী সর্ব্বদাই সশঙ্কিত থাকিতেন।

ফটিক চাঁদ।

প্রথম কুসুম।

রামধন বাবু বিচক্ষণ ব্যক্তি। বৃদ্ধ বয়সে হরিনাম করেন, যথাসাধ্য দান-ধ্যান করেন, আর লোক-চরিত্র সমালোচন করেন। এ কালের নব্য বাবু দেখিলে তিনি তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া যান। বাঁকা সীঁথি, মুচ্‌কে হাসি এবং ইংরেজীর বুকনিযুক্ত বাঙ্গালা কথা, তাঁহার দু'চক্ষের বিষ। তিনি বলেন, "আমাদেরও ত একদিন চুল ছিল; কিন্তু অমন ত্রিভঙ্গ ভাবে টেড়ি কাটিয়া, লেবেণ্ডারের ছিটে দিয়া পকেটে রুমাল গুঁজিয়া, হাতে ছড়ি ধরিয়া, বুক ফুলাইয়া, ঈষৎ বাঁকা হইয়া, পথ দিয়া ত কখনও চলিয়া যাইতাম না। এখন, এ-মোশাই কালে কালে কতই দেখ্‌তে হলো;—রাঁধুনীর ছেলের পকেটে ঘড়ী! আর বাবুভেয়েদের রংদার, ঝক্‌ঝকে সোণার চেনের বাহার দেখে কে? কাহারও কাল চাপকানের উপর যেন একটা ঢোড়া সাপ পড়িয়া আছে। কেন বাপু, পুরুষমানুষের এ গহনা-পরা কেন? হাতে আংটী, নাকে সোণা-বাঁধান চসমা, জামার বোতামে সোণার শিকল, জুতায় রূপার বগ্‌লস—এ সব মেয়েলি ছাঁদ কেন? আগে কি আমরা সুখে থাকি নাই? তখন আমাদের প্রাণটা কি দুঃখে বাহির হইয়া গিয়াছিল? দেখে শুনে হাড় জ্বলে গেলো! ছেলেগুলোর বেয়াদবী দেখে মনে হয় যে, গলায় দড়ি দিই!"

দীননাথ ঘোষাল গ্রাম্য পুরোহিত। সাদাসিধে লোক। বিশ ত্রিশ ঘর যজমান আছে, পূজা হোম যাগ দেবার্চ্চনা করিয়া তিনি পরমানন্দে কালাতিবাহিত করেন। তিনি রামধন বাবুর বিশেষ অনুগত। সন্ধ্যার পর দু'জনে বৈঠকে বসিয়া সংসারের নানা কথার বাদানুবাদ হয়। বলা বাহুল্য, ঘোষাল মহাশয় কখন ইংরেজী পড়েন নাই; রামধন বসুজার অল্প-স্বল্প সেকেলে ইংরেজী জানা আছে। উভয়ের মধ্যে মনের মিল খুব।

একদিন ঘোষাল মহাশয় সন্ধ্যার পর হন্ হন্ করিয়া রামধন বাবুর বৈঠকখানায় উপস্থিত। রাগে তাঁহার সর্ব্ব শরীর কাঁপিতেছে। আসিয়াই, বসুজাকে বলিলেন,—"সব সহ্য যায়, কিন্তু কুড়োরাম মিত্রের ছেলেটার বেয়াদবী আর সহ্য যায় না। কলিকাতা থেকে নূতন এসে, সে যাচ্ছেতাই বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। রাজা বাদ্‌সা মারুক, চায়না-কোটের উপর ঘড়ির চেন এঁটে সারাদিন বেড়িয়া বেড়াক্, তাতে আপত্তি করি না; কিন্তু সে এক্‌সা মিথ্যা কথা বলিয়া পাড়ার লোকগুলাকে জ্বলিয়ে পুড়িয়ে খেলে। এই চারি দিন এসেছে; ইহার মধ্যেই, চার লক্ষের কম সে মিছে কথা কহে নাই। যা তার মনে যাচ্চে, তাই সে বেছুট বক্‌ছে। ঠাস্ করে গালে এক চড় হয়, তবে সে জান্তে পারে!"

ঘোষাল মহাশয় সরল লোক। ফাঁকি তাঁর মনে একে-বারেই নাই। মিথ্যা কথার উপর তিনি ভয়ানক চটা।

কোন ব্যক্তি একটু অতি-রঞ্জিত গল্প করিলে, তিনি তাহার উপর খড়্গহস্ত হন।

কুড়োরাম মিত্রের ছেলের নাম নগেন্দ্র বাবু। নগেন্দ্রনাথ আজ দুই বৎসরকাল বাড়ী-ছাড়া। কলিকাতা হইতে লাহোর পর্য্যন্ত ঐ দুই বৎসর চাকুরীর চেষ্টায় তিনি ভ্রমণ করিতে-ছিলেন। বাড়ী আসিয়া বাবু রাষ্ট্র করিয়াছেন, তিনি এক অতি উচ্চদরের মহা-চাকুরীতে নিযুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু চাকুরীটা কি?—তাহা এ পর্য্যন্ত কেহ জানিল না; এবং তিনি কত টাকা যে মাহিনা পান, সে কথাও আজও কেহ শুনিল না। কখনও শুনি, তিনি পোষ্টাল ইন্‌স্পেক্টার, মাহিনা ১২০৲ টাকা। কখনও কেহ বলেন, তিনি গ্রেহেম-কোম্পানীর বাড়ীর হেড বাবুর হেড আসিষ্টাণ্ট;—মাহিনা ১৯৫৲ টাকা। আবার জনরব উঠিল, তিনি কুলী-কন্‌ট্রাক্টার; মারীচ দ্বীপে কুলী-প্রেরণ-কার্য্যে ব্রতী;—স্বাধীন ব্যবসা চালাইতেছেন; কেননা, নগেন বাবু পরাধীনতা, দাসত্ব ভাল বাসেন না। এইরূপে নানা গোলযোগ উপস্থিত। নগেন বাবুও কাহাকে খোলসা কোন কথা বলেন না। তবে তাঁহার আকার ইঙ্গিত, ভাব-ভঙ্গি, চাল-চলন দেখিয়া, যিনি যাহা কিছু অনুমান করিয়া লউন। চার রকম জুতা,—প্রাতঃকাল, দ্বিপ্রহর, সন্ধ্যা এবং রাত্রি—এই চারি কালের চারি প্রকার জুতা। কোন জুতাটার রং বেগুণী, কেহ লাল, কেহ বা কালো মিশ্ চিক্‌চিকে। জুতা চতুষ্টয়ের মধ্যে পরস্পরে কেবলই যে রঙের

পার্থক্য, তা নয়। কোন জুতাটা হাঁটু পর্য্যন্ত উঁচু হয়, কোনটা বা ভুমি-তলের সঙ্গে মিশাইয়া থাকে—চৌদ্দ আনা পা ঢাকা হয় না। তাঁহার জামা,—দশ রকম, কি বিশ রকম, কি পঞ্চাশ রকম,—তা আজও কেহ ঠিক করিতে পারেন নাই। সেই এক একটা জামার বাহার এক ঘণ্টা কাল ঠায় চাহিয়া দেখিলে, তবে তার মর্ম্ম বুঝা যায়! এই দেখিলাম, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রায় পায়ে ডবল ষ্টাকিন পরিয়া, ইংলিশ-কোট গায়ে দিয়া, গলায় কমফার্ট এবং মাথায় টুপি আঁটিয়া বেড়াইতেছেন; আবার আধ ঘণ্টা পরে দেখি, পেন্‌টুলান, চাপকান, চোগা গায়ে দিয়া, তিনি বৈকালিক ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন। ইংরেজী কোট, চায়না কোট, পার্শী কোট,—বুকে বোতাম, বেণিয়ান, ফতুয়া,—বাপ্, গায়ের জামাই বা কত!!!

নগেন্দ্র বাবুকে কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, "আপনার কবে আসা হলো?"

নগেন্দ্র। পরশু সন্ধ্যার সময় পাল্কী থেকে নাব্‌লাম। দশটা বেহারা ছিল; তা না হ'লে আরও অনেক রাত হতো। এসেই, বেহারাদিগকে এক টাকা মদ খেতে দিলাম। মদ খেয়ে বেহারারা নাচ্‌তে লাগলো। আমি তখন ঘড়ী খুলে দেখিলাম, ঠিক ৯টা বেজেছে, অমনি নাচ বন্দ করিয়া দিলাম। ঐ ঘড়ীটের দাম ৩২১৸৶১৫—এটা আট-পৌরে ঘড়ী। আর একটা পোষাকী ঘড়ী আছে, তার দাম এক হাজার দুই শত

ছেয়ানব্বই টাকা। সে টেঁকঘড়ীটে প্রতি পনের মিনিট অন্তর টুং টুং করিয়া বাজে। এদেশে আর এমন ঘড়ী নাই; কেবল লেডী-ডফ্রীণের একটী আছে। তবে বড়-লাট-পত্নীর ঘড়ীটা একটু ছোট।"

এইরূপ নগেন্দ্র বাবুর কথা আর ফুরায় না। বক্তার উচিত, শ্রোতৃবর্গকে সমস্ত সংবাদ দানে আপ্যায়িত করা। সুতরাং শ্রোতার পলায়ন ব্যতীত, নগেন্দ্র বাবুর গল্প কখন ফুরাইত না।

এহেন নগেন্দ্র বাবুর উপর গ্রাম্যপুরোহিত ঘোষাল মহাশয় আজ খড়্গাহস্ত। রামধন বসুজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, "নগেনের উপর আজ এত চট্‌লে কেন হে? সে করিয়াছে কি?"

ঘোষাল। আরে, তার লম্বা চৌড়া কথা শুনে, আমার পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্য্যন্ত জ্বলে উঠেছে! সে ভুলে যদি একটা সত্যি কথা কয়!—

বসুজ। কথাটা কি?—আগে বল, তবে ত বুঝ্‌বো।

ঘোষাল। তার গুণের কটা কথা বোল্‌বো,—কাল বৈকালে ঘোষেদের চণ্ডীমণ্ডপে বসে তার গল্প হচ্ছিল, কাশীর বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে এক যোড়া কোশাকুশী আছে, তাতে সাত মণ জল ধরে! কতকগুলা ছেলে এই বাজে গল্প শুনে নগেন্দ্র বাবুকে বা'হবা দিতেছিল। আমি আর থাক্‌তে পারিলাম না;—বলিলাম,—"ময়াল গ্রামের বড় বাড়ীতে এক-

যোড়া কোশাকুশী ছিল—সে কোশাকুশীতে এক পুকুর জল ধরিত। এক দিন সেই কোশার ধারে বসিয়া, বড় কর্ত্তা তর্পণ করিতেছিলেন; এমন সময়, কোশার ভিতর থেকে একটা কুমীর উঠে বড় কর্ত্তাকে নিয়ে গেল; তাঁহাকে কোশার জলে ডুবিয়ে ফেলিল, আর সেই অবধি তাঁহাকে পাওয়া গেল না।" আমার এই কথা শুনে ছেলেগুলো হোহো হেসে উঠিল। নগেনটা আমার উপর চ'টে লাল হ'য়ে মুখ গোঁজ করিয়া রহিল।

বসুজ। ও-ছেলেটাকে আমি অনেক দিন হ'তে জানি; পেকে ঝিক্‌রে গেছে,—গরীবের ছেলে; এখন দু-টাকা হাতে হয়েছে, কাজেই সে চারিদিকে লাফিয়ে বেড়াচ্চে।

ঘোষাল। লাফাক্, তাতে ক্ষতি নাই, এত মিছে কথা বলে কেন?

বসুজ। মিথ্যা কথা কহা, ওর চির অভ্যাস। যখন নগেনের বয়স ১৮ বৎসর, তখন সে এক বছর কলিকাতায় আমার বাসায় ছিল। সন্ধ্যার সময় রসুয়ে ব্রাহ্মণ বাসার সকলকে জিজ্ঞাসিত,—"কে এবেলা ভাত খাবেন, কে খাবেন না।" লোক-সংখ্যা বুঝিয়া, ব্রাহ্মণ চাউল লইত। নগেন, ব্রাহ্মণকে প্রত্যহ বলিত, আমার আজ ক্ষুধা নাই, চাউল খুব কম লইও, এক মুঠা ভাত হইলেই হইবে। কিন্তু ভাত খাবার সময় দলে মিশিয়া ৮২ সিক্কার ওজনে সে প্রায় এক সের চেলের ভাত খাইত। শেষে রসুয়ে বামুনেরই ভাতে কম

পড়িত। অথচ প্রত্যহ নগেন বলিত, আমার ক্ষুধা নাই, চাল লইলেও চলে, না লইলেও চলে। বামুন ভারি চটিল। একদিন সকলের সাক্ষাতে বামুন তাহাকে জিজ্ঞাসিল, "আজ আপনার চাল লইব কি?" নগেন্দ্রের উত্তর পূর্ব্ববৎ—"এক-মুঠা চাল লইলেই যথেষ্ট—ক্ষুধা ত নাই-ই।" বামুন একমুঠা চাউল দেখাইয়া বলিল, এই ক'টা চাল লইলেই চলিবে ত? নগেন্দ্র বলিল—"যথেষ্ট হইবে—এ-তও লাগবে না।" বামুন তখন সেই একমুঠা চাল লইয়া একটু ন্যাকড়ায় বাঁধিয়া, ভাতের হাঁড়িতে সেই পুঁটুলিটা ফেলিয়া দিল। আহারের সময় বামুন সকলকে ভাত দিল, কিন্তু নগেনের ভাত দিতে বিলম্ব করিতে লাগিল। আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম, "নগেনের ভাত কোথা গেল?" বামুন ঠাকুর তখন সেই পুঁটুলিটা আনিয়া নগেনের পাতে ফেলিয়া দিয়া বলিল, "এই ওঁর ভাত! মোশাই, আমি রাত্রে আজ এক মাস-কাল না খেয়ে আছি, উনি রোজ বলেন, আমার ক্ষিদে নাই, কিন্তু প্রত্যহ এক কাঠা চালের ঘাড় ভাঙ্গেন। কাজেই আজ তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে, চাল দেখিয়ে, ন্যাকড়ায় বেঁধে, চাল ভাতে দিয়েছিলাম।" এই কথা শুনিয়া সকলে টেপা-টেপি করিয়া হাসিতে লাগিল। আমি ছিলাম বলিয়া সহজে সমস্ত মিটিল। তখন বামুন একরাশ ভাত আনিয়া দিল—নগেন নীরবে সমস্ত ভাত উদরসাৎ করিল। নগেন ত সেই!—এখন বড় হয়েছে বলিয়া কি তার স্বভাব পরিবর্ত্তন হবে?

ঘোষাল। ঐ যে নগেন, এদিকেই আস্‌চে! আচ্ছা ক'রে আজ দু-কথা উত্তম মধ্যম শুনিয়ে, ওকে সোজা ক'রে ছেড়ে দিব।

বসুজ। না, না, না—তুমি একটু থাম; নগেনের কাছে অনেক মজার কথা শুনা যাবে। তুমি একবার একটু চুপ কর।

দেখিতে দেখিতে নগেন আসিয়া পৌঁছিল।

ফটিক চাঁদ।

দ্বিতীয় কুসুম।

নগেন্দ্রের শুভাগমন মাত্র ঘোষাল-মহাশয়, অনিমিষ-লোচনে, তাঁহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। রামধন বসুজা মহাশয়ের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া অথবা তাঁহাকে ভাল চিনিতে না পারিয়া, নগেন্দ্রবাবু ঘোষালের দিকে ঠায় তাকাইয়া রহিলেন। যেন বিদ্যাসুন্দরের প্রথম শুভ সন্দর্শন হইল।

অনিমিষে বিনোদিনী হেরিছে বিনোদ।
বিনোদের বিনোদিনী দেখিয়া প্রমোদ॥

এদিকে পুরোহিত-ঠাকুর, অর্থাৎ ঘোষাল মহাশয়, নগেনের সাজসজ্জা দেখিয়া, বিস্ময়মুগ্ধ হইয়া, অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত-লোচনে কখনও তাঁহার জুতার বগ্‌লস দেখেন, কখন বা

অঙ্গুলের আংটীপানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ চাহিয়া থাকেন, কখন ঝক্‌মকে টুপীর দিকে নয়ন নিহিত করেন। নগেন্দ্র-অঙ্গের কোন্ অলঙ্কার খানি পুরুতঠাকুর আগে দেখিতে আরম্ভ করিবেন, তিনি তাহাই ভাল ঠিক করিতে পারিলেন না! সাজ কি একটা? মহরমের সময় লখ্‌নৌএর নবাব-বাড়ী "দুপুরে মাতনের" দিন গোদাহাতীর সাজ দেখিয়াছি, কিন্তু সে সাজও নগেন বাবুর সাজের সঙ্গে তুলনীয় নহে। হস্তি-অঙ্গে কাশ্মীরি শাল, মতির মালা, মুক্তার ঝালর, সোণার পদক, সোণার কাণ, কিংখাপের আংরাখা, রূপার ল্যাজ—সে বিচিত্র বাহার দেখে কে? ইচ্ছা হইল, যেন হাতীর অধীনে একটা চাকুরী করি। কিন্তু আজ নগেন্দ্র বাবুর ব্যাপার অতি অদ্ভুত। তাঁহার সেই বঙ্গোপসাগরের উত্তাল তরঙ্গবৎ রঙ্গ দেখিয়া, অনঙ্গমোহনের চারু অঙ্গের সেই ভঙ্গি দেখিয়া, সেই বঙ্কিম নয়নের বাঁকা চাহনির বিরাট ভাব দেখিয়া, সেই ললাটে, লোচনে, গ্রীবায়, গলে, বক্ষে, উদরে, উরুতে, পদে, কেশে—তুলা, পশম এবং ধাতব পদার্থের বিচিত্র সমাবেশ দেখিয়া, বাস্তবিকই আমার ইচ্ছা হয় যে, নগেন্দ্র-কল্পতরুর সুশীতল ছায়ায় বারমাস বাস করি! সে অপরূপ রূপ, আমি কেমন করিয়া বর্ণন করিব?

অদ্য অগ্রহায়ণের বুঝি শেষ ভাগ! সন্ধ্যার প্রাক্কাল, নভোমণ্ডল এখনি তারার মালা গলায় পরিবেন; পূর্ণিমার শশধর আজ আকাশপটে উদিত হইবেন; মাঘমাসে শ্রীপঞ্চমী

হইবে! বসন্ত কালে কোকিল-কুলের কলরব! ভ্রমরের ঝঙ্কার! কমল-কলির প্রস্ফুটন—এ সমস্তই ঘটিবে। হায়! আজ আমি এইরূপ আগ্রহায়ণিক দিনে নগেন্দ্র-বেশভূষার বর্ণনা কেমন করিয়া করিব?

নগেন্দ্র-গাত্রে নানা ছাঁদের, নানা রঙের রাশীকৃত বস্ত্রের স্তূপ—ধাতুঘটিত জিনিষেরও অভাব নাই। নীল, পীত, লোহিত, অসিত, সিত,—ময়ূরপুচ্ছবৎ মনোহর সৌন্দর্য্যরাশির সমাবেশ। আর, সমগ্র বস্ত্রাবলী গন্ধমাদনবৎ গুরুভারবিশিষ্ট। ঘড়ির চেন, তাঁহার বিশল্যকরণী। এক নিশ্বাসে মোটামুটি কথা বলিয়া যাই;—পেন্‌টুলান, চাপকান, চোগা, হাপষ্টকিন, ফুলষ্টকিন, ট্রাউসার, জঙ্গিয়ার, পিরাণ, কামিজ, ফতুয়া, ওয়েষ্টকোট, কলার, কম্ফটার, টুপি, রেশমী রুমাল, শালের রুমাল, ঘড়ী, চেন, আংটী, চস্‌মা, সোণার বোতাম, চুরট, ছোট একটী অটোডিরোজের শিশা, তিনটী বিলাতী বিবির ফটো, আট-মুখো চাকু ছুরি, রেশমী পারো, ফুলের তোড়া, কুরিয়ার ব্যাগ, মণি ব্যাগ, পকেট-রাশি, মুখে মুচ্‌কে হাসি এবং রূপা বাঁধান ছড়ি,—সবই আছে, অভাব কেবল এক গাছি মিহি লাকলাইন দড়ী।

এই গুরুগম্ভীর ব্যাপার অবলোকন করিয়া, থান-ফেড়া-পরা, নামাবলী গায়ে, চটী জুতা পায়ে, বুড়ো পুরুত-ঠাকুর প্রকৃতই চকিত, মুগ্ধ হইয়াছিল। তাই তিনি যেন একটু উঁকি ঝুঁকি ভাবে, ফ্যাল্ ফ্যাল্ নেত্রে নগেন্দ্রকে চাহিয়া

দেখিতে লাগিলেন। নগেন্দ্র বাবুজী পুরোহিতের সহিত প্রথম সম্ভাষণেই, ইংরেজী-প্রথানুসারে, বলিলেন, "আহা! অদ্য কি উত্তম দিন! সমীরণ ধীকি ধীকি বহিতেছে।—সন্ধ্যার কি গাঢ় সুচিক্কণ কলেবর।"

পুরোহিত মহাশয় দেখিয়া শুনিয়া চটিয়া অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। আর থাকিতে না পারিয়া বলিলেন,—"বাপু তোমার বাড়ী কোথা? কে তুমি?"

নগেন্দ্র। নিবাস আমার ভারতবর্ষে। আমি ভারত-সন্তান।

পুরুত। কিছু খেয়ে-টেয়ে এসেছ নাকি?

রামধন বাবু মধ্যস্থ হইয়া বলিলেন,—"ওহে ঘোষাল! তুমি মিছে ব'ক কেন বল দেখি? এখন একটু থাম। বাপু নগেন, তুমি এ দিকে আমার কাছে এসে ব'স।"

বলা বাহুল্য, নগেন্দ্র রামধন বাবুকে দেখিয়া প্রথমত একটু থত-মত খাইল। শেষে তাঁহার কাছে যাইয়া বসিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু অহো, কি দৈবদুর্ব্বিপাক! নগেন্দ্র বসিতে অক্ষম। পায়ের জুতার ফিতা খুলিতে প্রায় বিশ মিনিট লাগে। সুতরাং বসিতে হইলে বিশ মিনিট কাল কসরত আবশ্যক। কিন্তু জুতা খুলিতে পারিলেও, বসা অসম্ভব। কারণ পেণ্ট্‌লান-মহোদয়, কোমরের সহিত এরূপ ভাবে সংলগ্ন আছেন যে, বসিতে গেলে, হয় কোমর ভাঙ্গিবে, না হয়, কাপড় ছিঁড়িবে। অতএব, রামধন বাবুর সম্বোধন-

সত্ত্বেও, নগেন্দ্র বাবু প্রথমত একটু ইতস্তত, আঁ ওঁ করিয়া, শেষে গড়াকার্ত্তিকটীর মত দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রামধন বাবু ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন না, নিজের বালিসটা একটু সরাইয়া দিয়া, বালিসটা একবার চাপড়াইয়া আবার বলিলেন,—"এস, নগেন্দ্র, ব'স।"

নগেন্দ্র মহাবিপদে পড়িলেন ; ধীরে ধীরে বলিলেন,—"আজ্ঞে না, আজ আর বসিব না, একটু বিশেষ আবশ্যক আছে ; আজ যাই, আর একদিন আসিব। আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে।"

রামধন। বো'স হে বো'স। অনেক দিনের পর দেখা হলো ;—যাবে এখন !

নগেন্দ্র আরও ভীত হইলেন। পূর্ব্ব-অন্নদাতা রামধন বাবু বসিতে বলিতেছেন, অথচ তিনি বসিতে পারিতেছেন না ; কাজেই তিনি লজ্জিত, ভীত এবং বিপদ্‌গ্রস্ত। নগেন্দ্র কি করেন, শেষে মুখ ফুটিয়া বলিলেন, "আমাকে একখানা চৌকি আনাইয়া দিন, পেণ্টুলানটা কিছু কসা হইয়াছে।"

রামধন বাবু ব্যগ্র হইয়া চাকরকে বলিলেন, "ওরে শীগ্‌গির চৌকি নিয়ে আয়।"

পুরুত ঠাকুর। নীচে বসিলে, ওঁর অপমান হয় নাকি ?

রামধন। থাম নাহে একবার ?—(নগেন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া) ব'স বাপু, কেদারায়।

নগেন্দ্র বাবু তখন গম্ভীর ভাবে উপবেশন করিয়া রুমাল দিয়া মুখটী মুছিতে লাগিলেন।

পুরুত ঠাকুর। শীতকালে বাবুটী ঘাম্‌চেন, ওরে, শীগ্‌গির পাখা নিয়ে আয়।

রামধন। (নগেন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া) ঘোষাল মহাশয়ের কথা তুমি শুনিও না—উনি একটু বেশী বকেন। আচ্ছা নগেন, এ দু-বছরই কি তুমি কলিকাতায় ছিলে?

নগেন। আমি দু-বছরে সমগ্র ভারত ভ্রমণ করেছি,—সীমাকমিশনের অধ্যক্ষ লমসূডন যেদিন মধ্য-এসিয়া হইতে বিলাত যাত্রা করেন, সেই দিন আমি পেশোয়ার হইতে কলিকাতা রওনা হই? ফাষ্ট-ক্লাস রেলগাড়ীতে চাপিলাম, একটী বিবি সে গাড়ীতে ছিলেন; তিনি আমাকে দেখে খুব সম্ভ্রমে বলিলেন, "বাবু এই দিকে বসুন।" আমি কি করি, রমণীর কথা লঙ্ঘন করিতে না পেরে, সেই দিকেই বসিলাম। দু'জনে একত্রে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। তিনি আমাকে একটী ফুলের তোড়া উপহার দিলেন। আমি তাঁহাকে আমার ফটো দিলাম। ইংরেজ রমণীটী এলাহাবাদ ষ্টেসনে নামিলেন। আমার সহিত সেকেণ্ড হইল। কিন্তু কি দুর্দ্দৈব! রমণী যেমন গাড়ীর রেকাবে পা দিয়াছেন, অমনি তিনি হঠাৎ পা পিছলিয়া গাড়ীর নীচে পড়িয়া গেলেন। গাড়ী তখন চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। মেমের পতন দেখিয়া সকলে হাঁ হাঁ করিয়া দৌড়িয়া আসিতে

লাগিল। কিন্তু কেহই গাড়ীর নীচে নামিয়া তুলিতে সাহস করিল না। আমি তখন বেগে গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া বিবিকে গাড়ীর নীচে হইতে তুলিলাম। আমার তুলিবার গুণে রমণীর গায়ে একটু আঁচও লাগে নাই।

পুরুত ঠাকুর। বাপু হে, তোমায় কি বাবা তারকনাথের কৃপা হয়েছে? যা বল্‌বে, ভুলে কি তা সত্য হ'বে না?

রামধন। আচ্ছা, তার পর কি হলো?

নগেন্দ্র। রেল গাড়ীটা আমার আজ্ঞায় থেমে গেল। এমন সময় দেখি কি না, জয়পুরের মহারাজ উপস্থিত। সেলাম ক'রে আমি তাঁর সম্মুখে দাঁড়াইলাম। রাজা প্রীত হয়ে আমার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। রাজা বলিলেন, "এস, তুমি আমার গাড়ীতেই যাবে। রাজা এবং আমি উভয়েই হাত ধরাধরি করে প্লাটফরমে পায়চালি করিতে লাগিলাম।

পুরুত ঠাকুর। রাজা তোমায় কাঁধে করে নাচলে না ত?

রামধন। নগেন, তুমি বলো,—তার পর কি হলো?—ঐ বুড়োর কথা শুনো না।

নগেন্দ্র। রাজার সহিত গাড়ীতে উঠিতেছি, এমন সময় ছোট লাট লয়েল সাহেব আঙ্গুল হেলাইয়া আমাকে ডাকিলেন, "নগেন বাবু!" আমি ভাবিলাম কি বিপদ্! এ দিকে জয়পুরের রাজা ডাকাডাকি করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"নগেন বাবু, তুমি যাও কোথা?" আমি ফাঁপরে পড়িলাম।

একদিকে ছোট লাট, অপর দিকে মহারাজ জয়পুর। আমি যাই কোথা ?

তখন পুরোহিত মহাশয় ক্রোধে কম্পিতবক্ষ হইয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন। অতি দ্রুতপদে দৌড়িয়া গিয়া তিনি নগেনের কাণ ধরিয়া বলিলেন, "তবে রে পাজি, তোর যত বড় মুখ, তত বড় কথা! পোটাচুন্নির বেটা চন্নন-বিলাস! এক চড়ে টাস্‌পাড়ার বাগান দেখাবো। খবর্‌দার, এখানে আর বেছুট বকিতে পাবি না; গায়ের ন্যাকড়া খুলে ফ্যাল্! গায়ে বিশ পুরু ন্যাকড়া জড়িয়ে সং সেজে, ছোড়া একবারে মিছে কথার খৈ ফুটাচ্চো।"

রামধন বাবু হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলেন। "থামো, ঘোষাল মশাই, থামো! নগেনের কাণ ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও"—বাবা নগেন, তুমি মনে কিছু করো না—বুড়ো পাগল।

নগেন ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পলাইলেন। চসমা ভূতলে পড়িয়া গেল, তথাচ ভ্রূক্ষেপ নাই।

হিন্দুধর্ম্মের দুর্দ্দিন।

হিন্দুর দুরবস্থার কথা ভাবিলে কাহার না চক্ষে জল আসে? কি ছিল, কি হইয়াছে? দেহে অস্থি নাই, মাংস নাই, ভূতলশায়ী, মুমুর্ষু,—প্রাণ বাহির হইবার নয়, তাই আজও আছে। হিন্দুধর্ম্ম অনন্ত অক্ষয় অবিনশ্বর, তাই এত

অত্যাচারে, এত পদ-দলনেও ইহার মহাপ্রাণ উড়িয়া যায় নাই। কিন্তু তাও বলি, এখনও ইহার যাহা আছে, অন্যের তাহা কণামাত্র থাকিলেও, সে পরম পুষ্টি-সাধন করিত।

আজ যে রক্ষক, সেই ভক্ষক। তীর্থক্ষেত্র, পাপক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীক্ষেত্র, গয়া, বারাণসী, শ্রীবৃন্দাবন, সর্ব্বত্রই পাপস্রোত প্রবলবেগে বহিতেছে। ৺পুরুষোত্তম-ধামে যাও, দেখিবে, কেবল পাপের রাশি, ভণ্ডামি, আড়ম্বর, লোভ, দ্বেষ, লুকোচুরি। ভক্তি বা ঐকান্তিকতা খুব কম। ঈশ্বরকে তাহারা প্রণাম করে বটে, মুখে "জয় জগন্নাথ জয়" বলে বটে; কিন্তু ইহাতে একাগ্রতা কৈ? তন্ময় ভাব কৈ? বাঁধা নির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে, কলের পুতুলের মত, তাই তাহারা দেবতার নিকট ঘাড় নোওয়ায়—টিয়া পাখীর মত, বুলি শিখিয়াছে, তাই যখন তখন "জয় জগন্নাথ" বলিয়া চীৎকার করে। তীর্থক্ষেত্রের ব্রাহ্মণদের আর একটা রব,—দেহি, দেহি, দেহি। এমন দোকানদারী, পয়সা লইবার কারিকুরি, আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। যাত্রিদলের সেই কৌশলচক্রে হাড় পেষিত হইয়া যায়। সকল কথা খুলিয়া বলা উচিত নহে এবং দরকারও নাই। মোটামুটি ইহাই বুঝিয়াছি, তীর্থ-ক্ষেত্র ভয়ঙ্কর পাপপঙ্কে নিমগ্ন, ব্রাহ্মণগণ চণ্ডালজাতীয়। আমার প্রকৃতই মনে হয়, তীর্থক্ষেত্রগুলি যেন এক একটা উচ্চদরের সওদাগরি আফিস—দেবতা ইহার পণ্যদ্রব্য, পুরোহিত ইহার মুচ্ছুদ্দি, পাণ্ডাগণ ইহার দালাল; আর এই

অসংখ্য যাত্রী ইহার খরিদদার। ফেল কড়ি, মাখ তেল। যে যেমন টাকা দিবে, সে তেমন মাল পাইবে। ভক্ত যাত্রিদল এইরূপে প্রবঞ্চিত, লাঞ্ছিত হয়; মুক্তার বদলে সুক্তা পায়, কাঞ্চনের বদলে কাচ পায়।

এ সব কথা মনে করিতেও বুক ফাটিয়া যায়, লেখা ত দূরের কথা। যখন মনে হয়, আমরা ধর্ম্ম লইয়া ব্যবসা চালাইতেছি, হিন্দুগণ ধর্ম্মবণিক হইয়া উঠিয়াছে, তখন আতঙ্কে প্রাণ শিহরিয়া উঠে। পুত্রের অসুখ হইয়াছে, মাতা, দুর্গার নিকটে মানসিক করিল,—"মা, অষ্টমীর ক্ষণে তোমার ষোড়শোপচারে পূজা দিব, যোড়া পাঁটা দিব, পাটের শাড়ী দিব,—মা, ছেলেটাকে আরাম ক'রে দাও।" অর্থাৎ শক্তিরূপিণী জগজ্জননী ভগবতীকে যেন বলা হইল,—"মা, যৎকিঞ্চিৎ ঘুষ লইয়া, ছেলে ভাল করে দাও।" ইহার নাম পূজা নয়, দেব-সেবা নয়—ইহা ব্যবসা। ডাক্তার কবিরাজেও ত দুই এক শত টাকা লইবে, তুমি না হয়, মা, কিছু লইয়া পুত্রের রোগ আরাম কর। একটা ঘটনা মনে পড়িল। ছেলের বিবাহ। খুব ধুমধাম। নৌকাপথে, নদী বাহিয়া, পুত্র বিবাহ করিতে যাইবে। কিন্তু দৈব-বশত সে দিন মেঘ, ঝড়, জল। গৃহস্থ মহা চিন্তিত। বাটীর যিনি গৃহিণী, তিনি একটী মোহর লইয়া গ্রামের শিব-মন্দিরে গিয়া উঠিলেন; এবং সেই মোহরটী শিবের নিকট রাখিয়া এই প্রার্থনা করিলেন,—"হে শিব! তোমাকে আমি এই মোহরটী দিলাম, তুমি

আজ বাদল থামাইয়া দাও।” এ সব ত অগাধ ভক্তির কথা! কেবল শিক্ষকের কুশিক্ষায় ইহাঁরা বিপথগামী হইয়াছেন, এই মাত্র ইহাঁদের দোষ। কিন্তু এমন অনেক নব্য-হিন্দু বাবু আছেন, যাঁহারা নিতান্ত পাষণ্ড। বাবুর পাঁটা খাইবার ইচ্ছা হইল, অমনি কালীর পূজা দিতে পাঁটা পাঠাইয়া দিলেন। কোন বাবু বা একটী পোষাকী বেশ্যা সঙ্গে লইয়া, মদ ও ছাগের সাহচর্য্যে, মা কালীর স্থানে উপনীত হইলেন। কালী-ক্ষেত্র বাগানবাড়ী হইল। ধর্ম্মক্ষেত্র নরক হইল।

প্রত্যহ লক্ষ মিথ্যা কথা, জাল, জুয়াচুরি, এ সমস্ত কিছুরই বিরাম নাই; অথচ সন্ধ্যার পর একবার মালা লইয়া হরিনাম ঠক্-ঠকান আছে। প্রাতে উঠিয়া, পাপক্ষয়ার্থ গঙ্গাস্নান আছে, নাকে তিলক ছাপ আছে, সন্ধ্যা আহ্নিক আছে,—সবই আছে; নাই কেবল, সত্য কথা, সরল পথ, সহজ দৃষ্টি। আদালতে অনবরত হলপ করিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া আছে—অথচ পেঁয়াজ রুসুন দেখিলেই তাঁহার অঙ্গ শিহরিয়া উঠে। যে পিশাচ, যে পশু, সে পেঁয়াজ রুসুনের তর্ক করিবার কে? ব্রাহ্মণ দেখিলেই প্রণত হই, বটগাছ, শঙ্খচীল, পুকুরপাড়ে সিন্দূর মাখান নোড়া দেখিলে, ভক্তিভরে গলিয়া যাই,—মুখে সদা হরি হরি বোল বলি, অথচ এদিকে অন্তরে, “কার চুরি করি,—”এই ভাব সতত উদয় হইতেছে। বাবুর পিতৃশ্রাদ্ধ উপস্থিত; দানসাগর ব্যাপার। বাবু ব্রাহ্মণকুল-পরিবৃত হইয়া, শ্রাদ্ধের মন্ত্র বলিতেছেন। ওদিকে, বাবুর ঠিক্ পশ্চাতে

রূপযৌবন-সম্পন্না ভুবন-মোহিনী কীর্ত্তনী, রাসলীলা কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছে; বিলাসিনীর সেই হরিণ-নয়নের বঙ্কিম চাহনি, বিধুমুখের সেই মধুর মধুর মুচ্‌কি হাসি, কম্বুকণ্ঠীর সেই কোকিল-বিনিন্দিত কমনীয় কূজন, করদ্বয়ের সেই ভাবময়ী ভঙ্গী, নবীন নিতম্বের সেই লীলাময়ী দোলনী, চঞ্চল চরণের সেই মরাল-গঞ্জন বিলাস-বিক্ষেপ,—দর্শকবৃন্দের মন মোহিত করিয়া তুলিয়াছে। আবার সেই কাঁচুলি-কসনে প্রপীড়িত মনোমোহিনী রাঙা চরণ দুখানি তালে তালে তুলিয়া, ওড়নার বাহারে হৃদয় উড়াইয়া, যখন কোন বিশেষ-দর্শকের কাছে আসিয়া, তান ধরিল,—

পিরীতি বলিয়া এ তিন আঁখর
ভুবনে আনিল কে।
মধুর বলিয়া ছানিয়া খাইনু
তিতায় তিতিল দে॥

সই! এ কথা কহন নহে।
হিয়ার ভিতর বসতি করিয়া
কখন কি জানি কহে॥

তখন, নটীকে আর কষ্ট করিতে হইল না, দর্শক অমনি ভাবে মুগ্ধ হইয়া, নিজের সোণার চেনটী খুলিয়া তাহাকে উপহার দিলেন। সভায় একটা বাহোবা পড়িয়া গেল। ক্যাবাৎ ক্যাবাৎ ধ্বনিতে সেই অনঙ্গমঞ্জরী কীর্ত্তনী আবেগে

আরও ফুলিয়া উঠিল,—আবার কাঁকাল হেলাইয়া হাত দুলাইয়া গান ধরিল ;—

পিরীতি বলিয়া, একটী কমল
রসের সাগর-মাঝে।
প্রেম পরিমল, লুবধ ভ্রমর
ধায়ল আপন কাজে ॥
ভ্রমরা জানয়ে, কমল-মাধুরী
তেঁই সে তাহার বশ।
রসিক জানয়ে, রসের চাতুরী
আনে কহে অপযশ ॥
সই ! এ কথা বুঝিবে কে ?
যে জন জানয়ে, সে যদি না কহে
কেমনে ধরিবে দে ॥

এ গান শেষ করিয়া নটী আবার ধরিল ,—

কদম্বের বন হৈতে, কিবা শব্দ আচম্বিতে,
আসিয়া পশিল মোর কাণে।
অমৃত নিছিয়া ফেলি, কি মাধুর্য্য পদাবলী,
কি জানি কেমন করে মনে ॥

সভাভূমি নীরব। সকলে তদ্গত-চিত্তে গান শুনিতে লাগিলেন। ওদিকে যাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধ, যিনি ব্রাহ্মণগণ-বেষ্টিত হইয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছিলেন, তিনিও পশ্চাতে মুখ ফিরাইলেন। কালিদাসের শ্লোক সার্থক হইল ;—

গচ্ছতি পুরঃ শরীরং
ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ।
চীনাংশুকমিব কেতোঃ
প্রতিবাতং নীয়মানস্য ॥

এই ত শ্রাদ্ধ-ব্যাপার। আর এই তোমার হিন্দুয়ানি! দুর্গোৎসব, সরস্বতী পূজা, শ্যামাপূজাতেও ঐরূপ তামসিক কাণ্ড।

আজকাল আবার হিন্দুধর্ম্মের একদল নূতন অভিভাবক জন্মিয়াছেন। হিন্দু ধর্ম্মটা তাঁহাদের অনুগ্রহের পাত্র হইয়াছে। আহা, পূর্ব্ব পুরুষের সেই বুড়ো ধর্ম্মটা বজায় না রাখিলে, তাঁহাদের আর মান থাকে কৈ? দেশেরই বা উপকার হয় কৈ এবং নিজেরই বা নাম জাহির হয় কৈ? অতএব, তোল হিন্দুধর্ম্মকে। কিন্তু, এখন পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে ভুবন ভরিয়াছে—আর সেকাল নাই। সুতরাং বর্ত্তমান কালের সঙ্গে, হিন্দুধর্ম্মটাকে মাজিয়া, ঘসিয়া, রিপু করিয়া মিলাইয়া লইতে হইবে। মুর্গি, পেঁয়াজ বাদ দিলে চলিবে না; সন্ধ্যার পর বন্ধু-বান্ধব লইয়া, একটু গোলাপী গোচ নেশা করা চাই। ক্লান্তি দূর এবং মনের স্ফূর্ত্তির জন্য, সভ্যা, শিক্ষিতা বারাঙ্গনাদের ভবনে গেলেও দোষ নাই। টীকি, তিলক, সন্ধ্যা আহ্নিক—কুসংস্কার। পৈতা-গাছটা রাখিলেও হয়, না রাখিলেও হয়। সাকার দেবতা আবশ্যক বটে, কিন্তু আমার মত পণ্ডিত লোকের জন্য নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মই উপ-

যুক্ত। আচার ব্যবহারের সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সংস্রব নাই। সত্যপ্রিয়, সদালাপী, সুভাষী, সন্নীতিপরায়ণ, হিংসাহীন হইলেই হিন্দু হওয়া যায়। মুর্গীকুল ধ্বংস কর, অথবা পেঁয়াজ-বংশ নির্ব্বংশ কর—তথাপি তোমার হিন্দুয়ানি ঘুচিবে না। মুখে দু'বার হিন্দু হিন্দু বল, আর দুটা সত্য কথা কও, তাহা হইলেই তুমি পূরা মাত্রায় হিন্দু। এই দল আপন আপন ইচ্ছামত এক একটা ঈশ্বর গড়িয়া লইতেছেন; যার যেমন সাধ হই-তেছে, তিনি সেইরূপ ভূষণে ঈশ্বরকে ভূষিত করিতেছেন। কাহারও চৈতন্য হইতে বাসনা, কাহারও শ্রীকৃষ্ণের অবতার হইতে সাধ, কেহ বা স্বয়ং বুদ্ধদেব বলিয়া আপনাকে ভাবিতে-ছেন এবং স্বপ্রণীত হিন্দুধর্ম্মটী, জনসমাজে প্রচার জন্য বিধিমত চেষ্টা করিতেছেন।

কোন কোন পণ্ডিতাভিমানী আজকাল হিন্দুধর্ম্মের সমা-লোচন আরম্ভ করিয়াছেন—মনুর ভুল ধরিতেছেন, সাংখ্যকে নাস্তিক বলিতেছেন, বেদব্যাসকে শিক্ষা-বিভ্রাটগ্রস্ত বলিতে-ছেন, দুর্ব্বাসাকে পাপী বলিতেছেন, আর বাকি কি? একটা কথা জিজ্ঞাস্য আছে। ইংরেজী ভাষা শিখিতে হইলে, জীবনের আট দশ বৎসর ক্ষয় হয়—প্রত্যহ হাড়ভাঙ্গা ৭।৮ ঘণ্টা মেহনত লাগে। বাঙ্গালা ভাষায় দাগা বুলাইতেও ৪।৫ বৎসর যায়! কিন্তু এই অধম সংস্কৃত ভাষা শিখিতে কোন গোল নাই;—সংস্কৃত ভাষাজ্ঞানটা যেন দৈববিদ্যা। ব্যাকরণের বড় কেহ ধার ধারেন না, ভাষা-পরিচয়ও তথৈবচ।

ভরসা, কেবলমাত্র অনুবাদ। সেই অনুবাদমাত্র সম্বল লইয়া, তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রের মহাশ্রাদ্ধে ব্যাপৃত হন। আর অনুবাদ, অধিকাংশই বিকৃত। সুতরাং ফল অতি বিষময় হয়। ইহাতে দোষ তাঁহাদের নাই ;—দোষ যাহা, তাহা অদৃষ্টের।

হিন্দুধর্ম্মের এ ঘোর দুর্দ্দিনে রক্ষক কে? এ বিপ্লবময় মহাসমুদ্রের ঘূর্ণাবর্ত্তে পতিত তরীর কর্ণধার কে? এ কথার কে উত্তর দিবে?

নারদ ও শুকদেব।

ছেলে বেলায় যাত্রা শুনিয়া বুঝিয়াছিলাম, নারদ মুনি একটা আধ-পাগলা বুড়া বামুন। বুঝিয়াছিলাম, নারদ এক ঠেঙে, খোঁড়া ; ঢেঁকি তার বাহন। ধারণা হইয়াছিল, নারদ দেবতাগণের দূত, কুটিলবুদ্ধি ; পরস্পরের গোপন-কথা পরস্পরের নিকট বলা তাহার অভ্যাস ; এবং গণ্ডগোলের বীজ। পাড়ার কেহ কাহারও সহিত ঝগড়া করিলে বলিয়া উঠিতাম,—"নারোদ, নারোদ!" সেই অদ্বিতীয় প্রতিভাশালী, পরম জ্ঞানী, বিবেকী, মহামুনি নারদ, অশিক্ষিতের হাতে পড়িয়া বাঙ্গালায় বড়ই বিকৃত ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। শুকদেবের আরও দুর্দ্দশা! সে পাগলাটা উলঙ্গ, অঙ্গে ভস্ম মাখে ; মেয়ে ছেলে দেখিলে তাদের সম্মুখ দিয়া উলঙ্গভাবে, সে হন্ হন্ করিয়া চলিয়া যায়। একবার একজন

কথক-ঠাকুর, শুককে লইয়া মহা রঙ্গরস করেন। যাত্রায় একবার একটা শুকদেব গোঁসাই দেখি। সেটা পনের আনা উলঙ্গ। তার অঙ্গ-ভঙ্গ রঙ্গ দেখিলেই হাসি পায়। পরে অনুসন্ধানে জানিলাম, সে লোকটা সেই দলের প্রধান সঙদার। সুতরাং শুকদেব প্রায় এক ঘণ্টা কাল আসরে থাকিয়া, লম্ফ ঝম্ফ করিয়া লোক হাসাইল, বাহোবা পাইল এবং দিগ্বিজয় করিল। যখন ঈশ্বরের প্রতিকৃতি স্বরূপ, সাক্ষাৎ ব্রহ্মের ন্যায় দেদীপ্যমান শুকদেবের এই দুর্দ্দশা, তখন অন্যে পরে কা কথা!

বলা বাহুল্য, শাস্ত্রকারগণ শুকদেবকে এমন বিকৃতভাবে গঠন করেন নাই। সংস্কৃত না জানিয়া, শাস্ত্র না পড়িয়া—কেবল এই স্থূলবুদ্ধির সাহায্যে আমরা দেবচরিত্র অঙ্কিত করিতে চাই। মানুষ গড়িতে পারি না, দেবতা গড়িতে চাই। হেলে ধরিতে পারি না, কেউটে ধরিতে চাই। জোনাকি কায়দা করিতে পারি না, চাঁদ ধরিতে চাই।

শুক কি, তাহা সংক্ষেপে বুঝাইব। আমাদের অধিক বিদ্যা খরচ করিতে হইবে না। শ্রীমদ্ভাগবতে যাহা লিখিত আছে, তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ কেবল নিম্নে উদ্ধৃত হইল। সে দৃশ্য বড়ই চমৎকার! মহারাজ পরীক্ষিত ব্রহ্মশাপে মরণ নিশ্চয় জানিয়া, গঙ্গাতীরে আসিয়া প্রায়োপবেশন স্থির করিয়া, কেবল হরির পাদপদ্ম চিন্তা করিতে লাগিলেন। পৃথিবীর যত পণ্ডিত, যত মুনি, যত ঋষি, সকলেই সেই সাধু

পরীক্ষিৎ সমীপে সমাগত হইলেন। অত্রি, বশিষ্ঠ, চ্যবন, শরদ্বান্, অরিষ্টনেমি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পরাশর, বিশ্বামিত্র, পরশুরাম, উতথ্য, সুবাহু, দেবল, ভরদ্বাজ, গোতম, পিপ্পলাদ, মৈত্রেয়, দ্বৈপায়ন, ভগবান্ নারদ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ দেবর্ষি, মহর্ষি এবং রাজর্ষিগণ তথায় উপস্থিত ছিলেন। সকলের যথা-যোগ্য সম্মান করিয়া, উপযুক্ত স্থানে বসাইয়া, মহারাজ পরীক্ষিৎ তখন কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন ;—

"বিপ্রগণ! এক্ষণে আপনাদিগকে এক জিজ্ঞাস্য কথা জিজ্ঞাসা করি ; সকল অবস্থায়, বিশেষত মৃত্যুদশায় পতিত হইয়া মনুষ্য কোন্ কোন্ কার্য্যকে পাপশূন্য ভাবিয়া কর্ত্তব্য বিবেচনা করিবে ? আপনারা পণ্ডিত ; অতএব বিচার করিয়া আমাকে ইহার প্রত্যুত্তর দান করুন। ঋষিগণ রাজার এই প্রশ্নে যাগ, যোগ, তপস্যা ও দান লইয়া পরস্পর বিবাদ করিতেছেন, ইতিমধ্যে ব্যাসনন্দন শুক যদৃচ্ছা ক্রমে ভূমণ্ডল ভ্রমণ করিতে করিতে হঠাৎ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার কোন আশ্রমেরই চিহ্ন ছিল না। ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াই নিরন্তর সন্তুষ্ট ছিলেন। মনুষ্যগণ অবজ্ঞা করিয়া যে ব্যক্তিকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়, তিনি সেই অবধূতের বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। ক্ষিপ্ত ভাবিয়া বালকেরা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আসিতেছিল। বাহ্যিক আকৃতি দেখিয়া তাঁহার অন্তর্নিহিত তেজঃ অনুমান করা যাইত না। কিন্তু মুনিগণ দেখিলেন, তাঁহার বয়ঃক্রম

ষোড়শ বর্ষ। হস্ত, পদ, উরু, বাহু, স্কন্ধ, কপোল ও গাত্র অতি সুকোমল। লোচন দীর্ঘ ও মনোহর। কর্ণ-যুগল অতিশয় খর্ব্ব বা দীর্ঘ নহে। বদন কমনীয় ভ্রূযুগলে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। কর্ণের গঠন শঙ্খের ন্যায় সুন্দর। তাহার নিম্নস্থ অস্থিদ্বয় মাংসে আবৃত। বক্ষঃস্থল বিশাল এবং উন্নত। নাভি আবর্ত্তের ন্যায় অতি গভীর। উদর নিম্ন-বাহিনী রোম-রেখায় সুশোভিত। বেশ দিগম্বর। আকু-ঞ্চিত কেশ-কলাপ মস্তকের চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। বাহুদ্বয় আজানুলম্বিত। শরীর হইতে দেবদেব বিষ্ণুর ন্যায় আভা নির্গত হইতেছে। কলেবর শ্যামবর্ণ। পূর্ণ যৌবনের শোভা এবং মনোহর ঈষৎ হাস্য দ্বারা কামিনীদিগের মন কাড়িয়া লইতেছেন। এই সকল চিহ্ন দেখিয়া ঋষিরা তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন; সুতরাং দর্শনমাত্রই আসন হইতে উত্থান করিলেন। বিষ্ণুভক্ত পরীক্ষিৎ সেই অতিথিকে আগত দেখিয়া, আপনার মস্তক দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন। তাহা দেখিয়া যে সকল অবোধ মহিলা ও বালকগণ তাঁহার অনুগমন করিতেছিল, তাহারা সকলেই ফিরিয়া গেল। তখন শুক পূজা গ্রহণ করিয়া শ্রেষ্ঠ আসনে উপবেশন করি-লেন। তিনি তেজে সকল অপেক্ষাই শ্রেষ্ঠ ছিলেন; অতএব ব্রহ্মর্ষি রাজর্ষি এবং দেবর্ষিগণে পরিবৃত হইয়া অশ্বিন্যাদি নক্ষত্র ও অন্যান্য তারকাপুঞ্জের মধ্যবর্ত্তী চন্দ্রমার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ভগবদ্ভক্ত রাজা তাঁহার স্মরণশক্তিকে

অকুণ্ঠিত বলিয়া জানিতেন; সুতরাং তাঁহার নিকটে গিয়া ভূমিতে মস্তক অবনত করিয়া নমস্কার করিলেন এবং পুনর্ব্বার নমস্কার করিয়া করপুটে মিষ্ট বাক্যে কহিলেন; অহো, আমরা নিকৃষ্ট ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া অদ্য সাধুদিগের উপাস্য হইলাম! কারণ আপনারা অতিথি হইয়া আমাদিগকে পবিত্র করিলেন। ব্রহ্মন্! আপনাদিগকে স্মরণ করিলে গৃহীদিগের আশ্রম শুদ্ধ হয়, দর্শন, স্পর্শন, এবং পাদধৌতাদির কথা আর কি বলিব? হে মহাযোগিন্! যেমন বিষ্ণুর দর্শনে অসুরগণ নাশ পায়, সেইরূপ আপনাকে দেখিবামাত্রই মনুষ্যের মহা-পাতকও ধ্বংস হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদিগকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। তিনিই কি প্রসন্ন হইয়া সেই প্রিয় পৈতৃষ্ব-শ্রেয়দিগের প্রীতির নিমিত্ত অদ্য আমার প্রতিও বন্ধুতা প্রকাশ করিলেন? তাহা না হইলে, এমন মরণ-সময়ে আমরা কিরূপে আপনার দর্শন লাভ করিতে পারি? আপনি সিদ্ধ-পুরুষ। আপনার গতি জানা যায় না। আপনি সেই ভগ-বানের কৃপায়ই আমার নিকট উপস্থিত হইয়া, আমাকে প্রবৃত্তি দিতেছেন, যে, আমি আপনাকে অভীষ্ট বিষয় জিজ্ঞাসা করি। আপনি যোগীদিগের পরম গুরুও বটেন; অতএব আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, মনুষ্য মরণ-কালে কি কার্য্য করিলে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে? কোন্ কার্য্যই বা তাহাদিগের কর্ত্তব্য? প্রভো! মনুষ্যদিগের কি শ্রবণ করা, জপ করা, অনুষ্ঠান করা, স্মরণ করা এবং ভজনা করা বা না করা উচিত?

আপনি তাহার উপদেশ করুন। ব্রহ্মন্! আমি নিশ্চয় জানি, যে সময়ের মধ্যে একটী গাভী দোহন করা যায়, আপনারা ততক্ষণও গৃহীদিগের আশ্রমে অবস্থিতি করেন না। সূত বলিলেন, রাজা পরীক্ষিৎ স্নিগ্ধবাক্যে সম্ভাষণ করিয়া এইরূপ প্রশ্ন করিলে পর সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ ব্যাস-নন্দন বলিতে আরম্ভ করিলেন।"

পাঠক শুকের মর্য্যাদা বুঝিলেন কি? শুকদেব আমাদের চর্ম্মচক্ষে অসভ্য বটেন, উলঙ্গ বটেন, পাগল বটেন,—কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানী, তাঁহারা জানেন শুক উন্নতির চরম সীমায় উপনীত, বিবেকী এবং ঈশ্বরের প্রতিকৃতি-স্বরূপ। শুক, মায়ায় আবদ্ধ নহেন; সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময় দেখিতেছেন, ভেদ-জ্ঞান নাই! আমরা নিতান্ত মন্দভাগ্য, অধম, অজ্ঞান,—তাই শুকদেব-চরিত্র লইয়া ভাঁড়াম করি, রঙ্গরস করি।

যণ্ডামর্ক।

আজ প্রায় পঁচিশ বৎসর হইল, যণ্ডামর্কের সহিত প্রথম পরিচয় হয়। গ্রামে যাত্রা হইতেছে, হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড। অধিকারী গুণী বলিয়া বিখ্যাত। দল খুব চায়েন। পালা—প্রহ্লাদ চরিত্র। রাজা হিরণ্যকশিপু, পুত্র প্রহ্লাদকে কৃষ্ণ-মন্ত্রে দীক্ষিত দেখিয়া ক্রোধান্ধ হইলেন। ওদিকে প্রহ্লাদের গুরুদ্বয় ভয়ে বাটীর বাহির হইতে সাহসী হইলেন না।

রাজাজ্ঞায় দুইজন দৈত্য গিয়া ষণ্ডামর্ককে বাঁধিয়া লইয়া আসরে হাজির করিল; ষণ্ডামর্ক আসরে আসিয়া বন্ধন খুলিয়া ফেলিলেন। যিনি "ষণ্ড", তিনি ষাঁড়ের মত চেঁচাইলেন, যিনি "অমর্ক" তিনি বানরের মত উপ্ উপ্ করিলেন। যাত্রা ভারি জমিয়া গেল; শেষে ঐ দুইজন নাচিয়া নাচিয়া গান ধরিলেন;—

আমরা শুক্কুর গুরুর দুটী পুত।
একটী দানা, একটী ভুত॥
ষণ্ড চরে মাঠে মাঠে, কচি ঘাস খায়গো খুঁটে,
হুম্‌কী দিলে বৌ-ঝী ছুটে—আগো বড়ই অদ্ভুত।
মর্ক বেড়ায় ডালে ডালে, পেটটী ভরায় ফলেফুলে,
ছেলে-পিলে এক্‌লা পেলে, আঁচল ধরে লাড়ু খুলে,
খায়গো চোরা মজপুত॥

দেশ তখন তত সভ্য হয় নাই; "অ্যাঁকোর" অথবা "এন্‌কোর" ছিল না। সুতরাং কেবল সাবাস্ সাবাস্ ধ্বনিতে মজলিস মাৎ হইয়া গেল—ষণ্ডামর্ক ঐ গানটী চারিবার গাহিলেন। যাত্রার দল ত পর দিনই ফুরণ পাইয়া বিদায় হইল। কিন্তু ঐ গানটী গ্রামবাসীর হৃদয়ে জাগরূক রহিল। যখন তখন, যেখানে সেখানে, যে-সে ঐ গান গাহিতে লাগিল। আবালবৃদ্ধবনিতা, ষণ্ডকে ষাঁড় এবং অমর্ককে বানর বুঝিল।

তার পর, কথক-ঠাকুরের মুখে ষণ্ডামর্কের কথা শুনি। সে বেশ কথা! গুরুদ্বয় ক্ষীণ, দীন, মলিন, অনাথ,—উদরে

অন্ন নাই, পরণে ভাল কাপড় নাই, পাণ্ডিত্য নাই, রাজভয়ে কাপুরুষবৎ কেবল থর থর কম্পিত!

তার পর, রামরসায়নে ষণ্ডামর্কের কথা পড়ি। রঘুনন্দন গোস্বামী লিখিয়াছেন ;—

এত কহি সেই দৈত্য-যাজক ব্রাহ্মণ।
প্রহ্লাদের প্রতি করে তর্জ্জন তাড়ন॥
ইহা যোগ্য বটে তারা হয় ষণ্ডামর্ক।
থাকিবেক কেন তাহে বিবেক সম্পর্ক॥
শুক্রাচার্য্য অতিশয় বিবেচক হন।
যোগ্য নাম থুয়েছেন করি বিবেচন॥
ষণ্ডপদে বৃষ কহে সেহ পশু শ্রেষ্ঠ।
তাহার সমান জ্ঞানী তেঁই ষণ্ড জ্যেষ্ঠ॥
মর্কপদে কপি নঞে সদৃশার্থ কয়।
অতএব অমর্ক বানর তুল্য হয়॥

উত্তরাকাণ্ড ৯১১ পৃষ্ঠা।

অবশেষে রঙ্গভূমে—থিয়েটারে প্রহ্লাদচরিত্র অভিনীত হইতে দেখিলাম। ষণ্ডামর্ক দুটা, বাঁদর কি বনমানুষ, তাহার কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। মনে কষ্ট হইল, দুঃখ হইল, চোখে জল আসিল। ভাবিলাম, পবিত্র প্রহ্লাদ-চরিত্র আজ কলঙ্কিত হইল। ভক্তিরসে নিদারুণ হাস্যরস মিশিয়া, এক অনির্ব্বচনীয় বীভৎসরসের সৃষ্টি হইয়াছে।

থিয়েটারে ষণ্ডামর্ককে কি প্রণালীতে অঙ্কিত করিয়াছেন, প্রথমত তাহা দেখাইব।

রঙ্গভূমে

ষণ্ড ও অমর্কের প্রবেশ।

ষণ্ডামর্ক। জয়োহস্তু।

ষণ্ড। মহারাজ! আজ কনিষ্ঠ রাজকুমারের হাতে খড়ি দেওয়ার ইচ্ছা করেছেন না কি?

হিরণ্য। হাঁ গুরুপুত্র!

ষণ্ড। ভাল ভাল, আজ বড় শুভদিন, এমন দিন আর হ'বে না, তা হয়নি তো পরের কথা। পাঁজিতে লিখেছে—আজ ছেলের হাতে দিলে খড়ি, হয়, হাতে র'বে পাঁচন-বাড়ি, নয়, হাতে হ'বে খুব টাকা কড়ি। অর্থাৎ হয়, ছেলে রাখাল হ'বে, নয়, ধনশালী ভূপাল—ভূপাল। তবে আপনার কল্যাণে আর আমাদের মত গুরুর হস্তে ছেলে রাখাল—ওঁ বিষ্ণুঃ—উহুঁ ওঁ শিবঃ—ভূপাল ভূপাল—নিশ্চয় ভূপাল।

হিরণ্য। আমার গুরুদেব এবং আপনাদের পিতৃদেব শুক্রাচার্য্য কবে তপস্যায় গিয়াছেন?

ষণ্ড। ঠিক আমার স্মরণ হ'চ্চে না। (অমর্কের প্রতি) —ভায়া! তোমার মনে আছে?

অমর্ক। আছে আছে, আমার শিবস্তোত্র পুঁথির এক কোণে লেখা আছে। কল্য বল্‌বো, মহারাজ! তা'য় আর চিন্তা কি? তবে আবার তাঁ'কে কেন?

হিরণ্য। তিনি আপনাদের পিতা, আমার কুল-পুরোহিত, তাঁ'র দ্বারা প্রহ্লাদের বিদ্যারম্ভ—

ষণ্ড। একই কথা,—কেননা তিনি পিতা—আমরা পুত্র, "নরাণাং মাতুলক্রমঃ"! চিন্তা কি? আমাদের হ'তেই কার্য্য-সিদ্ধি হ'বে—প্রহ্লাদের সিদ্ধিরস্তু হ'বে—আঁকুড়ে 'ক' হবে—বেগুনে 'চ' হবে—শেষ হলুহলে 'হ' হ'বে—সব হ'বে।

হিরণ্য। (স্বগত)—অমন মহাপণ্ডিতের এমন অকাল-কুষ্মাণ্ড পুত্রও হয়। উপযুক্ত পুত্র বটে, এই জন্যই শুক্রাচার্য্য নাম রেখেচেন—'ষণ্ড' = ষাঁড়, আর 'অমর্ক' = কি না বানরের চেয়েও বানর! কি করি, অদ্য দিন ভাল, কাজেই এদের দ্বারা নিয়ম রক্ষা করি। পরে তিনি এলে তখন যথাবিহিত বিদ্যা শিক্ষা হ'বে। (প্রকাশ্যে) তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন কি?

অমর্ক। অবিলম্বেই কার্য্যসিদ্ধি। কনিষ্ঠ রাজকুমার কোথা?

হিরণ্য। দাসী আন্‌তে গিয়াছে।

অমর্ক। এখনি আস্‌বেন বোধ হয়?

হিরণ্য। হাঁ।

ষণ্ড। তা তো হলো, এখন গুরুদক্ষিণাটার ব্যবস্থা—

হিরণ্য। তা'র চিন্তা কি? আমার অপর তিন পুত্রের বিদ্যারম্ভের দক্ষিণার চেয়েও বাহুল্যরূপে আয়োজন—

ষণ্ড। ভাল ভাল—জয় হোক; প্রহ্লাদ তিন গুণ বিদ্বান্

হোক। আহা, বড় সন্তুষ্ট হ'লাম, এতেও যদি সন্তুষ্ট না হই তো হ'ব কিসে? কারণ শাস্ত্রে লিখ্‌চে—অসন্তুষ্টা দ্বিজা নষ্টাঃ"—

অমর্ক। "সন্তুষ্টা ইব পার্থিবাঃ।"

দাসীর সহিত প্রহ্লাদের পুনঃ প্রবেশ।

হিরণ্য। প্রহ্লাদ! গুরুপুত্র দোঁহে কর রে প্রণাম। আপনারা প্রহ্লাদকে নিয়ে যান। আমি চল্লেম। (প্রস্থান)।

প্রহ্লাদ প্রণিপাত করি পায়।

ষণ্ড। ও দাসি! তুই যা, দেখ্ দক্ষিণের কত দূর কি?

(দাসীর প্রস্থান।)

(প্রহ্লাদের প্রতি)—কি বল্‌চ, বাপু?

প্রহ্লাদ। প্রণিপাত করি পায়।

ষণ্ড। খুব লেখা পড়া শেখো, বাবা আমার! কারণ 'লিখিবে পড়িবে মরিবে দুখে, মৎস্য ধরিবে খাইবে সুখে।'

অমর্ক। আঃ, ও কথা বল কেন দাদা? বল, "লিখিবে পড়িবে থাকিবে সুখে, খেলা করিবে মরিবে দুখে।"

ষণ্ড। দূর পাগল, ও কথা ব'ল্লে কি ছেলে লেখাপড়া শেখে?

অমর্ক। (বিকৃতমুখে)—আহা-হা! দাদা, তোমার কি বুদ্ধি, বাবা! তুমি নেহাত মুক্ষুর ডিম্!

ষণ্ড (বিকৃতমুখে)—তুই যে আবার তার চেয়ে এক কাঠি বেশী—নিরেট মুক্ষুর বাচ্ছা।

অমর্ক। যাও যাও—বোঝা গেছে—মিছে ফ্যাঁচ্ ফ্যাঁচ কোরোনা—যাও।

ষণ্ড। (শান্ত হইয়া)—আচ্ছা আমি একে নিয়ে যাচ্চি তুই গুরুদক্ষিণের ভারীকে সঙ্গে আন্। দেখিস্, ভাই, ভারী ব্যাটাকে চোকের আড়াল করিস্‌নি। তা হ'লেই বুঝেছিস্ তো?—

অমর্ক (সহাস্যে)—ওঃ—তা খুব বুঝি।

ষণ্ড। (সহাস্যে)—আচ্ছা, কি বল্ দেখি?

অমর্ক। ভারী ব্যাটা ফুস্ মন্তরের চোটে ভরা ঝোড়া খালি ক'রে বস্‌বে।

ষণ্ড। তবে কে বলে ভায়ার বুদ্ধি নেই!

অমর্ক। তবু, দাদা তোমার চেয়ে নয়।

ষণ্ড। (সহাস্যে)—হাজার হোক্, আমি দাদা—তুই ভাই।"

এই কথোপকথনে কি বুঝিলাম?—বুঝিলাম, ষণ্ড এবং অমর্ক নিরেট মূর্খ; একটু ছিট্‌গ্রস্ত; লোভী, দুরাশয়; অসভ্যতা, অভব্যতা আছে; দাদাকে বাবা বলাও আছে। আবার তৃতীয় দৃশ্যে ষণ্ডামর্কের পাঠশালা দেখুন, তাহাতেও বীভৎসরস আছে। আর হরদম দাদাকে বাবা বলা আছে। এ নীচতায় যে, কি রসিকতা হয় তাহাও বুঝি না। চতুর্থ দৃশ্যে রাজসভায় রাজসমীপে ষণ্ডামর্ক সংস্কৃত বিদ্যার এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন।

হিরণ্য। ত্রিবর্গ-সাধন-সূত্র অধ্যাপিত করেছ কি প্রহ্লাদের?

ষণ্ড। না, মহারাজ, এখনো অতদূর হয় নি।

হিরণ্য। কেন?

ষণ্ড। "শনৈঃ পন্থা, শনৈঃ কন্থা, শনৈঃ পর্ব্বত-লঙ্ঘনম্।"

অমর্ক। (স্বগত)—দাদা, ফক্ করে একটা সংস্কৃত শ্লোক ঝাড়্‌লে, হয় তো খাসা বিদেয় পা'বে, আর আমার বেলা বুঝি নব-ডঙ্কা? না বাবা, তা হবে না, আমিও একটা ঝাড়ি।

(ষণ্ডের প্রতি) কি শ্লোকটা বল্লে দাদা?

ষণ্ড। "শনৈঃ পন্থা, শনৈঃ কন্থা, শনৈঃ পর্ব্বত-লঙ্ঘনম্।"

(হস্তে তাল দিতে দিতে)—

অমর্ক। শনৈঃ তন্তা, শনৈঃ ধিন্তা, তাধিন্ধিন্তা তরকট ত্যাং।

হিরণ্য। (সহাস্যে)—কনিষ্ঠ গুরুপুত্রের কণ্ঠে সাক্ষাৎ সরস্বতী বিরাজমানা।

অমর্ক। ভবৎ প্রসাদাৎ—ভবৎ প্রসাদাৎ।

আর অধিক পরিচয় দিবার স্থান নাই। ইহাতেই মোটামুটী ষণ্ডামর্ক-চরিত্র বুঝিতে পারিলাম। সেই মহাতেজস্বী দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের পুত্রদ্বয় এরূপ কিম্ভূতকিমাকার বিতিকিচ্ছি-আঁটকুড়ির পুত গোছ হইল কেন? এ কথার কোথাও মীমাংসা নাই। ভক্তি-রসে সঙ-রস মিশিলে এক "অদ্ভুত-রস" তৈয়ার হয়। ক্ষীরের সহিত মাছের ঝোল মিশিলে, এক অনির্ব্বচনীয় আস্বাদন হয়। কর্ম্মটা বড়ই

কুকর্ম্ম হইয়াছে। মুনি, ঋষি, আচার্য্য গুরুর এরূপ অধঃপতনে সমাজের বড়ই অমঙ্গল আছে। যদি দেবতাকে বাঁদর দেখি,—তাহা হইলে দেবতায় ভক্তি সমূলে লোপ পায়।

এক্ষণে দেখাইব, ষণ্ডামর্ক সঙ নহেন, বাঁদর নহেন, বনমানুষ নহেন। তাঁহারা পরম জ্ঞানী এবং পণ্ডিত। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে—শ্রীমদ্ভাগবতে এবং বিষ্ণুপুরাণে প্রহ্লাদচরিত্রের কথা সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। এই দুইটী গ্রন্থই প্রহ্লাদ-চরিত্রের মূল;—এই মূল ভাঙ্গিয়া, আমরা বাঙ্গালা কাব্য নাটক লিখিতে গিয়া প্রহ্লাদ-চরিত্রকে বিকৃত ভাবাপন্ন করিয়া ফেলিয়াছি। শ্রীমদ্ভাগবতে ষণ্ডামর্ক-সম্বন্ধে কি লিখিত আছে দেখুন;—

"নারদ কহিলেন, নরনাথ! অসুরেরা ভগবান্ শুক্রকে পৌরোহিত্য-কার্য্যে বরণ করিয়াছিল। তন্নিবন্ধন ষণ্ডামর্ক-নামে তাঁহার দুইটী পুত্র, দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু গৃহসমীপে বাস করিতেন। দৈত্যরাজ নীতিকোবিদ্ প্রহ্লাদকে বাল্য-কালে তাঁহাদের নিকট অধ্যয়ন করিতে পাঠাইয়াছিল। তাঁহারা প্রহ্লাদ এবং অন্যান্য অসুর বালকগণকে দণ্ডনীতি প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইতেন। গুরুগৃহে গুরু যাহা উপ-দেশ দিতেন, প্রহ্লাদ তাহা শুনিতেন এবং শ্রবণানন্তর অবি-কল পাঠ করিতেন, কিন্তু ঐ সমস্ত উপদেশ "এই আত্মীয়, এই পর" এতদ্রূপ মিথ্যাভিনিবেশে পরিপূর্ণ দেখিয়া মনে মনে উৎকৃষ্ট বলিয়া জ্ঞান করিতেন না।

"নারদ কহিলেন, মহামতি প্রহ্লাদ এই প্রকার কহিয়া বিরত হইলে, সুদান রাজসেবক (প্রহ্লাদ-শিক্ষক) ক্রোধানলে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল এবং ক্রোধ বশত তাঁহাকে ভৎসনা করিয়া কহিতে লাগিল। অরে শীঘ্র বেত আনয়ন কর; এ পাষণ্ড আমাদের অযশঃ-কীর্ত্তন করিতেছে, সামাদি চতুর্ব্বিধ উপায়ের মধ্যে চতুর্থ উপায় দণ্ডই এ দুর্ব্বুদ্ধি কুলাঙ্গারের পক্ষে শাস্ত্র-বিহিত। (কি আক্ষেপের বিষয়!) দানবরূপ চন্দন-কাননে এই পাষণ্ড কণ্টক বৃক্ষস্বরূপ হইয়া জন্মিয়াছে; ঐ বনের উন্মূলন-বিষয়ে বিষ্ণু পরশু অর্থাৎ কুঠারস্বরূপ; এই অর্ভক তাহার নাল অর্থাৎ দণ্ডস্বরূপ। পাণ্ডবনাথ! রাজসেবক এইরূপ তর্জ্জনাদি বিবিধ উপায় দ্বারা প্রহ্লাদকে ভয়প্রদর্শন করিয়া ধর্ম্ম অর্থ কাম ত্রিবর্গের উপপাদক যে শাস্ত্র, তাহা অধ্যয়ন করাইলেন।"

ভাগবত হইতে ঐ উদ্ধৃত অংশদ্বয় পাঠে কি বুঝিলাম? ষণ্ডামর্ক দণ্ডনীতি শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ। ধর্ম্ম অর্থ কাম ত্রিবর্গের উপপাদক যে শাস্ত্র, তাহাও তাঁহারা জানিতেন। প্রহ্লাদ যখন কিছুতেই বিষ্ণু-কথা ভুলিলেন না, তখন দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপু ঘোরতর চিন্তায় ম্লান হইয়া উঠিলেন। ষণ্ডামর্ক তাঁহাকে এইরূপ বুঝাইতে লাগিলেন;—

"অনন্তর শুক্রাচার্য্যের দুই পুত্র ষণ্ডামর্ক দৈত্যরাজকে চিন্তান্বিত দেখিয়া নির্জ্জনে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, নাথ! আপনি একাকী হইয়া ত্রিলোক জয় করিয়াছেন। আপন-

কার ভ্রূভঙ্গীদ্বারাই সমস্ত লোকপাল নিরস্ত হয়। আপনকার চিন্তার বিষয় কিছুই ত দেখি না।" প্রহ্লাদের আচরণ-জন্য চিন্তিত হইবেন না; সে বালক; শিশুদিগের আচরণ কখনও গুণ বা দোষের আস্পদ নহে। তথাপি যাবৎ আপনকার গুরু শুক্রাচার্য্য আগমন না করেন, তাবৎকাল বরুণ-পাশদ্বারা প্রহ্লাদকে বন্ধন করিয়া রাখুন যে, ভীত হইয়া পলায়ন করিতে না পারে। প্রভো! বয় বা আর্য্যসেবা দ্বারা পুরুষদিগের বুদ্ধি অতিশয় নির্ম্মল হয়। দৈত্যপতি তথাস্তু বলিয়া গুরুপুত্রদিগের উপদেশ অনুমোদন করিল এবং কহিল, আপনারা ইহাকে গৃহাশ্রমী রাজার ধর্ম্ম উপদেশ করুন।"

"অনন্তর, ষণ্ডামর্ক প্রহ্লাদকে ধর্ম্ম অর্থ কাম আনুপূর্ব্বিক সমস্ত উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। প্রহ্লাদও প্রশ্রিত ও অবনত হইয়া তাহা শুনিতে লাগিলেন। কিন্তু ঐ ত্রিবর্গ অর্থাৎ ধর্ম্ম অর্থ কাম যথানিয়মে অধীত হইলেও বিষয়বাসনা-নিরত গুরু কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার চিত্তে সাধু বোধ হইল না।"

পাঠক! এইবার বিষ্ণুপুরাণ দেখুন,—ষণ্ডামর্ক সঙ সাজেন নাই;—

"পরাশর কহিলেন, অনন্তর পৌরোহিত্য-কার্য্যে নিযুক্ত বাগ্মী মহাত্মা ষণ্ডামর্ক প্রভৃতি ভার্গবতনয়গণ দৈত্যরাজকে স্তব করিয়া সান্ত্বনাপূর্ব্বক বলিলেন, রাজন্! আপনি যখন

দেবগণের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তখন আপনার ক্রোধ সফল হইয়াছে, অতএব আপনকার এই পুত্রটী কনিষ্ঠ বালক ও ঔরসসন্তান, সুতরাং আপনি ইহার প্রতি যে ক্রোধ করিয়াছেন, তাহা পরিহার করুন। রাজন্! আমরা (যতদূর সাধ্য যত্ন করিয়া) এই বালককে এরূপ সুশিক্ষিত করিব যে, (ভবিষ্যৎ-কালে) এই বালকই বিনীত হইয়া আপনকার শত্রুবংশ ধ্বংস করিতে থাকিবে। দৈত্যরাজ! যখন দেখা যাইতেছে যে, বালকতা সকল দোষেরই আস্পদ, তখন এই শিশুটীর প্রতি, সাতিশয় ক্রোধান্বিত হওয়া আপনকার উচিত হইতেছে না। এই বালক, আমাদের কথানুসারে যদি দৈত্যারি বিষ্ণুর পক্ষ পরিত্যাগ না করে, তাহা হইলে, আমরা ইহার বিনাশের নিমিত্ত অভিচার করিব। আমাদের সেই অভিচার মন্ত্র কিছুতেই বিফল হইবার সম্ভাবনা নাই।"

আর অধিক উদ্ধৃত করিবার স্থান নাই। কেহ কেহ বলেন, নাটক নবেল লিখিতে হইলে, পৌরাণিক চরিত্র একটু বিকৃত ভাবে না গড়িলে চলে না। এ কথা বড়ই ভ্রমাত্মক। মহাভারতীয় শকুন্তলা আঁকিতে গিয়াও কালিদাসের হাত কাঁপিয়াছে। বেদব্যাসের সেই তেজস্বিনী শকুন্তলাকে, কালিদাস নিতান্ত মৃদুমধুর-হাসিনী সলজ্জ, সজলনয়না করিয়া ফেলিয়াছেন। সেই দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ সত্যব্রত, রাবণ-দমন রাম-চন্দ্র, মহাকবি ভবভূতির হাতে পড়িয়া উত্তররামচরিতেও বড়ই নবীন, নধর, কোমল হইয়াছেন। তাই বলি, পৌরাণিক

চিত্র আঁকা অতি কঠিন কর্ম্ম। যাঁহারা দেব, মুনি, ঋষি, রাজর্ষির চরিত্র এইরূপে কলঙ্কিত করেন, তাঁহাদের পাপ বড়ই গুরুতর।

ব্রাহ্মণ।

একদিন একজন "শিক্ষিত যুবক" প্রশ্ন জিজ্ঞাসিলেন—, "গলায় পৈতা দিলেই কি বামুণ হয়?" আমি বলিলাম, "যে ব্রাহ্মণ, তার গলায় ত পৈতা থাকিবেই।"

যুবক বলিলেন, "আমি ওকথা জিজ্ঞাসি নাই। আমার বক্তব্য এই,—এই দেখুন, যাহারা গলায় পৈতা দিয়া, ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেয়, চাটুর্য্যে, মুখুর্য্যে উপাধি ধারণ করে—অথচ এদিকে পশুবৎ আচরণ করে, শূদ্রের হুঁকা ধরিয়া টানে, বেশ্যা-বাড়ী পূজা করে, বেশ্যার দান গ্রহণ করে, মদমাংস খায়, অথবা দোকানে বসিয়া মদ-মাস বেচে, সায়ং-সন্ধ্যাবিহীন,—কেবল গলায় পৈতা আছে বলিয়া কি তাহা-দিগকে আমি ব্রাহ্মণ বলিব? না, দূর হইতে দেখিলে, সসম্ভ্রমে উঠিয়া প্রণাম করিব? না, তার চরণামৃত পান করিয়া ভববন্ধন হইতে মুক্তি পাইব? আমি শূদ্র বটি—কিন্তু আমি ঐ নরপশুবৎ ব্রাহ্মণকে সাষ্টাঙ্গে প্রণামও করিতে পারিব না,—আর ঐ সমল ফাটা পায়ের ধুলামিশ্রিত জলও পান করিব না; ইহাতে আপনি আমাকে হিন্দু বলিতে হয়

বলুন, খৃষ্টান বলিতে হয় বলুন, মহাপাপী বলিয়া সম্বোধন করুন,—কিছুতেই আপত্তি করিব না।"

আমি বলিলাম,—"হঠাৎ কোন বিষয়ে এরূপ ক্রোধের ভাব প্রকাশ করিবেন না। পড়ুন, বুঝুন, ভাবুন, শিখুন, একটী কথা আগে শুনুন। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রকে, ব্রাহ্মণ কখন তাঁহার নিকট প্রণত হইতে বলেন না। শূদ্র যে, ব্রাহ্মণকে প্রণাম করেন, তাহা ব্রাহ্মণের গৌরব বৃদ্ধির জন্য নহে। শূদ্র যদি ব্রাহ্মণকে প্রণাম না করে, তাহাতে ব্রাহ্মণের ক্ষতি বা লাঘব কিছুই নাই। ব্রাহ্মণকে সম্মান বা প্রণাম করিয়া যা কিছু লাভ বা উপকার, তাহা শূদ্রের নিজের। কোন শূদ্র ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিল না বলিয়া, ব্রাহ্মণ যদি আপন গৌরব হানি হইল মনে করেন, তবে সে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণই নহেন। ব্রাহ্মণ, গৌরব সম্মানের অতীত। ব্রাহ্মণের পদধৌত জল আপনি নাই বা পান করিলেন, তাহাতে ব্রাহ্মণের আসিয়া যায় কি? তবে এ কথা শতবার স্বীকার্য্য, ব্রাহ্মণকুল জীবনীশক্তি হারাইয়াছেন। অনেকের দশা এমন হইয়াছে যে, তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিতেও লজ্জা বোধ হয়। এ সম্বন্ধে আমি আপনার কোন কথারই বিরোধী নহি। পোড়া উদরের জন্য ব্রাহ্মণ এখন বিব্রত। আজ মুচির বাড়ীতে লুচি পেলেও ব্রাহ্মণ ছাড়েন না। ছাঁদা লইবার দৌরাত্মই বা কত! কাঙ্গালি ভাটের ন্যায় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বিদায়ের জন্য ঝগড়া করে। ব্রাহ্মণের সেই ব্রহ্মতেজ একেবারেই বিলুপ্ত হইয়াছে।

মহাবীর আলেকজান্দার পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ-বিজয় করিতে সক্ষম হন নাই। আলেকজান্দার ভারতবর্ষ জয় করিয়া প্রীতিপ্রফুল্লমনে, ভারতে থাকিয়া বিজয়-বিলাস সম্ভোগ করিতেছেন; এমন সময় তিনি শুনিলেন, দণ্ডাচার্য্য নামে একজন পরমজ্ঞানী মূর্দ্ধাপণ্ডিত ব্রাহ্মণ অদূরবর্ত্তী আশ্রমে বাস করেন। সাধারণত রাজাদের এই ইচ্ছা, পণ্ডিতকুল তাঁহাদের অনুগত থাকে, রাজসভার অলঙ্কার-স্বরূপ হইয়া, সভার শোভা বাড়ায়। আলেকজান্দার দণ্ডকে ডাকিতে পাঠাইলেন। গ্রীকপণ্ডিত অনেসিক্রেটিস, দণ্ডকে আহ্বান করিতে যাইয়া এইরূপ রাজাজ্ঞা জানাইল, "হে দণ্ড! আপনি রাজসকাশে উপস্থিত হইলে, অপার পারিতোষিক-দানে রাজা আপনাকে সন্তুষ্ট করিবেন। যদি না যান, তবে আপনার মস্তক ছেদন হইবে!"

দণ্ড উত্তর দিলেন, "আলেকজান্দারকে বল, ব্রাহ্মণেরা সম্পত্তি চাহে না, মৃত্যুকেও ভয় করে না। আলেকজান্দারের নিকট এমন কিছুই নাই যাহার জন্য আমি লোলুপ! কিন্তু রাজার যদি কিছু প্রার্থনীয় থাকে, তবে তিনি আমার নিকট আসিতে পারেন।" আজ ব্রাহ্মণের সে তেজ আছে কি?

এখন যদি বাঙ্গালার ছোটলাট কোন ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে বলিয়া পাঠান,—"আপনি একবার আসিয়া আমার সহিত দেখা করিবেন,—কিছু পারিতোষিক পাইবেন।" আর কি রক্ষা আছে? ব্রাহ্মণ মনে মনে বলিবেন,—"আঃ বাঁচিলাম,

হাতে চাঁদ পাইলাম, বুঝি আমার একাদশ বৃহস্পতির দশা উপস্থিত।" তারপর তিনি ছোটলাটের নিকট গিয়া সেলামের উপর সেলাম বৃষ্টি করিয়া তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িবার উপক্রম করিবেন। এই ত ব্রাহ্মণের অবস্থা! প্রকৃত ব্রাহ্মণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না,—শূদ্র, নিষাদ, পশু, ম্লেচ্ছ, চণ্ডালজাতীয় ব্রাহ্মণেরই আজ বিশেষ প্রাদুর্ভাব। আজ ব্রাহ্মণ, আজ বাউর্চি, ব্রাহ্মণ ফেরিওয়ালা!

শিক্ষিত যুবক জিজ্ঞাসিলেন, "চণ্ডাল-ব্রাহ্মণ, ম্লেচ্ছ-ব্রাহ্মণ কিরূপ?"

আমি বলিলাম—"চোখের উপর যে সমস্ত ব্রাহ্মণ সতত দেখিতেছেন—তাহার পনের আনা উনিশ গণ্ডা ম্লেচ্ছ, চণ্ডাল, পশুজাতীয় ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ ধর্ম্মত লুপ্তপ্রায়! তাল পুকুরের নামটা আছে, তাল গাছ নাই বলিলেই হয়।"

যুবক জিজ্ঞাসিলেন,—"শাস্ত্রে কি সত্য সত্যই চণ্ডাল প্রভৃতি ব্রাহ্মণের কথা আছে?"

আমি বলিলাম, "আছে বৈ কি? যে ব্যক্তি প্রকৃত ব্রাহ্মণ নয়, তাহাকে কি ব্রাহ্মণ বলিয়া পূজা করিতে হইবে? এ সম্বন্ধে যাহা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা আজ আপনাকে কতক বলি শুনুন;—

"যেমন মনুষ্যগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারিবর্ণে বিভক্ত; তদ্রূপ ব্রাহ্মণগণ আবার দশ শ্রেণীতে বিভক্ত; অত্রিসংহিতায় লিখিত আছে;—

দেবো মুনির্দ্দিজো রাজা বৈশ্যঃ শূদ্রো নিষাদকঃ।
পশুর্ম্লেচ্ছোঽপি চণ্ডালো বিপ্রাঃ দশবিধাঃ স্মৃতা।

স্ব স্ব গুণক্রিয়ানুসারে ব্রাহ্মণগণ, মুনি, দ্বিজ, রাজা, বৈশ্য, শূদ্র, নিষাদ, পশু, ম্লেচ্ছ, চণ্ডাল, এই দশ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন।

সন্ধ্যাং স্নানং জপং হোমং দেবতা-নিত্যপূজনং।
অতিথিং বৈশ্বদেবঞ্চ দেব-ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥

যে ব্রাহ্মণ শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারা শাস্ত্রসারার্থ গ্রহণপূর্ব্বক যথাবিধি সন্ধ্যার উপাসনা ও স্নান, প্রণব ও গায়ত্র্যাদির অর্থ-ভাবনা, হোম, দেবতাপূজন, অতিথিসৎকার ও বিশ্বদেব-কৃত্যাদি অহরহঃ অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাকে "দেব-ব্রাহ্মণ" বলা যায়।

শাকে পত্রে ফলে মূলে বনবাসে সদা রতঃ।
নিরতোঽহরহঃ শ্রাদ্ধে স বিপ্রো মুনিরুচ্যতে॥

যে ব্রাহ্মণ প্রথম বচনোক্ত গুণসম্পন্ন হইয়া বিশেষত শাক, পত্র, ফল, মূলাদি দ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করত বানপ্রস্থ্য গ্রহণ করেন, এবং অহরহঃ শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাকে মুনি-ব্রাহ্মণ বলা যায়।

"বেদান্তং পঠতে নিত্যং সর্ব্বসঙ্গং পরিত্যজেৎ।
সাংখ্যযোগবিচারস্থঃ স বিপ্রো দ্বিজ উচ্যতে॥

যিনি প্রথমোক্ত "দেব-ব্রাহ্মণের" লক্ষণযুক্ত হইয়া, স্বর্গাদি-রূপ কর্ম্মফলে আকাঙ্ক্ষাশূন্য অথচ মোক্ষকামনায় আত্ম-

তত্ত্বানুসন্ধানপুর্ব্বক বেদান্তাধ্যয়ন ও সাংখ্যাদি যোগশাস্ত্র দ্বারা তাহার বিচারণা করেন, তিনি "ব্রাহ্মণ-দ্বিজ" নামে অভিহিত হয়েন।

অস্ত্রাহতাশ্চ ধন্বানঃ সংগ্রামে সর্ব্বসম্মুখে।
আরম্ভে নির্জ্জিতা যেন স বিপ্রঃ ক্ষত্র উচ্যতে।

যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়োচিত অধ্যয়ন ও ধর্ম্মানুষ্ঠানপরায়ণ অর্থাৎ যিনি রণক্ষেত্রে ধনুর্দ্ধারী হইয়া আহত প্রত্যাহত করেন, বিপক্ষকে সাঘাত করেন ও ক্ষত্রিয়জনোচিত ভোগের অভিলাষী, তাঁহাকে "ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ" বলা যায়।

কৃষিকর্ম্মরতো যশ্চ গবাঞ্চ প্রতিপালকঃ।
বাণিজ্যব্যবসায়শ্চ স বিপ্রো বৈশ্য উচ্যতে॥

যিনি বৈশ্যোচিত অধ্যয়ন ও কর্ম্মানুষ্ঠান করত কৃষিকর্ম্মে রত থাকেন, গোপালক ও বাণিজ্যব্যবসায়ী হয়েন, তাঁহাকে "বৈশ্য-ব্রাহ্মণ" বলা যায়।

লাক্ষা-লবণসংমিশ্রং কুসুম্ভং ক্ষীরসর্পিষঃ।
বিক্রেতা মধুমাংসানাং স বিপ্রঃ শূদ্র উচ্যতে॥

যে ব্রাহ্মণ যৎকিঞ্চিৎ অধ্যয়নবান্ এবং লাক্ষালবণ-সংমিশ্র বস্তু, কুসুম্ভ, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও মাংসাদি বিক্রয় করে, তাহাকে "শূদ্র-ব্রাহ্মণ" কহা যায়।

চৌরশ্চ তস্করশ্চৈব সূচকো দংশকস্তথা।
মৎস্যমাংসে সদা লুব্ধো বিপ্রো নিষাদ উচ্যতে॥

যে ব্রাহ্মণ কিঞ্চিৎ অধ্যয়ন বিশিষ্ট হইয়া; চৌর, (বিদ্বান্ ও

ধার্ম্মিক না হইয়া তাঁহাদিগের ন্যায় বাহে প্রকাশ করত সাধারণকে প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক বিদ্বান্ ও ধার্ম্মিকের প্রাপ্য বা ভোগ্য বস্তু, যে ব্যক্তি প্রতিগ্রহ বা ভোগ করে) তস্কর, (পরস্বাপহারক, উৎকোচাদি গ্রহণতৎপর ও প্রবঞ্চক) সূচক (পিশুনতা সাহস, দ্রোহ, ঈর্ষা, অসূয়া ও পারুষ্যাদিযুক্ত) দংশক (পরাপকারী) মৎস্য-মাংসে লোলুপ, তাহাকে "নিষাদ-ব্রহ্মণ" বলে।

ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
তেনৈব চ স পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥

যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মতত্ত্ব-জ্ঞানানভিজ্ঞ অথচ ব্রহ্মসূত্র বা যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া "আমি ব্রাহ্মণ" এই বলিয়া গর্ব্বিত, তিনি ঐ পাপ দ্বারা "পশু-ব্রাহ্মণ" বলিয়া কথিত হয়েন।

বাপীকূপ-তড়াগানামারামস্য সরঃসু চ।
নিঃশঙ্কং রোধকশ্চৈব স বিপ্রো ম্লেচ্ছ উচ্যতে॥

যে ব্রাহ্মণ শাস্ত্রতত্ত্বার্থ-বিহীন এবং বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠান-পরাঙ্মুখ অথচ পর কর্ত্তৃক পরোপকারার্থ প্রস্তুত বাপী, কূপ, তড়াগ, আরাম, জলাশয়াদির নিঃশঙ্কচিত্তে অবরোধ করে তাহাকে "ম্লেচ্ছ-ব্রাহ্মণ" বলে।

ক্রিয়াহীনশ্চ মূর্খশ্চ সর্ব্বধর্ম্ম-বিবর্জ্জিতঃ।
নির্দ্দয়ঃ সর্ব্বভূতেষু বিপ্রশ্চাণ্ডাল উচ্যতে॥

যে ব্রাহ্মণ বেদোক্ত ক্রিয়াবিহীন এবং সর্ব্বপ্রকার

বৈদিক ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত, শাস্ত্রতত্ত্বানভিজ্ঞ শিশ্নোদরপরায়ণ ও নিষ্ঠুর তাহাকে "চণ্ডাল-ব্রাহ্মণ" কহা যায়।

এখন বুঝিলেন, ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে? তাই বলি, না বুঝিয়া না জানিয়া হঠাৎ চটিয়া উঠিবেন না। হিন্দুর শাস্ত্রের মত এমন উদার, অপক্ষপাতী শাস্ত্র আছে কি?

দুঃখ এই, কলির প্রাদুর্ভাবে, ব্রাহ্মণধর্ম্ম একরকম লুপ্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ আপন অস্তিত্ব হারাইয়াছে। আজ ঘরে ঘরে চণ্ডাল-ব্রাহ্মণ, ম্লেচ্ছ-ব্রাহ্মণ বিচরণ করিতেছে। রক্ষক কে, উদ্ধারকর্ত্তা কে? এই একটানা স্রোত আর কতদিন বহিবে?

শিক্ষিত বাবু প্রশ্ন জিজ্ঞাসিলেন, "তবে কি আমি ম্লেচ্ছ-ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিব না?"

উত্তর। সে তোমার ভক্তি প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করিতেছে। আম গাছ কখন আমড়া গাছ হয় না। আম গাছের আম টক হইতে পারে, আম গাছ বাঁজা হইতে পারে, কিন্তু আম গাছ, আম গাছই থাকিবে। ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ থাকিবেন। তোমার এখন যেরূপ প্রবৃত্তি, মতি, গতি, সেই ভাবেই তাঁহার সহিত ব্যবহার করিবে। তাহাতে বাধা দিবে কে? কিন্তু একটা কথা বলিয়া রাখি,—তোমার কর্ত্তব্য কাজ তুমি নিজে করিবে। আত্মশ্লাঘা বশত অভিভূত হইও না।

জাল রাজনীতি।

বাঙ্গালীর রাজনীতি অর্থে গলাবাজী; আন্দোলন অর্থে লম্ফঝম্ফ; স্বদেশভক্তি অর্থে ইংরেজকে বেছুট গালাগালি।

আজকাল কয়েকটী বিশ্ব-প্রেমিক "শিক্ষিত" বাবু, বঙ্গের দুই চারিটী স্থানে, রাজনৈতিক ধূলাখেলা,—বিকট চিৎকার আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাঁদের মনের ভাব কি, তা জানি না,—তবে রঙ্গভঙ্গ, কাজকর্ম্ম দেখিয়া মনে হয়, ইহা যেন বিঘূর্ণিত মস্তিষ্কের প্রলাপ উক্তি।

কেহ কেহ বলেন, "তাহা নহে; ভারত উদ্ধারই ইহাঁদের জীবনের ব্রত।" কেহ বলেন, "আন্দোলন-ব্রহ্মাগ্নির দ্বারা ইংরেজকে বিভীষিকা দেখাইয়া, ভারতবাসীর স্বত্বসাব্যস্ত করাই ইহাঁদের চিরসঙ্কল্প।" কেহ বলেন, "ইহাঁরা লোকযশঃপ্রার্থী লোক-সমাজে কিসে যে, ইহাঁরা বঙ্গীয়-ম্যাটসিনি, নামে অভি-হিত হন, ইহাই উদ্দেশ্য।" কেহ বলেন, "এ সমস্তই ভুল, এই কথাটীই সার;—রাজনৈতিক আন্দোলন দ্বারা ইহাঁরা গবর্ণ-মেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেন; ক্রমশ ইংরেজরাজ ইহাঁদিগকে এক একটী জীবন্ত বঙ্গীয় বাঘ মনে করিতে থাকিবেন; অবশেষে ভয়ে ভীত হইয়া, ইংরেজ ইহাঁদিগকে লাট-কাউন্সিলের মেম্বর পদ, না হয়, অনরারি-মাজিষ্টরের পদ দিবেন। তখন ভবধামের মোক্ষপদ পাইয়া, বিশ্ব-প্রেমিকগণ কেবল সুখসাগরে সাঁতার দিতে থাকিবেন।"

এইত, নানা জনে নানা কথা কয়। এ বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব কি, তাহা সুধীগণ আপনাপন মনে মনে বুঝিবেন। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করেন, "এই দুই তিন মাস মধ্যে হঠাৎ রাজনৈতিক আন্দোলন বঙ্গীয়-গগনে এতটা ব্যাপিয়া পড়িল কেন? এ রহস্য উদ্ভেদ করিতে আমরা সম্যক্‌রূপে সমর্থ হই নাই। কিন্তু কোন পরিচিত লোকের মুখে এ বিষয়ে যেরূপ শুনিলাম, তাহাই এখানে লিখিত হইল। প্রায় চারি মাস হইল, কয়েকটী বিজ্ঞ বহুদর্শী লোকের যত্নে ঝিক্‌রাগাছায় প্রজা-সভার দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। কিন্তু সে সভায়, সে যজ্ঞে, শিবের সমাদরে নিমন্ত্রণ হয় নাই; অথবা নিমন্ত্রিত হইয়াও অভিমান-ভঙ্গ-ভয়ে, মহাদেব তথায় গমন করেন নাই। শিব অভাবে যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইল দেখিয়া চণ্ডরাজ ধূর্জটির ক্রোধের আর সীমা রহিল না। "আজ সৃষ্টি সংহার করিব, পৃথিবী অতলতলে ডুবাইব,—এক মাসে একাকী আমি শত শত সভা করিব, সমগ্র জগৎ আমার ক্ষমতা দেখুক" —এই বলিয়া ভবানী-পতি ভূতভাবন ভগবান্ মল্লবেশে রঙ্গক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন; তারপর, বঙ্গে রাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ হইল।

আন্দোলনের ইতিহাস যাহাই হউক, সভাসমিতিতেও যে সকল ভদ্র সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি গমনাগমন করেন, তাঁহাদের অনেকেই নিরপরাধ। তাঁহারা ভাল ভাবেই সভায় যান, কিন্তু কাণ্ড দেখিয়া চমকিত হন, কেহ বা উপরোধ অনুরোধে খাতিরে

জেদে, পীড়াপীড়ি বশত সভাস্থ হয়েন। এইরূপ কোন এক সভায় একজন প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী উপস্থিত ছিলেন। একজন বক্তা সভামঞ্চে দাঁড়াইয়া, বঙ্গের জমীদারদলকে প্রথামত আঝাড়া গালাগালি দিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। বক্তৃতান্তে, সেই ভূম্যধিকারী দলপতিকে বলিলেন, "আমাদিগকে অপমান করিবার জন্যই কি এত সাদর সম্ভাষণ-সম্মানপূর্ব্বক ডাকিয়া আনা হইয়াছিল ?"

আন্দোলনে কি হয়, তাহা বোধ হয়, অনেকেই জানেন না। ইহাতে রাতারাতি একেবারে ভারতমাতা বড়মানুষ হয়েন। সর্ব্বরূপ চরম উন্নতি, দণ্ড দুই-তিন মধ্যে সাধিত হয়! অমাবস্যার পর দিনই শারদীয় শশধর নীলগগনে ষোলকলায় পূর্ণ হইয়া হাসিতে থাকেন। পাঁচ-মিনিটে পবন-নন্দন, গন্ধমাদন আনিয়া, বিশল্যকরণী, বাহির করিয়া, মৃতদেহে প্রাণ দেন।

সভার আয়োজন কিরূপ? পল্লীগ্রামের লোকে শুনিল, মাঠে একটা গান যাত্রা পরব হইবে; খেম্‌টা-নাচ, কবি, পুতুল-নাচ, নাগরদোলা,—এ সমস্তই থাকিবে। গ্রামবাসি-গণ মহানন্দে তামাসা দেখিতে আসিল। আসিয়া দেখে,—ও হরি! কোথাও কিছুই নাই,—কেবল এক আধটু ফ্লুট বাজিতেছে। শেষে তাহারা দেখিল, কয়েকটী বাবু, গলা চিরাইয়া চেঁচাইতেছে। আশা পূর্ণ হইল না দেখিয়া, গ্রামবাসিগণ নিরানন্দ-মনে ঘরে গেল। তার পর, সংবাদপত্রে ছাপা হইল, মহাসভায় ৪৯ হাজার ৯৯৯ জন লোক উপস্থিত।

সভার উপকরণ কি? এমন জিনিষটি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না,—যাহা সভায় নাই। ইস্তক ঠাকুর সেবা, চণ্ডীপাঠ, নাগাদ পাঁঠাকাটা ও ঢাকবাজান—সমস্তই আছে। সাড়েবাহান্নটী বক্কাল। নিরক্ষর কৃষককে রাজনীতির উচ্চগগনে তুলিয়া, আছাড় মারা হয়। মজা দেখুন, চাষার কাছে একদিনে এক সময়ে কতকগুলি প্রস্তাব করা হয়;—

(১) ভারত-শাসন সমালোচনার জন্য মহাসভা পার্লিয়া-মেণ্ট কর্ত্তৃক একটী অনুসন্ধান-সমিতি সংগঠিত হইবার প্রস্তাব হইয়াছিল, কিন্তু নানা কারণে এখন ঐ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইতে পারিতেছে না শুনিয়া এই সভা গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। যদি ঐ সমিতি নিযুক্ত হইবার কোন সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে এই সভার আন্তরিক ইচ্ছা যে, ভারত-প্রত্যাগত ভূতপূর্ব্ব রাজকর্ম্মচারিগণ যেন সেই সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত না হন।"

(২) দিন দিন দেশে যেরূপ শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতি হইতেছে ও সাধারণত মতের যেরূপ প্রাবল্য দেখা যাইতেছে, তাহাতে এদেশীয়দিগের মত গ্রহণানন্তর ভারতশাসন-কার্য্য পরিচালিত হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং এই সভার মত যে নিম্নলিখিত মত এ দেশের ব্যবস্থাপক সভাগুলি পুনর্গঠন হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

(৩) আফগান-সীমা নির্ণয়-ব্যাপারে গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায় ভারতসাম্রাজ্যের বিপদ্ আশঙ্কা করিয়া ভারতবাসী

রাজপ্রতিনিধির নিকট স্বেচ্ছা-সৈনিক হইবার জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের দ্বারা তাহা পরিত্যক্ত হওয়ায়, ভারতবাসীর বিশ্বাস ও রাজ-ভক্তির উপর অকারণ কলঙ্ক আরোপ করা হইয়াছে; তজ্জন্য এই সভা দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন ও আশা করেন যে, সেই আবেদন পুনর্বিচার হইবে।

(৪) জন্তুর উপদ্রব হইতে শস্য রক্ষা ও আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রের ব্যবহার নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু অস্ত্র-আইন প্রচলিত থাকায় তাহা হইবার যো নাই।

(৫) ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ ১লা নবেম্বরে আমাদের শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরী যে প্রকাশ্য ঘোষণাপত্র প্রচার করেন, তাহার এক স্থানে এইরূপ লেখা আছে যে, "আমার প্রজাপুঞ্জের মধ্যে যিনি শাসনকার্য্যের যে কোন পদের জন্য পারদর্শিতা শিক্ষা ও বিশ্বস্ততা দেখাইতে পারিবেন, তিনি যে কোন জাতীয় ও ধর্ম্মাবলম্বী হউন না, সেই পদে অবাধে প্রবিষ্ট হইতে পারেন।" এই সভা প্রত্যাশা করেন যে, মহারাজ্ঞীর সদয় বাক্যগুলি প্রকৃত কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ভারতবর্ষের সিবিল-সার্ব্বিসের প্রতিযোগিতা পরীক্ষা যেরূপ লণ্ডনে গৃহীত হয়, তদ্রূপ ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে পরীক্ষা গ্রহণ করা উচিত এবং পরীক্ষার্থিদিগের বয়স ১৯ বর্ষ হইতে ২২ বর্ষ নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া যাউক।

(৬) মফস্বলের ফৌজদারী বিচারকার্য্য সম্পূর্ণ অপক্ষপাতে

নিস্পন্ন হইবার পক্ষে শাসক ও বিচারকের পার্থক্য বিধান হওয়া আবশ্যক। এবং যাহাতে গবর্ণমেণ্টের খরচার বিশেষ হ্রাস হয়, তাহা গবর্ণমেণ্টের করা উচিত।

(৭) ভারতবাসী বহুকর-ভারে প্রপীড়িত, তাহার উপর ইন্‌কম-ট্যাক্সের প্রচলন দুর্দ্দশার বৃদ্ধি করিবে। যাহাতে সত্বরে এই ট্যাক্স উঠিয়া যায়, তজ্জন্য এই সভা গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ প্রার্থনা করিতেছেন।

(৮) উপরোক্ত প্রস্তাবগুলির প্রতিলিপি এই সভার সভাপতির দ্বারা স্বাক্ষরিত হইয়া মাননীয় রাজপ্রতিনিধির অবগতির নিমিত্ত তাঁহার প্রাইবেট সেক্রেটারীর নিকট প্রেরণ করা হউক।

(৯) পাটোয়ারী পাণ্ডুলিপির তর্কবিতর্ক আগামী বর্ষ পর্য্যন্ত স্থগিত থাকায়, এই সভা গবর্ণমেণ্টের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন, এবং আশা করেন যে, উহা একেবারে পরিত্যক্ত হইবে। কারণ যে শ্রেণীর লোক পাটোয়ার নিযুক্ত হইবে, তাহাদিগের দ্বারা স্বত্বাস্বত্বের কাগজপত্র উপযুক্তরূপে হইবে না।

(১০) উপরোক্ত অবধারিত প্রস্তাবটীর অনুলিপি মাননীয় শ্রীযুক্ত লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের অবগতি ও বিবেচনার নিমিত্ত তাঁহার নিকট প্রেরণ করা হউক।

(১১) আত্ম-শাসনপ্রথা যাহাতে এদেশে বদ্ধমূল হয় ও তাহার কার্য্য সুশৃঙ্খলায় নির্ব্বাহ হওন পক্ষে যাহাতে সাধা-

রণের উৎসাহ ও অনুরাগ উদ্দীপিত হয়, তৎসংসাধনের জন্য এই সভা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছেন।

(১২) চাষ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি না থাকায় আমরা দিন দিন দরিদ্র হইতেছি ও আমাদের দেশের দারুণ দুর্গতি হইতেছে।

(১৩) পার্লেমেণ্টে দেশীয় সভ্য গ্রহণ।

(১৪) রজত মুদ্রার মূল্য হ্রাস।

(১৫) আয়র্লণ্ডের প্রজার অবস্থার সহিত বঙ্গীয় প্রজার সৌসাদৃশ্য।

(১৬) গবর্ণমেণ্টের সিমলা-বিহার।

(১৭) ব্রহ্মযুদ্ধের ব্যয়ভার ভারত যোগাইবে না।

এতগুলি বিষম বিষয়ের বিচার, একঘণ্টার বক্তৃতায় শেষ হইল। ধন্য স্বদেশানুরাগিগণ! আর লোক-শিক্ষা! কতকগুলি কৃষক একত্র করিয়া, অনুসন্ধানসমিতি, নির্ব্বাচন প্রথা, বলণ্টিয়ার, সিবিলসার্ব্বিস,—ইত্যাদি ইত্যাদি দুর্ব্বোধ্য কথা বলায় লাভ কি? যে এসব কথা কিছুই বুঝিবে না, যাহাকে এ বিষয় বলিয়াও আপাতত লাভ নাই, তাহার কাছে এসব বিষয়ের বিতণ্ডা কেন? এসব কথা যে একেবারেই মন্দ, তাহা আমরা বলি না। কিন্তু বীজ অসময়ে মরুভূমে পতিত হইতেছে—ইহাই আমাদের দুঃখ।

যে ব্যক্তি পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, অনশনে বৎসর বৎসর যাহার ছেলে পিলে মরে, বৈশাখ মাসের প্রখর রৌদ্রে

যে ব্যক্তি পানীয় জলের জন্য হাহাকার করে, পরিধানে যার শতগ্রন্থি টেনা—তাহার কাছে, বাপু বলণ্টিয়ারের বক্তৃতা কেন? সে বন্দুক লইয়া কি করিবে? আর সে, তোমার গুরু সিবিল-সার্ব্বিস বিষয়ের মর্ম্মই বা কি বুঝিবে? একটা ঘটনা বলি। বৃদ্ধ, সম্বলবিহীন, সেখ গোলাম আলি সাহেবের কাঁঠাল চুরি গিয়াছে—সেখজী কাঁদিয়াই আকুল, এক জন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত তাহাকে বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন, "দেখ সংসার অনিত্য। সুখ দুঃখ সমস্তই মিথ্যা; দেহ অনিত্য; তবে তুমি কাঁঠাল জন্য কাঁদ কেন?

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনো নিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত॥
যং হি ন ব্যথয়ন্তেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে॥

তথাচ গোলাম আলি সাহেবের কান্না থামিল না? আমাদের রাজনৈতিক বক্তৃতাও ঠিক এইরূপ।

স্বদেশানুরাগ-অর্থে স্বধর্ম্মে ভক্তি, স্বজাতির ক্রিয়া কর্ম্মে ভক্তি, স্বদেশের সর্ব্বস্বে ভক্তি। কিন্তু এই রাজনৈতিক আন্দোলনকারী মহাপ্রভুগণের সেই স্বদেশানুরাগ আছে কি? যিনি ব্রাহ্মণ, তিনি সন্ধ্যা আহ্নিকের মন্ত্র জানেন না; দুর্গোৎসবকে পৌত্তলিক পূজা বলেন; মনুসংহিতাকে পুড়াইতে উপদেশ দেন; আর হিন্দুধর্ম্মকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন-

ভ্যের ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করেন। আহারে খাদ্যাখাদ্যের বিচার নাই; মুর্গি, পেঁয়াজ, মহামাংসে বিরক্তি নাই; যখন-তখন, যথাতথা, যবন-ম্লেচ্ছ সহবাসে একত্র এক পাতে ভোজনে অনিচ্ছা নাই। এই হিন্দুর দেশে, এই ধরণের লোক দ্বারা, রাজনৈতিক আন্দোলন কি কখন সম্ভবে? আবার পোষাকে দেখুন—দেশের লোকের সহিত তাহার বড় একটা সাদৃশ্য নাই।

ইংরেজের আগমনে, এ দেশে যে প্রধান সর্ব্বনাশ হইয়াছে, হইতেছে,—এ সমস্ত বক্তৃতায়, সে কথার বিশেষ কোন উচ্চবাচ্য দেখি না। ইংরেজের এখন বড়দায়—পেটের দায় উপস্থিত। এ স-সাগরা পৃথিবীর তিন ভাগের এক ভাগ গ্রাস করিয়াও, প্রকৃতই ইংরেজের ক্ষুধা নিবৃত্তি হইতেছে না। এই যে ইংরেজ, ব্রহ্মদেশ গ্রহণ করিলেন, ইহাতে দুঃখ হয়; রাগ হয় না। ইংরেজ বড়ই দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছেন, ব্রহ্ম-রাজ্য গ্রাস না করিলে, তাঁহার জঠর-জ্বালা নিবারণ হয় কৈ? অর্থের জন্য ইংরেজ ভারতে আসিয়াছেন, হরিনামের ঝুলি হাতে করিয়া এখানে তীর্থভ্রমণের জন্য আসেন নাই।

ইংরেজ, রাজ্যশাসন করেন, অর্থের জন্য। টাকা রোজগারে যাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র ব্যাঘাত না পড়ে, কেবল এই নিয়মেই ইংরেজের শাসনপ্রণালী গঠিত। ইংরেজ চা-কর, ইংরেজ সওদাগর, ইংরেজ দোকানদার, ইংরেজরাজ—সকলেই

অর্থ অর্থ করিতেছেন। সকলেরই পেটের দায়। এসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া—সকলই ইংরেজের উদরে। শ্রীকৃষ্ণ মুখব্যাদান করিলে, যশোদা ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়াছিলেন; ইংরেজ হাঁ করিলে, উদরে বিশ্ব-সংসার দেখা যায়। তথাচ ক্ষুধা ভাঙ্গে না—দারুণ পিপাসা মিটে না!—কোথায় গিয়া, এ ক্ষুধার ভীম অগ্নি ঠেকিবে, তাহা ত জানি না!

কিন্তু ভারতবর্ষ, ইংরেজের এ মহাক্ষুধায় ভস্মীভূত হইয়াছে। রপ্তানিতে সকল শস্য গেল, কৃষক খাইতে পায় না,—জমী চষিবে কে? বিলাতী কাপড়ের আমদানিতে দেশ ছাইয়া গেল, তাঁতিকুল ধ্বংস হইল,—তাঁত বুনিবে কে? সমুদায় শিল্পকর্ম্ম একেবারে লোপ হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইংরেজ যে, দেশের অস্থিমজ্জা শোষণ করিল, সর্ব্বস্ব লইয়া গেল,—এ কথা লইয়া কখন কি আন্দোলন উঠিয়াছে? উঠিবে কেমন করিয়া? যিনি আন্দোলনকারী, তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখ;—দেখিবে, পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্য্যন্ত সমস্তই বিলাতী ভাবে পূর্ণ। দেখিবে, পদতলে ডসনের বাড়ীর বিলাতী বুট, পায়ের চেটো হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত বিলাতী এষ্টাকিন, এষ্টাকিনের বন্ধনী বিলাতী গার্টার, পেণ্ট্‌লান-কোটের কাপড় বিলাতী, বোতাম বিলাতী, টুপি বিলাতী। যাঁহার দেহ বিলাতী উপকরণের ভারে অবনত, তিনি কেমন করিয়া উহার বিরুদ্ধে দু-কথা বলিবেন?

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের "ট্রেড্ এবং ন্যাভিগেশন রিপোর্টে" প্রকাশ, ১৮৮৫।৮৬ সালে, বিলাত হইতে ভারতে ২৪ কোটিরও অধিক টাকার সূতার কাপড়ের আমদানি হইয়াছে। বিশ্ব-প্রেমিক বাবু! এ সংবাদে কি তোমাদের শরীর শিহরিয়া উঠে না? যদি প্রকৃতই তোমার রাজনীতি-জ্ঞান থাকে, যদি প্রকৃতই তোমার স্বদেশে ভক্তি থাকে,—তবে আজই বিলাতী কাপড় খানি ছাড়িয়া দাও; দেশী ধূতি পর, এবং অপরকে পরিতে অনুরোধ কর। দাম কিছু বেশী পড়িবে বটে,—কিন্তু দেশী ধূতি টেকসই বেশী। সকলেই যদি দেশী কাপড় পরেন, তাহা হইলে, লোকগুলা ত খাইয়া বাঁচে! আর, বক্তৃতা করিবারই যদি এত সাধ হইয়া থাকে, তবে না হয়, বঙ্গে কাপড়ের কল করিবার জন্যই বক্তৃতা কর না?

যিনি স্বদেশানুরাগী, তিনি কখনই সাধ্যমত বিলাতী প্রেমে মজেন না। তিনি দেশী বস্ত্র পরিধান করেন, দেশী জুতা পায়ে দেন, বিলাতী দিয়াশিলায়ের পরিবর্ত্তে চক্‌মকি সোলা ব্যবহার করেন, দেশী কালীতে লেখেন, দেশী গন্ধদ্রব্য মাথায় দেন। তবে তাঁহার অপরাধ এই, বাহাদুরী লইবার জন্য এ বিষয়ে কখন ঢাক ঢোল বাজান না। বস্তুত স্বদেশানুরাগীর ইহাতে বাহাদুরী কিছুই নাই, তিনি আপন কর্ত্তব্য কর্ম্মই করিয়াছেন।

পাঠক দেখুন, গত বৎসর বিলাত প্রভৃতি দেশ হইতে

কত টাকার কোন্ কোন্ দ্রব্য আমদানি হইয়াছে ;—প্রায় কুড়ি লক্ষ টাকার দেশলাই, প্রায় সাড়ে আট লক্ষ টাকার সাবান, সাড়ে এগার লক্ষ টাকার খেলনা, প্রায় ঊনিশ লক্ষ টাকার ছাতা, সাড়ে নয় লক্ষ টাকার বাতি, তেত্রিশ লক্ষ টাকার কাগজ, প্রায় ছয় লক্ষ টাকার গন্ধদ্রব্য, এক কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকার পশমী কাপড়, প্রায় আটাত্তর লক্ষ টাকার ছুরী কাঁচী এবং বাসন, সাড়ে এগার লক্ষ টাকার শিলাই করিবার তুলার সূতা, সাতান্ন হাজার টাকার শিলাই করিবার রেশমী সূতা, চারি লক্ষ সত্তর হাজার টাকার ফীতা, বেয়াল্লিশ লক্ষ বাইশ হাজার টাকার চুরুট, প্রায় ষাট লক্ষ টাকার লবণ, তিন লক্ষ একান্ন হাজার টাকার কালী ইত্যাদি। তাই বলি, একবার ভাবুন দেখি, ব্যাপারটা কি ?

দেশের বিশ্ব-প্রেমিকগণের নিকট যোড়হাতে নিবেদন, আপনারা স্বধর্ম্মে ভক্তি, স্বজাতির ক্রিয়া কর্ম্মে ভক্তি করিতে শিখুন,—তার পর দেশের লোকের সহিত মিশিয়া, রাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ করুন, এখন পাষাণে পদ্মফুল ফুটাইবার জন্য কেন বৃথা চেষ্টা করিতেছেন ? হাত বাড়াইয়া চাঁদ পাড়িবার জন্য কেন মাথা কুটিতেছেন।

দেশহিতৈষিগণ ! আপনারা আমাদের কথা একবার অভিনিবিষ্ট-চিত্তে ভাবিয়া দেখুন,—আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন। হিতে বিপরীত বুঝিলে নাচার !

শিক্ষিতা বাঙ্গালিনী।

সেই একদিন, আর এই একদিন। সেদিন সেই পূর্ণিমা তিথি, ষোলকলা শশী, শারদ-কৌমুদীরাশি; আর আজ এই ঘোর অমানিশার অন্ধকার, মেঘের হুঙ্কার, বিদ্যুতের বিকট হাসি, উনপঞ্চাশ পবনের বিষম বিক্রম,—আর বাঁচি না, আর তিষ্ঠিতে পারি না। সেদিনও বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীর আদর্শ-প্রতিমা দেখিয়াছি,—মূর্ত্তিমতী সরলতা, মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা, মূর্ত্তিমতী পতিভক্তি, মূর্ত্তিমতী গৃহকর্ম্ম, মূর্ত্তিমতী গৃহলক্ষ্মী সেদিনও দেখিয়াছি—কিন্তু আজ ঠক বাছিতে গ্রাম উজড় হয় কেন? কেন এমন হইল? বাঙ্গালীর ঘরণী বিলাসিনী কেন? আড়-নয়ন খেম্‌টা নাচে কেন? চারু হাসিতে বিষ মাখাইল কে? কথামৃতে ছাই ফেলিল কে? ঘোম্‌টা লুকাইল কে? গৃহলক্ষ্মীকে বাইজী সাজাইল কে?

ধীরে ধীরে, অল্পে অল্পে, নিঃশব্দে, নির্ভয়ে কালবশে, যুগধর্ম্মে, সমাজ-শরীরে মহাবিষ পশিতেছে; লোকে দেখিয়াও দেখিতে পায় না, বুঝিয়াও বুঝিতে পারে না—চক্ষু থাকিতে অন্ধ, বুদ্ধি থাকিতে বোকা, সংজ্ঞা থাকিতে অচেতন। যেন দিগ্বিজয়ী যাদুকরের অপূর্ব্ব মোহিনী মায়ায় দেশ মজিয়াছে! অহো কি বিড়ম্বনা! সিংহ শৃগালের ডাক শিখিতেছে, স্বয়ং সুরভি শূকরের পন্থা অনুসরণ করিতেছে, দেবতা পিশাচের খেলা খেলিতেছে!

ম্লেচ্ছ-অধিকারে "স্ত্রী-শিক্ষা" নাম্নী এক অভিনব সামগ্রী এ দেশে আমদানি হইয়াছে! এই "স্ত্রীশিক্ষাই" সর্ব্বনেশে জিনিষ। তেঁতুলে কেউটের বিষ। কিন্তু ইহাই বাবুদের সখের, সোহাগের, সু-ভোগের পদার্থ। এই হলাহল-প্রসবিনী, কালনাগিনী, শিক্ষাই আজ রমণীকুলের সর্ব্বোত্তম ভূষণ;—ইহাই যেন হাতের নোয়া, সীঁথার সিন্দূর; ইহাই পতিভক্তি, পুত্রস্নেহ, গৃহকর্ম্ম; ইহাই সংসারের সার-সর্ব্বস্ব। এ শিক্ষা না থাকিলে কন্যা কুৎসিতা, অসভ্যা, বিবাহের অযোগ্যা। বরং একদিন, দশদিক উজ্জ্বলীকৃত, কহিনূর-বিভূষিত স্বর্ণমুকুট হস্তে পাইয়াও, দূরে নিক্ষেপ করিতে পারি, তথাচ এ "শিক্ষা" টুকু ছাড়িতে পারি না। অধিক কি, বরং বিধবা হইয়া বারমাস বাস করিব, তথাপি এ শিক্ষা ছাড়িব না।

এমনি ঝোঁক, এমনি মোহ, এমনি উন্মত্ততা!

পুরুষেরই কি, আর স্ত্রীলোকেরই কি,—কাহারও সুশিক্ষার বিরোধী আমরা নহি। তবে সু-শিক্ষার প্রকৃত অর্থ বুঝি না,—বিকৃত ভাবে বুঝিয়াছি,—ইহাই রোগের প্রধান মূল কারণ। বীভৎস শিক্ষাকে সুশিক্ষা বলিয়া বুঝিয়াছি, কণ্টক-তরুকে চন্দনবৃক্ষ ভ্রমে আলিঙ্গন করিয়াছি, পাথর-কুঁচাকে চারু-চিন্তা মাণিক বলিয়া বাক্সে তুলিয়াছি! তাই দুর্দ্দশার আদি, অন্ত, মধ্য নাই।

শিক্ষা কাহাকে বলে,—অদ্য এ বিষয় লইয়া সুদীর্ঘ

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিতে চাহি না। তবে এই মাত্র বলি,—কেবল অক্ষর চিনিয়া বই পড়িলেই "শিক্ষিত" হয় না। বর্ণ-জ্ঞান-শূন্য হইলেও, পুরুষ এবং মহিলা সুশিক্ষিত হইতে পারেন ; আবার এদিকে, ইংরেজী-বাঙ্গালায় আউট হইয়াও, অনেক নরনারী নিদারুণ অশিক্ষিত। শিক্ষার অর্থ,—বস্তুর স্বরূপজ্ঞান,—পদার্থের প্রকৃত তত্ত্বনির্ণয়। যাঁহার এ জ্ঞান জন্মিয়াছে, অক্ষর পরিচয় না হইলেও, তিনি শিক্ষিত। যাঁহার এ জ্ঞান জন্মে নাই, তিনি পাশ্চাত্য প্রদেশে—আইসলণ্ডস্থ হেক্লা পর্ব্বতে উঠিয়া X Y. Z পাস করিয়া আসিলেও—অশিক্ষিত! শিবজী এবং রণজিৎসিংহ লেখাপড়ায় পণ্ডিত না হইয়াও, শিক্ষিত নামে বাচ্য হইতে পারেন। তথাচ কেবল এম, এ, বি, এল পাস করিয়াও আমাদের ঘোষ, বসু, মিত্র—বাঁড়ুয্যে— মুখুয্যে— চাটুয্যেগণ নিতান্ত অশিক্ষিত থাকিয়া যাইতে পারেন।

শিক্ষার অর্থ কার্য্যশিক্ষা,—শিক্ষা, পুঁথিগত বিদ্যা নহে, টেয়াপাখীর রাধাকৃষ্ণ বুলি নহে। হিন্দু এই কার্য্যশিক্ষাই বুঝে ;—ইহা ব্যতীত হিন্দুর অন্য শিক্ষা নাই। কর্ম্ম, কর্ম্ম, কর্ম্ম—ইহাই হিন্দুর একমাত্র কথা। যিনি বৈদিক কর্ম্মের অধিকারী, তিনিই বেদ পাঠ করুন—ইহাই হিন্দুর উপদেশ। অপরে আজীবন বেদ পড়িয়া বৃথা সময় নষ্ট করিবেন কেন? অধিকারি-ভেদে শিক্ষাভেদ। নচেৎ ভস্মে ঘৃতঢালাবৎ শিক্ষা নিষ্ফলা হয়।

বর্ণজ্ঞান, এই কার্য্যশিক্ষার সাহায্য করে মাত্র। ইহা ব্যতীত বর্ণজ্ঞানের আর কোন উপকারিতা নাই। বলা বাহুল্য, অক্ষর পরিচয়ের সাহায্য ব্যতীতও উত্তম কার্য্যশিক্ষা হইতে পারে।

অধুনা আমাদের শিক্ষা বিড়ম্বনা মাত্র। শিক্ষার উদ্দেশ্য —চাকুরী বা অর্থ-উপায়। ভাল, তাহাই হউক, ক্ষতি নাই। কিন্তু আজকাল ওকালতিতে অন্ন নাই, মুন্‌সেফীতে পদ-খালি নাই, ডাক্তারিতে ডাক নাই, কেরাণীগিরিতে কূলকিনারা নাই। এ জীবনে যে ইংরেজী-বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছি, তাহাতে ঐরূপ কাষ্ঠ-পুত্তলিকাবৎ কলে পড়িয়া যদি টাকা রোজগার করিতে পারিলাম, তবেই আমার উদর চলিল,—নচেৎ অন্নাভাবে আমি মারা যাইব। কিন্তু এখন সে কলও, বিকল হইয়াছে। ইংরেজী-বিদ্যায় আর অন্ন হয় না। তাই বলিতেছি, ইংরেজী-শিক্ষা এখন বিড়ম্বনা। দুঃখের কথা, অধিক আর কত বলিব,—এম, এ, বি, এল, পাস করিয়া আমি এমনি জীব হইয়া দাঁড়াইয়াছি যে, আর অন্য কোন কাজেই আমি লাগি না!—

হাল-আইনের "স্ত্রী-শিক্ষা" আরও অধিক বিড়ম্বনার বিষয়। এই কুশিক্ষায় হিন্দু-রমণীর সর্ব্বনাশ সাধিত হইতেছে। এই দায়ে, হিন্দুরমণী কার্য্যশিক্ষা ভুলিয়া, কেবল কল্পনা-আকাশে উড়িতেছেন।

আমরা সমগ্র হিন্দুরমণীর দোষ দিতেছি না; এখনও

গৃহলক্ষ্মী অন্তর্হিত হয়েন নাই; তবে আর বুঝি টেকেন না! বুঝি শীঘ্রই সংসার ছাড়িবেন!

শিক্ষিতা কামিনীর গতিমতি পর্য্যবেক্ষণ করুন। নবীনা, বেলায় উঠেন; প্রাতঃকালিক জল খাইয়া নবেল লইয়া বসেন; স্নানের পর খবরের কাগজ পড়েন; আহারের পর, বন্ধু বান্ধবকে, চিঠিপত্র লেখেন; বৈকালে ভ্রমণে বহির্গত হয়েন; সন্ধ্যার পর সুখ-শয্যায় শয়ন করেন। এই গেল দৈনিক কার্য্য। বাস্তবিকই অনেক গৃহে এই ব্যাপার। শিক্ষিতা-মহিলা আলস্যের অবতার, বাক্‌পটুতায় ধুরন্ধর, অকর্ম্মের শিরোমণি, ব্যারামের মহাখনি। রন্ধন করা কেমন জিনিষ, তাহা তিনি জানেন না; আহার করা কেমন মজা, তাহা তিনি বিলক্ষণ বুঝিয়াছেন। সন্তান-পালন ভুলিয়াছেন। গৃহস্থালী মনে নাই। শুদ্ধাচারে দৃক্‌পাত নাই। গোবর-জলে দারুণ ঘৃণা। তুলসী পাতায় পায়ের ধূলা। বিল্বপত্রে কুলকুচো জল।

পতিটী ঠিক যেন বাটীর খানসামা। কেবল চর্‌কিকলে ঘুরিতেছেন। স্ত্রী উঠিতে বলিলে তিনি উঠেন, বসিতে বলিলে বসেন; যেন নাকবেঁধা ভালূক।

কিন্তু শিক্ষিতা স্ত্রী, পতির অবশ্য গৌরবের সামগ্রী। তাই পতি মহাশয়, বন্ধুগণের নিকট স্ত্রীর সুখ্যাতি করেন, "আমার প্রণয়িণী বড়ই বুদ্ধিমতী। আমাকে বড় ভাল বাসেন। ঘরে যাইতে একটু বিলম্ব হইলে তিনি কর্ম্মস্থলে চিঠি লিখিয়া

পাঠান, "হাঃ নাথ! তোমার বিরহানলে আমি জ্বলিতেছি। শীঘ্র আসিয়া আমার মনপ্রাণ শীতল করিবে।"

স্ত্রী লেখাপড়া জানার আজকাল কেবল ঐটুকুই সুখ। বাকি সবই পুরুষের অদৃষ্ট-ফল।—স্ত্রীকে ধরিয়া তুলিতে হয়,—মাথা ঘোরে—অঙ্গ অবশ—ক্ষুধা নাই—আছে কেবল দারুণ পিপাসা। স্ত্রী-শিক্ষার ইহাই গুণ। তাই বলি, ইহা বড় সর্ব্বনেশে শিক্ষা।

ঠাকুরমার কথা।

আজ আমার ঠাকুরমায়ের কথা শুন দেখি। কুড়ি বৎসর পূর্ব্বের কাহিনী।

ঠাকুরমা বৃদ্ধা। বয়স ৬৫ বৎসরের কম নহে। হেঁগা, এ পৌষ মাসে বৃদ্ধার শীত লাগে না কি? ঠাকুরমা, গাছ-পালায় রাত থাকিতে থাকিতে, কাক ডাকিবার পূর্ব্বেই উঠেন। কি আশ্চর্য্য! গায়ে ফ্লানিলের জামা কৈ? পায়ে এষ্টাকিন কৈ? হাতে দস্তানা কৈ? এ আবার কি? ঐ যে বুড়ী, ঠাণ্ডা জলে গোবর গুলে উঠানে ছড়া দিতে লাগিল।

ভোর হইল। ঊষা উঁকি মারিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা গোয়ালের দ্বার খুলিয়া গাভী দুটীকে দেখিলেন। ঘরের সমস্ত চৌকাঠে জল দিলেন। তখন তিনি নদীস্নান করিয়া, অন্তরে হরির পদ ধ্যান করিতে করিতে, ঘরে আসিলেন।

তুলসীমঞ্চে জল-সেচন করিলেন। ঠাকুর ঘর ধুইলেন ; নৈবেদ্য সাজাইলেন ; উপকরণসামগ্রী যথাযোগ্য স্থানে সন্নিবেশিত করিলেন

ওদিকে রন্ধনের উদ্যোগ হইতে লাগিল। উনানে আগুন পড়িল। সহকারিণী বধূগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চা'ল, ডাল, নুন, তেল, তরকারির সমাগম হইল। বৃদ্ধা, জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বলিয়া পাঠাইলেন, "আজ দুইটী কুটুম্ব আসিবে, জেলে ডাকাইয়া, একটী তিন সের রুই মাছ পুকুর থেকে ধরিতে হইবে।" উনান জ্বলিয়া উঠিল ; দু-পাকায় ভাত ডাল চড়িল। বধূগণ তদারকে রহিলেন।

বেলা হইল। ঠাকুরমা এইবার ছেলেপিলের চিকিৎসা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। কোন ছেলের সর্দ্দি, কাহারও পেটের অসুখ, কেহ বা খোসে পঙ্গু। তিনি কবিরাজের উপদেশ মত এবং নিজ বহুদর্শিতাগুণে, নানা অনুপান সংগ্রহ করাইয়া ছেলেদিগে ঔষধ খাওয়াইলেন। গাই দোহাইয়া টাট্‌কা দুধ গরম করিয়া, একটী ছেলেকে তিনি খাইতে দিলেন। নিম-পাতা গরম করিয়া, একটী ছেলের খোস ধোয়াইতে লাগিলেন।

এমন সময় একজন প্রতিবেশিনী বালিকা, বৃদ্ধাকে ডাকিতে আসিল, "ঠাকুমা, মা তোমাকে ডেকেছেন—খোঁকার জ্বর হয়েছে, তোমাকে হাত দেখিতে হইবে।" ঠাকুমা অমনি চলিলেন।

এই সময় গয়লা বৌ আসিয়া বৃদ্ধাকে ধরিল, “মা, আমি অদ্দেক স্থদ দিতে পারবো না,—আমাকে স্থদ ছেড়ে না দিলে, ছেলে পিলে খেতে পাবে না।”

ঠাকুমা। তোদের আবার টাকার ভাবনা কি? নদীর জল যতদিন না শুকুচ্চে, ততদিন তোর ছেলে পিলের কষ্ট হবে না।

গোয়ালিনী হাসিল। বলিল, “মা, আমি তোমাকে কথায় পারি কি? তোমার পায়ে পড়ি মা—আমাকে সব স্থদ দিতে হ’লে, আমি মারা পড়বো।”

ঠাকুমা। আসলের সব টাকা নিয়ে আসিস্‌, তোকে সিকি স্থদ ছেড়ে দিব।

এই কথা বলিয়া ঠাকুমা রোগী দেখিতে অগ্রসর হইলেন। ছেলের হাত দেখিয়া বৃদ্ধা বলিলেন, এ জ্বর কিছু নয়, একটা পাঁচন দিলেই ছেড়ে যাবে।

ঠাকুমা চিকিৎসাবিদ্যায় স্থনিপুণা বলিয়া পাড়ায় প্রসিদ্ধ। তবে কবিরাজ মহাশয়ের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে তাঁহার বচসা হইত। ঠাকুমা কবিরাজের কথা না শুনিয়া, সময়ে সময়ে নিজের মতলব মত পাঁচনাদির ব্যবস্থা করিতেন।

ঘরে প্রত্যাগত হইয়া ঠাকুমা, স্বয়ং স্থক্তানি রাঁধিলেন; পায়সের গুড়-চাল স্বয়ং আন্দাজ করিয়া দিলেন।

বৃহৎ গৃহস্থ। অতিথি, কুটুম্ব, পুত্র, প্রপৌত্র, বৌ, ঝী, কৃষাণ, রাখাল, সকলে যথা নিয়মে একে একে আহার করিল।

ঠাকুমা সর্ব্বশেষে হবিষ্যান্ন ভোজন করিলেন। বেলা প্রায় দুইটা।

আহারান্তে ছেলেপিলের কেঁথাশেলায়ের বন্দোবস্ত হইল। তেজারতির হিসাব হইল। নাত্নীগণের দ্বারা বৃদ্ধার পাকা-চুল উপ্ড়ান হইল।

ক্রমে অপরাহ্ন উপস্থিত। এইবার গৃহের সাজসজ্জা আরম্ভ। ঘর, দ্বার, উঠান—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তক্তক্ করিতে লাগিল। বিছানা, বালিস রোদ হইতে তুলিয়া শয্যা প্রস্তুতের সূত্রপাত হইল।

সন্ধ্যা হইল। প্রদীপ জ্বলিল। ঠাকুমা হরিনামের মালা লইয়া এক ঘণ্টা কাল নির্জ্জনে হরির নাম জপ করিলেন। আবার রন্ধনের উদ্যোগ। আবার বৃদ্ধার কর্ত্তৃত্ব। আহার—শয়ন—নিদ্রা।

সকলে নিদ্রিত হইলে, বৃদ্ধা রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর ঘুমাইলেন। তাঁহার কেমন একটা স্বভাব বা বাতিক ছিল যে, শুইবার পূর্ব্বে, তিনি পরদিনের জন্য মুষ্টি-ভিক্ষার চাউল, এক পালি মাপিয়া রাখিতেন।

ষাট বৎসর-বয়স্কা সেই লক্ষ্মীরূপিণী ঠাকুমার এইরূপই দিন-লিপি ছিল। বারমাস সমভাবে তিনি এইরূপই পরিশ্রম করিতেন;—বিরাম নাই, জ্বরজ্বালা নাই, সুখ-অসুখ নাই, চিরদিনই এইরূপ চলিত। কেবল বৎসরান্তে একদিন তিনি কোন কাজকর্ম্ম করিতেন না। সেই দিন নিরাহারে নির্জ্জনে,

নিভৃতে বসিয়া কেবল হরিনামে নিমগ্ন হইতেন; চোখের জলে বুক ভাসিত; পর দিন দ্বাদশটী ব্রাহ্মণ ভোজন হইত। ইহা স্বামীর মৃত্যু-তিথির বার্ষিক ক্রিয়া।

ঠাকুরমার আরও নানা কাজ। পাড়ার যে কোথাও বিবাহ-বাসর হোক না কেন, তিনি সেদিন তথায় প্রধানা রমণী। একশত লোকের পরিবেশন করিতে হইবে, বৃদ্ধা কোমর বাঁধিয়া লুচির ধামা ধরিতেন। রোগীর জ্বরবিকার,—ঠাকুরমা তাহার শিয়রে বসিয়া সমস্ত রাত জাগিয়া সেবা শুশ্রূষা করিতেন। এমন ঠাকুরমা আর কি বঙ্গগৃহে পাইব?

বৃদ্ধার কখন অক্ষর পরিচয় হয় নাই, তিনি বোধোদয়ও পড়েন নাই, কিন্তু রামায়ণ-মহাভারতের সব কথা তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি মনু পড়েন নাই,—কিন্তু প্রকৃতই তিনি মনুর কথা আবৃত্তি করিতেন, "মেয়েমানুষ—বুড়ো হোক, আর যুবোই হোক, সব সময়ই পুরুষের অধীন। সোয়ামীই স্ত্রীর একমাত্র গতি। সোয়ামী ছাড়া, মেয়ের কোন কাজই নাই।"

এ সম্বন্ধে মনুর শ্লোক দেখুন,—

বালয়া বা যুবত্যা বা বৃদ্ধয়া বাপি যোষিতা।
ন স্বাতন্ত্র্যেণ কর্ত্তব্যং কিঞ্চিৎ কার্য্যং গৃহেষ্বপি।

৫। ১৪৭।

ঠাকুরমা বলিতেন, "পতি কাণা হোক, খোঁড়া হোক,

মদখোর হোক, নারীর তিনিই দেবতা। স্ত্রী, যাবজ্জীবন সোয়ামীকে গুরুবৎ পূজা করিবে। পতিসেবাই স্বর্গ।"

মনুর শ্লোক মিলাইয়া লউন,—

বিশীলঃ কামবৃত্তো বা গুণৈর্ব্বা পরিবর্জ্জিতঃ।
উপচর্য্যঃ স্ত্রিয়া সাধ্ব্যা সততং দেববৎ পতিঃ॥

৫। ১৫৪।

নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতং।
পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে॥

৫। ১৫৫।

বৃদ্ধা বধূগণকে উপদেশ দিতেন, "প্রত্যহ প্রাতে শয্যা হইতে উঠিয়া পতিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিবে। কারণ পতি দেবতা। পতিকে কখন অপ্রিয় কথা বলিবে না। যে স্ত্রী, সোয়ামীর সঙ্গে সদা ঝগড়া করে, সে নরকে যায়।"

ঠাকুরমা ৮০ বৎসরে জীবলীলা শেষ করেন। বৃদ্ধার সংক্ষিপ্ত, সোজা কাহিনী, শিক্ষিত নরনারীর ভাল না লাগিতে পারে—একটু একটু কুরুচিময় বোধ হইতে পারে,—কিন্তু ইনিই হিন্দুর গৃহলক্ষ্মী ছিলেন। ইহাঁর কর্ত্তৃত্বে সেই বৃহৎ সংসার সুখময় ছিল—ধনধান্যে ঘর পূর্ণ ছিল।

———

শ্রীমতী চঞ্চলা।*

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মিত্রদের বাড়ী কি ভূমিকম্প,—না আগ্নেয় গিরির উৎপাত,—না গভীর মেঘগর্জ্জন? কাণ পাতিয়া শুন দেখি;—থন্ থন্ ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ,—সোঁ সোঁ সোঁ হুস্‌স্—গুড়ু গুড়ু গুড়ুম্। কি এ?

আজ মিত্র-মহোদয়ের শিক্ষিতা-গৃহিণী মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। মহাশক্তির সর্ব্বশরীর ঘন ঘন দুলিতেছে; আলুলায়িত কেশকলাপ মুহুর্মুহু উর্দ্ধে উঠিতেছে; লোলরসনা লহ লহ করিতেছে;—বজ্রদন্ত কটকটায়িত, করালচক্ষু ঝলঝলায়িত, নাসার নিশ্বাস শনশনায়িত। শ্রীমতীর শ্রীপদ-পঙ্কজ-ভরে মেদিনী কাঁপিতেছে, শ্রীকরকমলের তেজে টেবিল টলিতেছে, শ্রীকম-কণ্ঠের কূজনে কোকিল কাঁদিতেছে!

শ্রীমতীর স্বামীটী পাত্‌লা, একহারা—ক্ষীণমুখে চুড়ুচুড়ে গোঁফ্; চোখ দুটী বসা; ঠোঁট দুটী শুখান; নাক্‌টী টিকালো; হনু দুটী ছুঁচালো। তিনি জজ-আদালতের নবীন উকীল। নাম কেশব বাবু। তাঁহাকে দেখিলে মনে হয়,—তাঁহার পিঠে ঈষৎ অল্প ধাক্কা দিলেই তিনি মুখ

---

* শ্রীমতী চঞ্চলা দুই পরিচ্ছেদে পূর্ণ। বাস্তব-ঘটনামূলক কাহিনী। ঔপন্যাসিক ছন্দে বাঙ্গালা গদ্যে লিখিত।

থুবড়িয়া পড়িয়া গিয়া, মানব-লীলা-সম্বরণ করিতে নিতান্ত সক্ষম।

বেলা দশটা। কাছারি যাইবার বেলা হইল বুঝিয়া, কেশব বাবু নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে, ধীরে ধীরে, গুটি গুটি বহির্বাটী হইতে অন্দরে আসিয়া উপনীত হইলেন। সম্মুখেই বিভীষণা, পিঙ্গলবর্ণা পত্নী;—সেই গদী-আঁটা চেয়ারে অর্দ্ধ-উপবিষ্ট, অর্দ্ধ-উত্থিত ভাবে অবস্থিত। স্বামিসমাগম মাত্রেই তিনি বিদ্যুৎবৎ চারিদিক্ চক্ চক্ চমকিয়া, লাফাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন; দক্ষিণ পদ ক্ষিতিতলে রহিল, বামপদ চেয়ারের উপর উঠিল। তিনি স্বামীর দিকে সম্মুখ ফিরিয়া এক গভীর নির্ঘোষ করিলেন,—একবারে ঠিক যেন বিংশতি কামানের আওয়াজ হইল। সেই শব্দটার ভাব এইরূপ;—"ছি ছি ছি! নাথ হে! পুরুষজাতিকে ধিক্! হা নাথ! ছি!!"

নাথ-বাবাজী ভাবিয়াই আকুল;—হয়েছে কি, ঘটেছে কি, ব্যাপার কি!—ইহার কিছুই তিনি ঠিক করিতে পারিলেন না। এ কথার উত্তরও সহসা কিছু দিতে পরিলেন না —তিনি কেবল চোকে ঝাপসা দেখিতে লাগিলেন।

রমণী, নাথকে তদবস্থ দেখিয়া, এবার স্বর একটু নরমে বাঁধিয়া, ললিত-ভৈরবে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন;—"প্রিয়তম নাথ! জীবনের সর্ব্বস্ব নিধি! এ রমণী-জন্মের একমাত্র ধন! বঁধু হে! প্রিয় হে! নারীজাতির এত অপমান তুমি আজ সহ্য করিয়া আছ কেমন করিয়া? তুমি কি এখনও

সংবাদপত্র পড় নাই? 'শিক্ষিত বাঙ্গালিনী' প্রবন্ধে আমাদের যে অন্তস্তল ভেদ করিয়াছে, তাহা কি তুমি দেখ নাই? প্রবন্ধ-লেখক বলেন, উচ্চ শিক্ষা পাইয়া আমরা অধঃপাতে গিয়াছি! হায় হায়!

"শিক্ষায় পতন!—বড়ই আশ্চর্য্য কথা! এ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেও আমি যে এমন অপূর্ব্ব কথা শুনিব, তাহা আশা করি নাই। পোড়ারমুখো লেখক বলে কি না,—'আমাদের পুঁথিগত বিদ্যা, রাধা-কৃষ্ণের বুলি। আমরা কাজের বার্।' হায়, হায়! এ রহস্য বলি কাকে? এ দুঃখ শুনেই বা কে? আমাদের মত কর্ম্মক্ষম রমণী এ জগতে আর কে আছে? তবে আত্ম-প্রশংসা, আত্ম-গরিমা করিতে নাই, তাই আজও আমরা নিজ নিজ ডাইরি (দিনলিপি) ছাপাই নাই। নাথ! আমরা কাজ জানি না, কাজ বুঝি না,—লোকে এ কথা রটায়;—এ মর্ম্মকষ্ট মোলেও যাবে না। তবে আমরা দিন-রাত উচ্চ-সাহিত্য, উচ্চ-বিজ্ঞান ভাবি, তাই সামান্য কর্ম্মে অপর লোক নিযুক্ত করিয়াছি। বৃথা সন্তান পালন বা রন্ধন বা রন্ধনের উদ্‌যোগ করিতে গিয়া, সময়-অমূল্য-নিধিকে কি বৃথা নষ্ট করিব? যাহা ৫৲ টাকা মাহি-য়ানার চাকর বা চাকরাণীর দ্বারা হয়, সে কাজ আমার ন্যায় কোন উচ্চ-ভাবাপন্না, উচ্চ-পদারূঢ়া রমণী করিতে স্বীকৃতা হইবেন কেন? যে ব্যক্তি জজ, তিনি কি খান্‌সামাগিরি, বাউচি গিরি করিতে যাইবেন? এখন সভ্যতার শাদা ফুল

ফুটিয়াছে; সুতরাং এ কালে শিক্ষিতা রমণী বেড়ি দিয়া হাঁড়ী ধরিবে না; উনুনে দুধ উথলিয়া পড়িলেও, তাহাতে এক ফোঁটা জল দিবে না; ঘরে এক হাঁটু ধূলা হইলে, স্বয়ং সম্মার্জ্জনী-হস্তে তাহার প্রতীকার করিবে না; অধিক কি, রাঁধুনী-ব্রাহ্মণীর একদিন ব্যারাম হইলেও শিক্ষিতা রমণী পাকশালায় যাইবেন না। আর শিশুসন্তানকে স্তন্য-দুগ্ধ দিবার জন্য ৯৲ টাকা মাহিনা দিয়া একটা দুধলো-ঝী নিযুক্ত করিলেই চলিবে! (ঈষৎ হাসিয়া) প্রিয় নাথ! তুমিই ভাবিয়া বল দেখি,—নীচজাতীয়া, সামান্য মাহিনার ঝীয়ের বদলে আমাকে যদি সন্তান-পালনাদি সমস্ত নীচ-দরের গৃহ-কর্ম্মই করিতে হয়, তবে আমি উচ্চশিক্ষা করিতে সময় পাইব কখন?"

এই বলিয়া শ্রীমতী, শ্রীযুতের হাত আদরে ধরিলেন! কেশব বাবুও আদরে গলিয়া গিয়া বলিলেন, "তা বৈকি, প্রেয়সি! নিউটনকে মুটেগিরি করিতে দিলে সমাজের অমঙ্গল বৈ কি? হক্‌সিলি, বা ডারউইনকে যদি খানসামা-গিরি কাজে নিযুক্ত করা হয়, তাহা হইলে সমাজ আর ক'দিন টিকে? প্রাণপ্রিয়তমে! তোমার কথাই ঠিক।"

রমণী, ক্ষুধিতা বাঘিনীর ন্যায় রোষকষায়িত চক্ষে বলি-লেন, "শুধু তোমার কথাই ঠিক" এ কথা বলিলে আমি আর শুনিব না! তুমি কি দেখিতেছ না, সেই প্রবন্ধরূপ তীক্ষ্ণ-বিষে আমার শরীর জর্জ্জরীভূত হইয়াছে? তুমি অন্ধ? না

বধির? না মূক?—যদি তা না হও, তবে আজই ইহার প্রতিকার তোমাকে করিতে হইবে। তোমার হাত, পা, দেহ এখনও বজায় রহিয়াছে, তথাচ তুমি এ শিক্ষিতা নারীজাতির এ অপমান স্বচ্ছন্দে দাঁড়াইয়া দেখিতেছ! আমি মনে করিয়াছিলাম, ঐ প্রবন্ধপাঠে তোমার হৃদয় ফাটিয়া গিয়াছে,—তুমি বার্ বাটীতে নীরবে পড়িয়া আছ; অথবা কাটা ছাগলের মত ধড়ফড় করিতেছ। কিন্তু ছি! নাথ! ছি ছি!—তোমাকে শতেক ছি! তুমি কি বলিয়া নিশ্চিন্ত বসিয়া আছ বল দেখি?

নাথ-বেচারি এইবার বড় বিপদে পড়িলেন। কি ভাবে, কি রকম কথায় উত্তর দিলে, এ মহাকুরুক্ষেত্র হইতে তিনি নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারেন, মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

কোন উত্তর না পাইয়া শ্রীমতী তীব্রস্বরে বলিলেন,—"মিটির মিটির চেয়ে—ঘুঘুটীর মত অমন ভাব্‌চো কি? শুন আমার কথা। আমি স্বয়ং আজ ইহার প্রতিবাদ করিব—practical প্রতিবাদ! আজ জগতের সমক্ষে দেখাইব, আমরা প্রকৃত কর্ম্মক্ষম কিনা? উদ্যোগ কর, উদ্যোগ কর। আমি স্বয়ং আজ রন্ধনশালায় ঢুকিয়া পাকাদি করিয়া, সশরীরে বারজন বন্ধুকে পরিবেশন করিয়া খাওয়াইব। রাত্রি দশটার সময় আহার হইবে। ঘড়ি দেখ;—এখন হইতে ঠিক আর ১১ ঘণ্টা ২১ মিনিট ৩২ সেকেণ্ড সময় আছে। এই অল্প

সময়ের মধ্যেই সমস্ত উদ্যোগ করিতে হইবে। দ্রুত হও, দ্রুত হও। আমার বিশেষ পরিচিত—প্রতিনিধি স্থানীয়—ছয় জন পুরুষ-বন্ধুকে আমি নিমন্ত্রণ করিব। তুমিও প্রতিনিধির উপযুক্ত ছয় জন পুরুষকে নিমন্ত্রণ কর। আহারান্তে সমগ্র ভারতবাসীর প্রতিনিধিস্বরূপ, সেই দ্বাদশ-জন সভ্যের নিকট হইতে এইরূপ সার্টিফিকেট লইব,—"শ্রীশ্রীমতী চঞ্চলা মিত্র ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিতা মহিলা। তিনি অদ্য রাত্রে দশটার সময় (কলিকাতা টাইম) স্বয়ং স্বহস্তে স-শরীরে, অনির্ব্বচনীয় পরিশ্রম এবং পাণ্ডিত্য সহ-কারে যেরূপ অপূর্ব্ব আহারীয় দ্রব্য রন্ধন করিয়া খাওয়াইলেন, তাহা অমৃতবৎ—ঠিক যেন চাঁদের সুধা। এমন জিনিষ কখনও খাই নাই,—এবং কখন খাইবও না এরূপ আশা আছে।" (এইখানেই দ্বাদশজনের স্বাক্ষর হইবে)। তারপর আমি ঐ প্রবন্ধের প্রতিবাদস্বরূপ ইহা ছাপাইব।"

কেশব। অতি উত্তম প্রস্তাব। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার অনুমোদন করি।

শ্রীমতী। এক শত টাকা এখনি চাই, তুমি দিয়া তবে কাছারি যাইতে পাইবে। আমি এক ঘণ্টা ৪৯ মিনিটের মধ্যে দ্রব্যাদি আনাইয়া রন্ধন আরম্ভ করিয়া দিব। বিশেষ, গত নবেম্বর মাসে প্রকাশিত কোন ইংরেজ গ্রন্থকার-লিখিত রন্ধন সম্বন্ধে দুই ভলিউম বৈজ্ঞানিক পুস্তক এখনি কিনিয়া আনিতে হইবে। রন্ধন সম্বন্ধে তৎপূর্ব্বলিখিত সমস্ত গ্রন্থই

আমার পড়া আছে, কিন্তু ওখানি এখনও পড়ি নাই। উহার মূল্য ২২৲ টাকার অধিক নহে। তোমার সঙ্গে ঝীকে পাঠাই। তুমি দোকান হইতে ঐ বই দুখানি কিনিয়া দিয়া আফিসে যাইও। সুতরাং খরচ সমুদায়ে ১২২৲ টাকা মাত্র। তা, আর বেশী কি? পুস্তক কিনিতে কদাচ বিলম্ব না ঘটে।—আমি ২১ মিনিটের মধ্যে দুখানি গ্রন্থ পড়িয়া, উনুনে আগুন দিব—ইহা যেন তোমার মনে থাকে।

শ্রীমতীর এই কথা শুনিয়া কেশবের মুখ আরও ম্লান হইল। জিব শুকাইল। পৃথিবী আঁধার দেখিয়া, তিনি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

শ্রীমতী। ও—কি—ও! বসিলে চলিবে না। শীঘ্র শীঘ্র কথার জবাব দেও!

কেশব। অ্যাঁ—অ্যাঁ—এই যে—তা বল্‌চি কি,—আমার হাতে'ত আজ একটী পয়সাও নেই—এই মাসকাবার হ'য়েছে। বাবা, ওকালতীর জন্য মাসে মাসে আমাকে দেড় শত টাকা পাঠাইয়া দেন; তা, সে টাকা পাইতে এখনও আট দশ দিন বিলম্ব আছে। আমার মনিব্যাগে মোটে ।৴১০ আনা পয়সা আছে—তা সেই জুতা বুরুষ-ওয়ালার ।০ আনা ধারি—তাকে আজ না দিলেই নয়। তোমাকে যোড় হাতে বল্‌চি—আজ আমাকে ক্ষমা করো—তোমাকে ক্রমে ঐ টাকাগুলি যোগাড় করিয়া দিব। তুমি আমার বাক্স দেখ, বাস্তবিক কোথাও কিছুই নাই।

শ্রীমতী। সেকি কথা? আমরা শিক্ষিতা রমণী;—তোমার টাকা আছে, কি নাই;—তাহা আমরা বুঝি না। জানিতেও চাহি না। আমার টাকার দরকার হইয়াছে, তোমাকে দিতে হইবে। যেমন করে পাও, যেখানথেকে পাও, তাহা আমি দেখিব না; মোদ্দা, এখনি আমাকে দিতেই হইবে। (টেবিলে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া) এখনি তোমাকে দিতে হইবে। টাকা না দিলে, তোমাকে উঠিতে দিব না। তুমি জান,—আমি কে।"

মহাশক্তির সমক্ষে বলিদানের পূর্ব্বে, হাড়িকাঠে মাথা দিয়া পাঁঠা যেরূপ "ম্যা ম্যা" করে, কম্পিত-কলেবর, কাতর কেশব সেইরূপ—অন্তরে (নীরবে) মা-মা-মা, গেলাম গেলাম করিতে লাগিলেন। নানা কারণে তাঁহার দুই চক্ষে দশধারা বহিতে লাগিল।

শ্রীমতী। অমন মায়া-কান্না আমি ঢের দেখিচি। যদি পেটপূরে খেতে দিতে পারবে না, তবে আমাকে বিবাহ করেছিলে কেন?—আচ্ছা, উপায় বলে দিতেছি;—যদি উপস্থিত তোমার পকেটে টাকা না থাকে, তবে সেকনক্লাস গাড়ীভাড়া করে পাঁচজন বন্ধুবান্ধবের কাছে যেয়ে, এখনি টাকা ধার ক'রে এনে দাও! আমি টাকা কোন মতেই ছাড়িব না।

কেশবচন্দ্রের কথাবার্ত্তা নাই, নড়ন চড়ন নাই।—নিবাত-নিষ্কম্পমিব প্রদীপং—ধীর, স্থির, গম্ভীর।

শ্রীমতী তখন একবার অট্টহাসি হাসিলেন। বলিলেন, "তুমিত টাকা দিতে পারিলে না—ধার করিয়া আনিয়া দিতেও সক্ষম হইলে না। আচ্ছা, আমি টাকার জন্য স্বয়ং ঘণ্টাভাড়া গাড়ী করিয়া, বন্ধুবান্ধবের নিকট বাহির হইব! দুই ঘণ্টার মধ্যে ১২২৲ টাকা কেন, নগদ ২০০৲ টাকা আনিয়া তোমার সমক্ষে ধরিব। তখন তুমি শিক্ষিতা মহিলার ক্ষমতা বুঝিবে, এবং সেই সঙ্গে সমগ্র জগতকে বুঝাইতে চেষ্টা করিবে। 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন।' আজ যেমন করিয়া হউক কার্য্য উদ্ধার করিব।"

এই বলিয়া, দিব্য বেশভূষায় ভূষিত হইয়া পাণরাগে অধরপল্লব রঞ্জিত করিয়া, তীক্ষ্ণ নয়ন-বাণে নরশরীর ভেদ করিয়া, শ্রীমতী চঞ্চলা টাকার জন্য গাড়ী করিয়া রাজপথে, বাহির হইলেন।

কেশব বাবু তদবস্থায়ই নীরবে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া রহিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

খানিক পরে চঞ্চলা ফিরিয়া আসিয়া স্বামীকে বলিলেন, "দেখ নাথ! এখনও উনপঞ্চাশ মিনিট অতীত হয় নাই, আমি নগদ ১৭৫৲ টাকা উপার্জ্জন করিয়া আনিলাম! শিক্ষিতা মহিলার ক্ষমতা বুঝ। এ বিষয়টাও তুমি ছাপাইতে পার।"

কেশবচন্দ্র স্ত্রীর মুখ পানে চাহিলেন। বুঝিলেন, রমণীর

বদন-সুধাকর রক্তিম বর্ণ হইলেও উগ্রপ্রকৃতিক নহে; হরিণ-নয়ন, কেমন একরকম ভাসা-ভাসা চঞ্চল হইলেও, তাহাতে আর তীব্র দৃষ্টি নাই; নাসা-বাঁশীর নিশ্বাস ঈষৎ ঘন ঘন পড়িলেও, তাহাতে আর প্রলয়-ঝড়ের আশঙ্কা নাই। শ্রীমতীর এখন যেন একটু সদয় ভাব,—বেশ যেন শিষ্ট শান্ত স্বভাব। স্বামী কোন কথার উত্তর দিতে না দিতেই শ্রীমতী আবার বলিলেন, "প্রিয়তম! যামিনী বাবু বড়ই সুন্দর লোক। তিনি অতি অমায়িক এবং সাধু। আমার কোন কথাই তিনি এড়াইতে পারেন না। এই তিন মাসের মধ্যে যে, তাঁহার সঙ্গে আমার এত আলাপ হবে, তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই! তিনি আপনারও অনেক প্রশংসা করিলেন—দেখিলাম, তিনি আপনাকেও বড় ভাল বাসেন।"

কেশব। যামিনী বাবু বড় সৎলোকই বটেন—

চঞ্চলা। সৎ না হলে কি আমি চাহিবামাত্রেই ১৭৫৲ টাকা তিনি আমাকে দিয়া ফেলেন?—বাকি ২৫৲ টাকা সন্ধ্যার সময় দিবেন বলেছেন। একেবারে সব টাকা দিতে পারিলেন না, বলিয়া, তিনি কত দুঃখ করিলেন।

কেশব। কোন রকম পাস না করিলেও, কলেজ-শিক্ষা না থাকিলেও তাঁহার ইংরেজীতে বেশ দখল আছে।

চঞ্চলা। তাঁর অতি উত্তম জ্ঞান আছে! হাসি হাসি মুখে কেমন তাঁর সুমিষ্ট কথা! বিদ্যের জোর না থাকলে কি, এমন সুধামাখা কথা কেউ শিখ্‌তে পারে!!

কেশব। অনেক সাহেব শুবোর সঙ্গে তাঁর আলাপ। তিনি ইংরেজ-সমাজে সদাই মিশেন, তাই তিনি বিনা পাসেও শিক্ষিত হয়েছেন।

চঞ্চলা। তা'ত হবেনই ; তাঁর সঙ্গে কার তুলনা ?—সে কথা যাউক। এখন আমি ফর্দ্দ করে দিচ্চি ;—শীঘ্র বাজারে যেয়ে জিনিষগুলি এনে দাও দেখি ? আর সময় নাই, ১২টা প্রায় বাজে ; শীঘ্র বেরোও, শীঘ্র বেরোও—

কেশব। (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) অ্যাঁ, এখনও স্নান করি নাই—নেয়ে, চারটি ভাত খেয়ে এখনি যাচ্চি।

চঞ্চলা। তুমি কি, আমাকে মজাতে বসেছ নাকি ?—এতক্ষণ ঘরের কোণে ব'সে কি কচ্ছিলে ?—নেয়ে খেয়ে ঠিক হয়ে বসে থার্‌তে পার নাই ?—জান, আজ বাড়ীতে কর্ম্ম হবে, ঠুঁঠো জগন্নাথের মত নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছ কি বোলে ? আমার পোড়া অদেষ্টকে এখনি নুড়ো জ্বেলে, ধড়ুধড়ু করে পুড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করে,—

কেশব। (অতি বিনীতভাবে ম্লানমুখে) রাগ করো না ! আমি এখনি এনে দিচ্চি। এই এক ঘটী মাথায় জল দিয়ে, দুটো খেয়ে—

চঞ্চলা। আজ আর নাইতে হ'লে বেলাটুকু থাক্‌বে না—অত সুখে আর কাজ নেই ! তাড়াতাড়ি দুটো ভাত খেয়ে এখনি চলে যাঁও,—অ, ঝি ! বামুন ঠাকুরকে বল্‌, বাবুর শীগ্‌গির ভাত আন্‌তে।

কেশব। আচ্ছা, তবে মুখটা ধুয়ে নি,—কাপড়টা ছাড়ি—

চঞ্চলা। তুমি যে আমায় জ্বলিয়ে পুড়িয়ে খেলে। এ মুখ ধোবার সময়, না, কাপড় ছাড়িবার সময়? আমার মাথায় আজ আগুন জ্বল্‌ছে, তোমার সুখে আর গা ধরে না! (পকেট হইতে ঘড়ি খুলিয়া স্বামীর সম্মুখে ধরিয়া) পোড়ার-মুখ! চোখ থাকে ত এই চেয়ে দেখ, দুপুর বাজতে আর ২॥৵ মিনিট বাকি! সাধ করে কি আমার মুখ দিয়ে অকথা-কুকথা বেরোয়?

এমন সময় বামুনঠাকুর বাবুর ভাত লইয়া আসিল। ঝী সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া বলিল,—"মা, এই ঘরেই কি বাবুর আসন পেতে দিব?"

চঞ্চলা-মা, ক্রোধভরে ঝীকে বলিলেন, "তুই যাঃ,—ওর দু-কড়ার যোগ্যতা নেই, ওকে আর আসন পেতে ভাত খেতে হবে না! বামুন ঠাকুর, তুমি অম্‌নি ভাত ফেলে যাও;—ও, খেতে হয় থাক্, না খেতে হয় চলে যাক্!—"

কেশব ধীরভাবে, অতি মিহি স্বরে বলিলেন,—"রাগ করো কেন?—আমি এই, শীঘ্র খেয়েই বাজারে যাচ্ছি—

বাবু তখন ধূলায় বসিয়া, তাড়াতাড়ি দু চার মুটা খাইয়া, ফর্দ্দ লইয়া, দ্রব্য সংগ্রহার্থ পদব্রজে বাজারে চলিলেন।

স্ত্রী হাঁকাহাঁকি করিয়া বলিলেন, "খুব দৌড়ে যাও—দৌড়ে যাও—পথে একটুও দেরী করতে পাবেনা—দৌড়ে দৌড়ে!!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রন্ধনভূমি আজ দ্বিতলে। যে বৃহৎ ঘরটী শ্রীমতীর বেশ-ভূষার জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই ঘরে রন্ধন আরম্ভ হইল। স্বামী বাজার করিয়া আসিয়া পঁহুছিয়াছে। টিটমসনের ভবনের বড় বড় দুইটী কেরাসিন-ষ্টোভ,—বিলাতী উনান, স্মিথের বাটীর একটা থার্‌মোমিটার বন্ধুগৃহ হইতে ব্যারো-মিটার, যামিনী বাবুর কাছ থেকে দূরবীণ—পাশ্চাত্য প্রথামতে রন্ধনের ইত্যাদি বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রের সমাগম হইয়াছে। রন্ধন-গৃহের মধ্যস্থলে একটী টেবিল, তার চারিধারে চারি খানি চেয়ার, এবং একখানি শয়ন-কেদারা অবস্থিত। স্বয়ং যামিনী বাবু পূরা-সাহেবী পোষাকে সজ্জিত হইয়া, শ্রীমতীকে রন্ধন-কার্য্যের সাহায্য করিতেছেন। দুইটী ঝী, নিম্নতলে শিলে অনবরত বাট্‌না বাটিতেছে। শিল-নোড়ার একঘেয়ে ঘর্ষণ-শব্দে শ্রীমতী মাঝে মাঝে বিরক্ত হইয়া যামিনী বাবুকে বলিতে-ছেন, "বড় কঠোর কর্কশ ধ্বনি কর্ণ-পটহে প্রতিধ্বনিত হই-তেছে। অসভ্যদের অসভ্য প্রথায় প্রাণ যায়-যায় হইয়াছে। বাটিবার কোন বৈজ্ঞানিক যন্ত্র কি আজও আবিষ্কৃত হয় নাই?"

যামিনী। চঞ্চলে! আপনি আমাকে পাঁচ মিনিট সময় দিন, আমি পেনি-সাইক্লোপিডিয়া খুলিয়া কল বাহির করিতেছি।

শ্রীমতী। থাক্, থাক্,—একাজে আপনার পরিশ্রম হবে, বড় কষ্ট হবে। প্রিয় যামিনী বাবু, মজা দেখুন, বুড়ো বামুন-ঠাকুরটা কি অসভ্য! আমাদের সম্মুখে ওব্যক্তি খালি গায়ে খালি পায়ে আসিতে লজ্জা বোধ করে না। থান ধূতিটেও হেঁটোর উপর উঠ্‌চে!—ছি!

সেই রসুয়ে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিল, "মা-ঠাকুরুণ! পোলায়ের জলে কি এখনও মসলা দেন নাই? অনেকক্ষণ জল চড়ান হয়েছে, জল যে দেখ্‌চি ফুট্‌চে।"

চঞ্চলা থার্‌মোমিটার হাতে লইয়া জলের উষ্ণত্ব পরীক্ষার্থ, চেয়ার হইতে উঠিয়া, দূরস্থিত সেই জ্বলন্ত বিলাতী উনুনের নিকটবর্ত্তিনী হইবার জন্য পা বাড়াইবার উপক্রম করিলেন। যামিনী বাবু তাঁহার সম্মুখভাগ আগুলিয়া, আস্তেব্যস্তে বলিয়া উঠিলেন, "না, না,—তা হবে না,—অগ্নির উত্তাপের সন্নিকটে আপনার যাওয়া হবে না। বৈশ্বানরের বিষমাখা বিষম তাপে, আপনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কোমল সুচারুচর্ম্ম বিশুষ্কপ্রায় হইয়া উঠিবে। আহা! বিদ্যুতাগ্নিতে হঠাৎ বিদগ্ধ ফুটন্ত কমল,—আমি স্বচক্ষে দাঁড়াইয়া তাহা দেখিতে পারিব না।"

চঞ্চলা। সর্ব্বংসহা রমণী কি না সহিতে পারে? অনলে জলে, শৈলে,—জেলে, জঙ্গলে, উত্তপ্ত তৈলে,—রমণী কোথাও যাইতে ভয় করে না। রমণী কখনও বজ্রাপেক্ষা কঠিন, কখন বা কুসুম অপেক্ষাও মৃদু! আপনাকে করযোড়ে মিনতি করিয়া বলিতেছি, আপনি আমাকে আর বাধা দিবেন না।—

আপনি অনুমতি করুন—বিদায় দিন,—আমি স্বয়ং গিয়া জল-পরীক্ষা করিয়া আসি।"

যামিনী। মহিলা-কুল-চূড়ামণে! আমার কথা শুন। দূরবীণ আনিলাম কি জন্য? আপনি দূরে, ঐ শয়ন-কেদারায় শুইয়া থাকুন,—শুইয়া চক্ষে দূরবীণ ধরুন,—হাঁড়িস্থ জল তখন প্রত্যক্ষ স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। জল যে সিদ্ধ হয়ে আধাআধি মরে গেল। মা ঠাকুরুণ! ন্যাকড়ায় বেঁধে মসলা গুলা এখনও ফেলে দিলে যে হয়!!

চঞ্চলা হা-হা-হা, হাসিয়া, যামিনী বাবুর উদ্দেশে (জনান্তিকে) বলিলেন, "এই মূর্খ বৃদ্ধ ব্যক্তি বলে কিনা, উষ্ণ জল পরীক্ষার পূর্ব্বেই মসলা হাঁড়িতে নিক্ষেপ করা হউক। অথবা অদ্য আমি রন্ধন করিতেছি বলিয়া, উহার হিংসাপ্রবৃত্তি প্রবলা হইয়া থাকিবে; তাই বুঝি, আমাকে অসম্ভ্রম করণোদ্দেশে আমাকে এই কুকর্ম্ম করিতে রত করাইতেছে। বিশেষত, এখনও ওজন-যন্ত্র আসিয়া পোঁছে নাই। সমস্ত মসলা, অতীব সূক্ষ্মরূপে ওজন করিয়া, তবে ত হাঁড়ীতে ফেলিব? এই পরদ্বেষী বুড়া বামুনটাকে আমি আজই দূর করিব।"

শ্রীমতী তখন উচ্চৈঃস্বরে রসুয়ে ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "ঠাকুর! আজ তোমার কোন কথা কহিবার আবশ্যক নাই; তুমি নীচে গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাক।"

ঠাকুর অবাক্ হইয়া চলিয়া গেল।

ওজন-যন্ত্র আসিতে বিলম্ব হইল। তখন একজন প্রিয় ঝী আসিয়া সেই গরম জলের হাঁড়ী, অনুমত্যনুসারে, নামাইয়া রাখিল! হাঁড়ীতে তখন জল নাই বলিলেই হয়!

তারপর শ্রীমতী চেয়ারে বসিয়া, স্বহস্তে মাছ ভাজিবার যোগাড় করিতে লাগিলেন! সেই বিলাতী উনানে এক কড়াই তেল চাপিল। চারিদিকে মহা হুলস্থূল কাণ্ড। স্বয়ং গৃহিণী আজ রন্ধনী;—দাসীকুল শশব্যস্ত হইল। নিক্তির ওজনে, ৩২৷৷০ ভরি নুন, মাছে মাখা হইল। পাঁচ সের মাছে কতটা হলুদ মাখান হইবে, তাহার জন্য ইংরেজী-পাকপ্রণালী খুলিয়া অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। শেষে স্থির হইল, একসের তিন ছটাক এককাঁচ্চা হলুদ আবশ্যক। অবশেষে শ্রীমতী হুকুম দিলেন—মাছে উনিশ ছটাক শুকাদই মাখাও, এবং দুই ছটাক পেঁপেঁর রস ঢাল; নচেৎ মাছ সিদ্ধ হইবে না।

দ্বিতীয় উনানে লুচি ভাজিবার জন্য চঞ্চলা এক কড়াই ঘী চাপাইলেন। প্রিয় ঝী লুচি বেলিতে লাগিল।

ব্যাপার দেখিয়া সকলে নীরব, নিথর নিশ্চল। মুহূর্ত্ত মধ্যে পাড়ায় রাষ্ট্র হইল, শিক্ষিতা মহিলা চঞ্চলা স্বহস্তে দুপাকা উননে রাঁধিতেছেন। যিনি কখন রন্ধনশালার ত্রিসীমানা মাড়ন নাই, তিনি কেমন করিয়া একই বারে এমন কর্ম্মিষ্ঠা হইলেন,—ইহাই লোকের ভাবনার বিষয় হইল। কেহ বিস্মিত, কেহ বা মোহিত হইল, কেহ বা ধন্য ধন্য করিতে

লাগিল। একজন বৃদ্ধা প্রপিতামহী বলিলেন, "হবেনা কেন মা, বিদ্যার জোর থাকিলে সবই হয়! আমাদের মতন ত ওরা আর মুখ্‌খু মেয়ে নয়, যে,—তেল, ঘিয়ের দুখানা কড়া একবারে সাম্‌লাতে ওরা ভয় কর্‌বে!"

এদিকে চঞ্চলার মজলিস ক্রমেই সর্‌গরম হইয়া উঠিতে লাগিল। সে চঞ্চল-চক্ষের চাহনি, সে ক্ষিপ্রহস্ততা, সে হেলন-দোলন, দেখে কে?

ঝীকে চঞ্চলা বলিলেন, "ঝী বেশী করিয়া জ্বাল দাও,—বিলাতী উনান দ্বয়ের পেঁচ ঘুরাও। এইবার আমি মাছ আর লুচিভাজা আরম্ভ করিব।" ঝী হুকুম মত কার্য্য করিল। অগ্নির উত্তাপ বৃদ্ধি হইল। তখন যামিনী বাবু পাখা লইয়া আসিয়া শ্রীমতীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, বাতাস করিতে করিতে মৃদুস্বরে বলিলেন, "চঞ্চলে! আজ কি অনুপম শোভা! আপনিই বঙ্গগৃহের একমাত্র স্বধর্ম্ম-নিরতা কর্ম্মরূপিণী গৃহিণী—আপনার আর যোড়া নাই।"

শ্রীমতী পণ্ডিতার ন্যায়, গম্ভীর ভাবে বিবেচনা করিয়া, সুবোদ্ধার মত চোখ্ মুখ ঘাড় নাড়িয়া, দুলাইয়া, কাঁপাইয়া,—সেই তৈলপূর্ণ কটাহে একবারে সেই পাঁচ সের মাছ নিক্ষেপ করিলেন। নিক্ষেপান্তর সেদিকে আর দৃক্‌পাত না করিয়া, ঘৃতপূর্ণ কটাহে, ঘৃতের উষ্ণতা পরীক্ষার জন্য শ্রীমতী থারমোমিটারটী ডুবাইলেন। থারমোমিটারটী তৎক্ষণাৎ ভাঙ্গিয়া গেল,—ভিতর হইতে পারদ বাহির হইয়া ঘৃতে পশিল।

তখন তিনি ঝাজরী দিয়া ঘী হইতে পারা তুলিবার বহুবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এদিকে মাছ ভাজার সেই তৈলটা একটু কাঁচা ছিল। পাঁচ সের মাছ একবারে নিক্ষিপ্ত হওয়াতে, কড়ায়ের মুখে-মুখে তৈল উঠিল। কাঁচা তেলে সেই দধিযুক্ত মৎস্য পতিত হওয়ায়, ক্রমশ রাশি রাশি ফেন উদ্গত হইতে লাগিল। ফ্যানার দিকে চঞ্চলার চক্ষু নাই; তিনি কেবল সেই উত্তপ্ত ঘৃত হইতে ঝাজরী দিয়া পারা ছাঁকিতে ব্যগ্র হইলেন।

কড়ায়ের গাত্র বহিয়া তৈল-ফেন পড়িবার উপক্রম হইল। তখন ব্যস্ত হইয়া চঞ্চলা, ঝীকে বলিলেন, "ঝী জ্বাল কমাইয়া দেও,—উনানের প্যাঁচ উল্টা দিকে ঘুরাও।"

ঝী ঘোর বিপদ উপস্থিত দেখিয়া, থতমত খাইয়া, প্যাঁচ উল্টা ঘুরাইতে গিয়া সোজা ঘুরাইয়া ফেলিল। আগুন আরও দাও দাও জ্বলিয়া উঠিল। তখন কড়ায়ের তৈল নিম্নের কেরোসিন আলোকের সহিত মিশিল।

আর রক্ষা নাই। ভয়ঙ্কর দাবানল জ্বলিয়া দশদিক্ উজ্জ্বলীকৃত করিল। ঝীটা বাপ্‌রে মরিরে করিয়া, সর্ব্বাগ্রে পলাইল। শ্রীমতী ভয়ে ভীতা, প্রাণের দায়ে বিব্রতা হইয়া, কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়া হইয়া, তখন পলায়নই শ্রেয়ঃসিদ্ধান্ত করিলেন। কিন্তু এ অন্তিমেও তিনি বিজ্ঞানের সাহায্য ছাড়িলেন না,—সম্মুখে একঘড়া জল ছিল। জল দিলে আগুন নিবে, ইহা তিনি ইংরেজী-গ্রন্থে পড়িয়াছেন। জল ঢালিয়া অগ্নি

নির্ব্বাণ করিয়া, নিজ কৃতিত্ব দেখাইয়া, বীররমণীর ন্যায় গৃহত্যাগ করিবেন, শেষে তিনি ইহাই স্থির করিলেন। হাঁপাইতে হাঁপাইতে ভয়-কম্পিতস্বরে যামিনী বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "যামিনী বাবু, অ যামিনী বাবু, শীঘ্র জল-ঘড়াটা সরাইয়া দিন—"

যামিনী বাবু সে কথা শুনিয়াও, তাহা গায়ে মাখিলেন না। বেগে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

প্রত্যুৎপন্নমতি রমণী তখনও, বিজ্ঞানের সাহয্য ছাড়িলেন না। বহুকষ্টে সেই জলঘড়াটা তুলিয়া জ্বলন্ত কটাহে ঢালিয়া দিলেন। আগুন আরও দ্বিগুণ তেজে জ্বলিল—শ্রীমতীর গাত্রবস্ত্র জ্বলিতে লাগিল, কেশকলাপ পুড়িয়া উঠিল। সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ! ত্রাহি মধুসূদন, ত্রাহি মধুসূদন!! কি দৈবদুর্ব্বিপাক! ইত্যবসরে ঘৃতের কড়াইটাও আপনাপনি জ্বলিয়া উঠিল।

যখন এই কাণ্ড উপস্থিত, তখন বহুকালের পুরাতন ভৃত্য, সেই অবমানিত বৃদ্ধ-রন্ধুয়ে-ব্রাহ্মণ, যেন দিগ্বিদিক্ জ্ঞান-শূন্য হইয়া, নিদারুণ সাহসে ভর করিয়া, বেগে সেই ঘরে ঢুকিয়া মাঠাকুরাণীকে দাবানল হইতে পাথুরে-কোলা করিয়া বাহিরে আনিল।

নিমন্ত্রিত বন্ধুগণ এবং স্বামী কেশবচন্দ্র, সদর, বাটী হইতে দৌড়াদৌড়ি রন্ধনশালার দ্বারদেশে উপনীত হইলেন। দেখিলেন, মাঠাকরুণ মূর্চ্ছিত, চুলগুলা সবই পুড়িয়া গিয়াছে,

—যেন মুড়া ঝাঁটা ; মুখের ছাল উঠিয়াছে, এবং অৰ্দ্ধ-বিবস্ত্রা। বামুন-ঠাকুর দুই-ঘটী জল ঢালিয়া, রমণী-গাত্রের জ্বলন্ত-অগ্নি নিবাইয়াছে।

শেষে বহুচেষ্টায়, বহুকষ্টে, গৃহের চেয়ার টেবিল দগ্ধ করিয়া, অগ্নি নির্ব্বাণ হইল।

দুইজন ডাক্তার আসিল। রাত্রি দশটার সময় চঞ্চলার চেতন হইল। শিক্ষিত-হৃদয়ের কি অপূৰ্ব্ব মহিমা! এত যন্ত্রণা সত্ত্বেও, বস্ত্র-পরিবেষ্টিত সেই বীর-রমণী শ্রীমতী চঞ্চলা ক্ষীণ মৃদুস্বরে বলিলেন, "যামিনী বাবু, আমার রন্ধনের সাটিফিকেট কৈ? রন্ধন ত মন্দ হয় নাই—তবে দৈব-দুর্ব্বিপাকে কি না ঘটে?"

যামিনী বাবু-প্রমুখ সকলেই বলিলেন, "তা বৈকি, শিক্ষিত-মহিলাকুল-ধূরন্ধরে! যাবচ্চন্দ্র দিবাকর, জগতে আপনারই জয়কীৰ্ত্তি ঘোষিত হইবে।"

প্রকৃত পণ্ডিত কে?

বড় কঠিন কাল আসিল। এ ঘোর দুর্দ্দিনে দুঃখের কথা বলিই কাকে, শুনেই বা কে? কিন্তু না বুঝাইলেও মন বুঝে না। আজিকার দিনে প্রকৃত সুব্রাহ্মণপণ্ডিত পাওয়া বড়ই সুদুর্লভ। একজন প্রকৃত পণ্ডিত পাইলে, তাহার মতামত সহজেই, অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায়; কিন্তু একশত

মূর্খ-পণ্ডিত যদি নারায়ণ পূজা করিতেও বলেন, তাহাতেও যেন লোকের অশ্রদ্ধা হয়। প্রকৃত পণ্ডিত কাহাকে বলে ?—এ সম্বন্ধে সেই কঠোরতপা সত্যবতীনন্দন বেদব্যাস যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল ;—

আত্মজ্ঞানং সমারম্ভ্যস্তিতিক্ষা ধর্ম্মনিত্যতা।
নিষেবতে প্রশস্তানি নিন্দিতানি ন সেবতে।
অনাস্তিকঃ শ্রদ্দধান এতৎ পণ্ডিত-লক্ষণম্ ॥

যাঁহার আত্মজ্ঞান আছে, অর্থাৎ এই দেহ, মন, বুদ্ধি, অভিমানাদি জড়-পদার্থকে যাঁহারা আত্মা বলিয়া অভিমান করেন না, পরন্তু এতৎ সমস্ত জড়-পদার্থের অতীত নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত-স্বভাব চিৎস্বরূপ পদার্থকে যিনি আত্মা বলিয়া অনুভব করিতে পারেন, যিনি সাধু অধ্যবসায়বান্, যাঁহার তিতিক্ষা অর্থাৎ শীতউষ্ণাদি দুঃখ-সহিষ্ণুতা আছে, যাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা ধর্ম্মপ্রবণ, যিনি বাহিরেও প্রশস্ত, অর্থাৎ ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, যাঁহার দ্বারা নিন্দিত কার্য্য কখনই হইতে পারে না, যিনি নাস্তিক নহেন, বেদাদি শাস্ত্রের যাবতীয় আদেশ অবনত মস্তকে পালন করেন, যিনি ঈশ্বরে শ্রদ্ধাবান্, পণ্ডিত শব্দে তাঁহাকে বুঝায়।

ক্রোধো হর্ষশ্চ দর্পশ্চ হ্রীঃস্তম্ভো মান্যমানিতা।
যমর্থান্নাপকর্ষন্তি স বৈ পণ্ডিত উচ্যতে ॥

ক্রোধ, হর্ষ, দর্প, লজ্জা, স্তম্ভনশক্তি, মান, অপমানাদি

প্রবৃত্তি সকল যাঁহাকে সত্যপথ হইতে বিচলিত করিতে পারে না, পণ্ডিত শব্দে তাঁহাকে বুঝায়।

যস্য কৃত্যং ন জানন্তি মন্ত্রং বা মন্ত্রিতং পরে।
কৃতমেবাস্য জানন্তি স বৈ পণ্ডিত উচ্যতে॥

যাঁহার মনের সঙ্কল্প ও সঙ্কল্প-সাধনের মন্ত্রণা প্রথমে কেহ জানিতে পারে না, আর্থাৎ কার্য্য সুসিদ্ধ হইলে পর, তাহা লোক সমাজে স্বতঃপ্রকাশিত হয়, তাঁহাকে পণ্ডিত কহে।

যস্য কৃত্যং ন বিঘ্নন্তি, শীতমুষ্ণং ভয়ং রতিঃ।
সমৃদ্ধিরসমৃদ্ধির্ব্বা স বৈ পণ্ডিত উচ্যতে॥

শীতের প্রবলতাই হউক বা প্রচণ্ড উত্তাপই বৃদ্ধি হউক, লোকে ভয় প্রদর্শনই করুক বা কোন প্রলোভনই সম্মুখে উপস্থিত হউক, অধিক বিভবেই হউক বা কোন দুর্ব্বিপত্তি আসিয়াই পড়ুক, কিছুতেই যাঁহার শাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠেয় কার্য্য সম্পাদনে বাধা জন্মাইতে পারে না, তিনি পণ্ডিত-পদ বাচ্য।

যস্য সংসারিণী প্রজ্ঞা ধর্ম্মার্থাবনুবর্ত্ততে।
কামাদর্থং বৃণীতে যঃ স বৈ পণ্ডিত উচ্যতে॥

যাঁহার সাংসারিক বুদ্ধি ধর্ম্মের সহিত অর্থানুগামিনী হয়, অর্থাৎ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, বিষয়ানুগামিনী হয় না, সাধু কামনা সিদ্ধির নিমিত্ত যিনি বিষয়ের সংগ্রহ করেন, পণ্ডিত-শব্দে তাঁহাকে বুঝায়।

যথাশক্তি চিকীর্ষন্তি যথাশক্তি চ কুর্ব্বতে।
ন কিঞ্চিদবমন্যন্তে নরাঃ পণ্ডিতবুদ্ধয়ঃ॥

যতটুকু সাধ্যায়ত্ত, অর্থাৎ আপন শক্তি দ্বারা যতটুকু নির্ব্বাহ হইতে পারে, সেইটুকু পরিমাণ কার্য্য করিতে যিনি ইচ্ছা করেন, এবং নিজ ক্ষমতানুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান ও আপন আপন কর্ত্তব্য কার্য্য অন্য অন্য লোকের কার্য্য অপেক্ষা নীচ হইলেও তুচ্ছ করেন না, এইরূপ মহাত্মগণ পণ্ডিত-বুদ্ধিসম্পন্ন।

ক্ষিপ্রং বিজানাতি চিরং শৃণোতি
বিজ্ঞায় চার্থং ভজতে ন কামাৎ।
নাসংপৃষ্টো ব্যুপযুঙ্‌ক্তে পরার্থং
তৎপ্রজ্ঞানং প্রথমং পণ্ডিতস্য ॥

যিনি যে কোন বিষয়েই হউক, শ্রবণমাত্রই বুঝিতে পারেন, অথচ তাহা মনোযোগপূর্ব্বক আদ্যোপান্ত শ্রবণ করেন, অর্থাৎ বুঝিয়াছেন বলিয়া সমস্ত বিষয়টী শুনিতে ক্ষান্ত হন না, যিনি বিশেষ মর্ম্ম অবগত হইয়া তবে কোনরূপ বিষয়ের অনুষ্ঠান করেন, কিন্তু লোভবশবর্ত্তী হইয়া নহে, অনুরুদ্ধ না হইয়া যিনি পরবিষয়ে হস্তার্পণ করেন না, (অর্থাৎ স্বভাব দোষে বা খোষামোদের জন্য নহে) তিনি পাণ্ডিত্যের প্রথম অবস্থার জ্ঞানসম্পন্ন।

ন প্রাপ্যমভিবাঞ্ছন্তি নবেচ্ছন্তি চ শোচিতম্।
আপৎসু ন বিমুহ্যন্তি নরাঃ পণ্ডিত-বুদ্ধয়ঃ ॥

যাঁহারা পণ্ডিতবুদ্ধি, তাঁহারা যে বস্তু পাইবার সম্ভব নাই তাহার কামনা করেন না, বিনষ্ট বিষয়ের জন্যও অনুতপ্ত

হন না এবং ঘোর আপৎকাল উপস্থিত হইলেও স্খলিতপ্রজ্ঞ হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্যে বিমোহিত হন না।

নিশ্চিত্য যঃ প্রক্রমতে নান্তর্ব্বসতি কর্ম্মণঃ।
অবন্ধ্যকালবশ্যাত্মা স বৈ পণ্ডিত উচ্যতে॥

যিনি পরিণাম ফলের সিদ্ধান্ত নিশ্চয় করিয়া কার্য্যের সূত্রপাত করেন, এবং অসম্পূর্ণাবস্থায় কার্য্য পরিত্যাগ না করেন, যিনি বৃথা সময় নষ্ট করেন না, এবং নিজ মনকে আপনার আয়ত্তাধীনে রাখিতে সমর্থ, তাঁহাকেই পণ্ডিত কহা যায়।

আর্য্যকর্ম্মণি রজ্যন্তে ভূতিকর্ম্মাণি কুর্ব্বতে।
হিতঞ্চ নাভ্যসূয়ন্তি পণ্ডিতা ভরতর্যভ!॥

যাঁহারা উত্তম ও শ্রেষ্ঠ কার্য্যানুসারে অনুরক্ত ঐশ্বর্য্য (শাস্ত্রোক্ত ষড়ৈশ্বর্য্য) বা প্রতাপ বর্দ্ধনে তৎপর, এবং পরহিত দর্শনে অসূয়া প্রকাশ না করেন, তাঁহারাই পণ্ডিত।

ন হৃষ্যত্যাত্মসম্মানে নাবমানেন তপ্যতে।
গাঙ্গো হ্রদ ইবাক্ষুভ্যো যঃ স পণ্ডিত উচ্যতে॥

যিনি সম্মান প্রাপ্ত হইয়াও প্রহৃষ্ট হয়েন না, অর্থাৎ আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে করেন না, ও অবমানিত হইয়াও খেদ বোধ করেন না, সর্ব্বদা গঙ্গাকুণ্ডের ন্যায় নিশ্চল ও অক্ষুব্ধ থাকেন, তিনিই পণ্ডিত।

তত্ত্বজ্ঞঃ সর্ব্বভূতানাং যোগজ্ঞঃ সর্ব্বকর্ম্মণাং।
উপায়জ্ঞো মনুষ্যাণাং নরঃ পণ্ডিত উচ্যতে॥

যিনি জ্ঞান বিজ্ঞানাদি দ্বারা ভূত মাত্রেরই সমস্ত তত্ত্ব বিদিত আছেন, যিনি সকল কার্য্য কারণ ঘটনারই সম্ভাবনা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, মনুষ্যজীবনের চেষ্টিত উপায় সকল অবগত আছেন, তিনিই পণ্ডিত বলিয়া উক্ত হন।

প্রবৃত্তবাক্ চিত্রকথ ঊহাবান্ প্রতিভানবান্ !
আশু গ্রন্থার্থবক্তা চ যঃ স পণ্ডিত উচ্যতে ॥

যিনি বক্তৃতা করিতে সমর্থ, যাঁহার কথন-প্রণালী বিচিত্র, যিনি তর্কোত্থাপনে সমর্থ, আবশ্যক সময়ে যাঁহার বুদ্ধি শীঘ্র সচেতন হয়, গ্রন্থ দেখিবামাত্র যিনি তাহার মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে পারেন, তিনিই পণ্ডিত বলিয়া গণ্য।

শ্রুতং প্রজ্ঞানুগং যস্য প্রজ্ঞা চৈব শ্রুতানুগা।
অসম্ভিন্নার্য্যমর্য্যাদঃ পণ্ডিতাখ্যাং লভেত সঃ ॥

বেদশাস্ত্র যাঁহার বুদ্ধির অনুকূল, এবং যাঁহার বুদ্ধি শ্রুতির অনুগামিনী, এবং যিনি সর্ব্বদা আর্য্যমর্য্যাদা রক্ষা অর্থাৎ আর্য্যদের অনুষ্ঠেয় কার্য্য সকল সম্পাদন করেন, তিনিই পণ্ডিত-উপাধি প্রাপ্ত হয়েন।

অর্থং মহা[illegible]আসাদ্য বিদ্যামৈশ্বর্য্যমেব বা।
বিচরত্যসমুন্নদ্ধো যঃ স পণ্ডিত উচ্যতে ॥

বিপুল বিভব, বিদ্যা ও প্রভুত্ব প্রাপ্ত হইয়াও যিনি বিনম্র-ভাবে বিচরণ করেন, তিনিই প্রকৃত পণ্ডিত-পদবাচ্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দুর্গোৎসব।

তর্কবাগীশ। চাটুর্য্যে! তোমার কোন্ পুরুষে অধ্যাপক ছিল যে, তুমি মহানৈবিদ্যিতে হাত দিতে যাও।

নিধিরাম ন্যায়রত্ন। ঘোষাল বামুনের আর পণ্ডিতীর জাঁক কর্‌তে হবে না। আগুরী-বাড়ী সেবার যখন ভাত গিলে কালী পূজা করিতে গেছলে, তখন শাস্ত্র কোথায় ছিল? আজ তুমি আছ, কি আমি আছি, নৈবিদ্যি কে নেয় দেখ্‌বো।

ভুলু ঠাকুর। আ রাম, তোমরা কর কি হে! তোমাদের হুটোপাটিতে ওদিকে পুঁথিখানা যে গোল্লায় গেল। গেল, গেল, গেল, এবার ঘটটাও বুঝি যায়। ও সেজো বাবু!

কেবল পুরুত। কার বাপের সাধ্যি যে আজ মুড়ি এখান থেকে নিয়ে যায়।

শিরোমণিদের রাখাল। পাঁঠার মুড়ি নিবি ত তোর মুড়ি আগে রাখ্। আজ মায়ের তলায় খুন হবো, তবু মুড়ি ছাড়্‌বো না।

নদেরচাঁদ খানসামা। বড় বাবু! চলুন একবার পুষ্পাঞ্জলিটে দিয়ে আস্‌বেন। ঠাকুরমা ব'লে দিয়েছেন, আমি কি কর্‌বো বাবু!

বড় বাবু। ড্যাম শ্যালা! আমি কি বুঝিনে, না, যাচ্চি না? শেষ ডোস্‌টা টেনে চাটগুলো মুখে দিতে ভুলে এলুম, তুই শ্যালা এম্‌নি বেহুঁস্ চাকর যে হাতে কোরে নিয়ে এলিনে! দ্যাখ্ ওদিকে পেঁচি মাতাল শ্যালা বুঝি ন্যাকার কোরে ফেল্লে।

মহাশক্তির পলায়ন।

বালক। মা কোথা পালিয়ে যাচ্ছেন ?

বৃদ্ধ। মা আর কি তোর আছে ?—তুই মাকে খেতে দিস্ কৈ ? ঐ দেখ্, না খেতে পেয়ে মা কাহিল হয়েছেন, আর তাঁর হাতের ত্রিশূল খসে প'ড়ে যাচ্চে !—

বালক। তাই কি অসুরটা মাকে কাট্তে যাচ্চে ?

(মাকে মারিল, মাকে মারিল বলিয়া বালকের ক্রন্দন।)

বৃদ্ধ। তুই কাঁদিস্ কেন ? এক দিন মাকে খেতে দিয়ে দেখ্ দেখি ? মা তোর এখনি অসুর বিনাশ করে ফেল্বে ?

বালক। আমি ত মাকে রোজই খেতে দি ?

বৃদ্ধ। বাপু হে ! তুমি একটী দিনও তোমার মাকে খেতে দাও না ?

বালক। সে কি কথা ? আমি ত প্রত্যহই খেতে বলি

বৃদ্ধ। বাপু ! গাঢ় ভক্তি ক'রে না দিলে কি মা কখন খেয়ে থাকেন ? মাকে মুখে বল, খাও খাও, কিন্তু মা না খেলে কি যোড়হাতে মায়ের পদতলে পড়িয়া ভক্তিভরে কখন কেঁদেছিলে ?

বালক ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধ অন্তর্দ্ধান হইল।

বিজয়া বটিকা—গাত্র-জ্বালার মহৌষধ।

বিজয়া বটিকা—হাত-পা-জ্বালার মহৌষধ।

বিজয়া বটিকা—চক্ষু-জ্বালার মহৌষধ।

বিজয়া বটিকা—সহজে-দাস্ত-পরিষ্কারের মহৌষধ।

বিজয়া বটিকা—গাত্র-বেদনার মহৌষধ।

বিজয়া বটিকা—অক্ষুধা রোগের মহৌষধ।

বিজয়া বটিকা—শুক্রবৃদ্ধির মহৌষধ।

বিজয়া বটিকা—বলবৃদ্ধির মহৌষধ।

বিজয়া বটিকা—শোথ-রোগের মহৌষধ।

বিজয়া বটিকা—মাথাধরার মহৌষধ।

বিজয়া বটিকা—মাথা-ঘোরার মহৌষধ।

বিজয়া বটিকা—জ্বরবিকারের মহৌষধ।

অনেক প্রসিদ্ধ ডাক্তার কবিরাজ বলেন, জ্বরাদি রোগের এরূপ মহৌষধ আর কখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। জ্বর হইবার উপক্রম হইতেছে,—গা-হাত-পা ভাঙ্গিতেছে—হাই উঠিতেছে—চক্ষু জ্বলিতেছে—এরূপ স্থলে তিন ঘণ্টা অন্তর এক একটী করিয়া দুইটী বিজয়া বটিকা সেবন করিলেই জ্বর আসিবার আশঙ্কা থাকিবে না। বিজয়া বটিকা সহজ শরীরে সেবনীয়। সহজ শরীরে সেবন করিলে বলবৃদ্ধি হয়, কান্তি বৃদ্ধি হয়, স্মরণ-শক্তি বৃদ্ধি হয়। সহজ শরীরে সেবন করিলে, অন্য রোগ কর্তৃক আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা থাকে না।

বিজয়া বটিকা কোথায় প্রাপ্তব্য ?

কলিকাতা ৭৯ নং হারিসন রোড, পটলডাঙ্গা, বিজয়া বটিকা কার্য্যালয়ে, বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর নিকট প্রাপ্তব্য।

বিজয়া বটিকার মূল্যাদি।

বটিকার	সংখ্যা	মূল্য	ডাঃমাঃ	প্যাঃ	ভিঃপিঃ
১নং কৌটা	১৮	||৶০	|০	৶০	/০
২নং কৌটা	৩৬	১৩/০	|০	৶০	/০
৩নং কৌটা	৫৪	১||৶০	|০	৵০	/০
বিশেষ বৃহৎ গার্হস্থ্য কৌটা অর্থাৎ					
কৌটা নং ৪	১৪৪	৪|০	|০	৵০	/০

বিজয়া বটিকার পাইকেরী বিক্রয়।

১নং কৌটা এক ডজন (অর্থাৎ বার কৌটা) লইলে, কমিশন এক টাকা; অর্থাৎ সাড়ে ছয় টাকাতেই বার কৌটা ১ নং বিজয়া বটিকা পাইবেন; ডাকমাশুল ও প্যাকিং আট আনা মাত্র। ভিঃ পিঃ কমিশন দুই আনা।

২ নং এক ডজন লইলে, কমিশন দেড় টাকা, অর্থাৎ বার টাকা বার আনাতেই ২ নং বার কৌটা পাইবেন। ডাকমাশুল ও প্যাকিং বার আনা মাত্র। ভিঃ পিঃ কমিশন চারি আনা।

৩ নং এক ডজন লইলে, কমিশন দুই টাকা অর্থাৎ সাড়ে সতর টাকাতেই ৩নং বার কৌটা পাইবেন। ইহার প্যাকিং ও ডাঃ মাঃ এক টাকা, ভিঃ পিঃ কমিশন চারি আনা।

বার কৌটার কম লইলে, এমন কি এগার কৌটা লইলেও কেহ কমিশন পাইবেন না।

বিজয়া বটিকা এবং কুইনাইন।

কুইনাইন সেবনে যে জ্বর যায় না। বিজয়া বটিকায় তাহা সহজে আরাম হয়। দশ পনর দিন অন্তর পুনঃপুনঃ জ্বররোগে যিনি কষ্ট পাইতেছেন বিজয়া বটিকা তাঁহার জ্বররোগে ব্রহ্মাস্ত্র-স্বরূপ।

বিজয়া বটিকার নিকট কুইনাইন চিরপরাজিত। বিজয়া বটিকার প্রাদুর্ভাবে অনেক গ্রাম ও নগরে কুইনাইনের প্রভুত্ব কমিয়া আসিতেছে। বিজয়া বটিকার এই গুণে অনেকেই মোহিত।

হিন্দুস্থানী উকীলের পত্র।

মহাশয়! আপানার বিজয়া বটিকা সেবন করিয়া ৫টী প্লীহা রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে। অনুগ্রহপূর্ব্বক ৩ নম্বরের আর এক বাক্স বিজয়া বটিকা ভিঃপিঃ পোষ্টে পাঠাইয়া দিবেন। বিজয়া বটিকা জীর্ণজ্বর প্রভৃতি রোগে সবিশেষ ফলপ্রদ। শ্রীলক্ষ্মীপ্রসাদ বি, এল, উকীল, ছাপরা, (সারণ)।

বি. বসু এণ্ড কোম্পানীর

হাতীমার্কা সালসা।

এক মহাতেজঃস্বরূপ! উত্তর চীনদেশ হইতে আনীত কোন লতাবিশেষের এমন গুণ যে, এ সালসা সেবনের পনের মিনিট পরেই দেহে এবং মনে মহাস্ফূর্ত্তি অনুভূত হইবে। মনে হইবে শরীরে যেন কোন বৈদ্যুতিক ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইল। এই মহাশক্তি-স্বরূপিণী সালসা-সুধাপানে মনঃপ্রাণ স্বর্গীয় সুখে বিভোর হইয়া উঠিবে। এ সালসা সহজ শরীরেও সেবনীয়। শীত গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, বসন্ত—সর্ব্বকালে সর্ব্বঋতুতে সেবনীয়। দেহপুষ্টি, লাবণ্যবৃদ্ধি, অবসন্নতা-মোচন এবং শ্রান্তিদূরের জন্য এ সালসা সেবন করিলে, পথ্যের বা স্নানাদির কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। যেমন সহজ শরীরে স্নানাহারাদি করিয়া থাকেন, সেইরূপ করিবেন। যেরূপ দ্রব্যাদি খাইলে, শরীর ভাল থাকে, হজম হয়, সেইরূপ পথ্যই করিবেন।

কঠোর পরিশ্রমের পর সেবন করিলে, সঙ্গে সঙ্গে শ্রান্তি দূর হয়।

বি বসু এণ্ড কোম্পানীর

হাতীমার্কা সালসা।

সদ্গন্ধযুক্ত এবং খাইতে সুস্বাদু এ সুধা সর্ব্বরোগ-হর।

বাঙ্গালী যৌবনে বৃদ্ধ;—৩২ বৎসর পূর্ণ না হইতেই অনেক বাঙ্গালীর অঙ্গ শিথিল হইয়া পড়ে; ৪২ বর্ষ বয়সে

প্রকৃতই অনেকে জরাগ্রস্ত হন। বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর সালসা যথানিয়মে সেবন করিলে, মানবদেহে সহজে আক্রমণ করিতে পারিবে না। শরীর সবল সতেজ সটান থাকিবে। যিনি ৬০ বৎসরের বৃদ্ধ, অঙ্গের মাংস যাঁহার লোল হইয়াছে, কটিতট কুব্জভাব ধারণ করিবার উপক্রম করিতেছে,— তিনি তিনমাস কাল বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর এই সালসা সেবন করিয়া দেখুন, শরীরে সত্য সত্যই যেন নবযৌবনের আবির্ভাব হইবে। বলবীর্য্য বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইবে। ঠিক যেন তিনি নূতন মানুষ হইবেন। যাঁহারা বিশেষ পরীক্ষা করিতে চাহেন, তাঁহারা ঔষধ-সেবনের পূর্ব্বে একবার নিজ দেহের ওজন লইবেন এবং ঔষধ-সেবনের পর প্রতি মাসে এক একবার ওজন লইবেন। দেখিবেন, ক্রমশই আপনার ওজন বৃদ্ধি হইতেছে। শিশু, বালক, যুবক, বৃদ্ধ, স্ত্রী—সকলেই বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর সালসা সেবন করিতে পারেন।

হাতীমার্কা সালসার মূল্যাদি।

অগ্রিম কিছু মূল্যাদি না পাঠাইলে, আমরা হাতীমার্কা সালসা ডাকে ভ্যালুপেবলে বা রেল-পার্শেলে পাঠাই না।

	মূল্য	ডাঃমাঃ	প্যাঃ	ভিঃ
১নং আধপোয়া শিশি	॥৵০	॥০	৶০	/০
২নং একপোয়া শিশি	১৶০	৸০	৶০	/০
৩নং দেড়পোয়া শিশি	১॥৵০	১৲	৶০	/০

একত্রে ৬ ছয় শিশি ফুলেলা লইলে ৫৲ পাঁচ টাকাতেই পাইবেন। ইহার ডাকমাশুলাদি ১৵০ এক টাকা দুই আনা ছয় শিশির কম লইলে কেহই কমিশন পাইবেন না

ফুলেলার প্রশংসা-পত্র।

১ম পত্র।

কলিকাতা হাইকোর্টের জজ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, এল, মহোদয় লিখিতেছেন,—

"আমি ফুলেলা ব্যবহার করিয়াছি। মস্তিষ্ক শীতল রাখার পক্ষে ইহা উৎকৃষ্ট; ইহার সৌরভও অতি মনোহর।"

২য় পত্র।

কলিকাতা ষ্টার-থিয়েটারের সুপ্রসিদ্ধ ম্যানেজার এবং বিবাহ-বিভ্রাট তরুবালা প্রভৃতির গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু লিখিয়াছেন,—"আপনাদের এ কোন্ ফুলের 'ফুলেলা?' মন্মথের ফুলধনু হইতে দুই চারিটী পাপড়ি চুরি করিয়া স্নিগ্ধ স্নেহরসে মিশাইয়াছেন কি? নচেৎ সুবাসের কোমলতার মধ্যে এমন মধুর মোহিনী শক্তিটুকু আইল কোথা হইতে? ঘ্রাণে কত হারাণ কথা প্রাণ যেন আবার কুড়াইয়া পায়। গৃহলক্ষ্মীর অলকায় একটু ফুলেলা দিলে বোধ হয়, তাঁহার পায়ে বেশী তৈল দিবার প্রয়োজন হয় না।

৩য় পত্র।

যিনি অবকাশরঞ্জিনী, পলাশীর যুদ্ধ, রৈবতক, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া বঙ্গের কবিকুলচূড়ামণি হইয়াছেন,—এক্ষণে যিনি চট্টগ্রামের কমিশনরের পার্শনাল আসিষ্টাণ্টের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত, সেই মহাকবি শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন,—'ফুলেলা' ব্যবহারে প্রীত হইয়া কি লিখিয়াছেন, দেখুন ;—"কি স্নিগ্ধতায়, কি সৌরভে, কি বর্ণের গৌরবে,—'ফুলেলা' ব্যবহার করিলে মুগ্ধ হইতে হয়।"

৪র্থ পত্র।

শকুন্তলাতত্ত্ব গ্রন্থের প্রণেতা, বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের অনুবাদক, স্বনামধন্য পুরুষ শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বসু এম্, এ, বি, এল, কলিকাতা ৫নং রঘুনাথ চাটুর্য্যের গলি হইতে লিখিয়াছেন,—আমার এক পুত্র ফুলেলা ব্যবহার করিয়া উহার খুব সুখ্যাতি করিল। বলিল,—তৈল মাখিবার পর শরীর অনেকক্ষণ বেশ স্নিগ্ধ থাকে। আমি নিজে প্রায় ত্রিশ বৎসর কোন তৈল ব্যবহার করি নাই। সুতরাং সাহস করিয়া ফুলেলা ব্যবহার করিতে পারিলাম না। কিন্তু ফুলেলার গন্ধ এত মনোহর যে, উহা ব্যবহার করিতে না পারিয়া অসুখী হইলাম।